পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প

তৃতীয় খণ্ড

*

ফরাসী

নির্বাচক ও অনুবাদক
অনিলেন্দু চক্রবর্তী

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—সাড়ে তিন টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথ ঘোষ
কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস, ১৮৭সি, আপার সারকুলার
রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বেলাকে—

অনিলেন্দু চক্রবর্তী অনূদিত কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

চেখভ-এর

আমার জীবন

(লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস)

গোগোল-এর

গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর

(পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-নাট্য)

দোদের গল্প

(ফরাসী-সাহিত্যের কয়েকটি মণিরত্ন)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, ১ম ও ২য় খণ্ড (রুশ)

ও ৪র্থ খণ্ড ফরাসী (যন্ত্রস্থ)

কিশোরদের রুশ-গল্প (যন্ত্রস্থ)

(পনেরটি বিখ্যাত গল্পের অ-পূর্ব সংকলন, লেখকদের জীবনী-সম্বলিত)

প্রেম ও পিয়াসা (যন্ত্রস্থ)

(দুনিয়ার সেরা প্রেমের গল্পের সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ)

নিবেদন

দুনিয়ার ছোট গল্পের আসরে ফরাসী-সাহিত্যের আসন সকলের উপরে। 'ছোট গল্প বলতে বোঝায় শুধু ফরাসী গল্প'—একথা অতিরঞ্জন হলেও এর মূল বক্তব্যটা সত্যি। এত সংখ্যক ভালো গল্প-লেখক আর কোনো সাহিত্যেই নেই; ফরাসী প্রতিভা ছোট গল্পে শ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ করেছে। ঐতিহাসিক দিক থেকেও ফরাসী গল্প সকলের অগ্রণী। সুদূর পঞ্চদশ শতাব্দীর সুরুতেই উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গ-গল্প রচিত হয়েছে বিভিন্ন হাতে; আঙ্গিকে আয়তনে এবং ভাবে ও রূপায়ণে তা এত নিখুঁত যে আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। বিদেশী সাহিত্যে একমাত্র রুশ ও ইতালীয় গল্পই শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে ফরাসী গল্পের পাশে এসে সসম্মানে দাঁড়াতে পারে। এই ফরাসী গল্পই দুনিয়ার গল্প-সাহিত্যের পথপ্রদর্শক এবং অনুপ্রেরণার উৎস!

ফরাসী গল্প সর্বজন উপভোগ্য হবার বড় একটা কারণ হল এর ঘটনামুখিতা, অপূর্ব স্পষ্টতা ও উজ্জ্বলতা। ঘটনার সংহতি, আশ্চর্য সৌন্দর্য-বোধ, নিখুঁত আঙ্গিকতা, ভাষার দীপ্তি ও ভাবের বৈচিত্র্য—এক কথায় ছোট গল্পের অপূর্ব শিল্প-চাতুর্য ও সূক্ষ্ম মাধুর্যই ফরাসী গল্প-সাহিত্যের বিস্ময়কর দান।……ফরাসী সাহিত্যের মতো ফরাসী গল্পও সুন্দরের উপাসক। সৌন্দর্য সৃষ্টিই এর মূল দায়িত্ব! ভল্টেয়ার, হুগো প্রমুখ দু-একজন লেখকের গল্পেই শুধু সমাজ চেতনার সৃষ্টিশীল দায়িত্ব সৌন্দর্য-বাদের সংগে সমন্বয় সৃষ্টি করেছে। হুগো রচনার মূল উদ্দেশ্যই মনে করতেন সমাজের কল্যাণময় বিবর্তনে সাহায্য করা। প্রাচীন ফরাসী লেখককের রচনায়ও সংস্কারমূলক ব্যঙ্গ রচনা দেখা যায়। কিন্তু

মেরমে থেকে ফরাসী গল্প সমাজচেতনাকে গঠণ করে সৌন্দর্যবাদকেই মুখ্য বলে বরণ করে নিয়েছে। 'আর্টস্ ফর আর্টস্ সেক্' এই ফরাসী সাহিত্যেরই মন্ত্রবাণী। এর "কলালক্ষ্মীরা স্বর্গের অধিবাসী, এঁরা কখনো মুখ বিকৃত করে নিজেদের কুৎসিৎ করে তোলেন না। যখন কাঁদেন গোপনে লক্ষ্য রাখেন, মুখভঙ্গীটি সুন্দর হচ্ছে কিনা।"

অনুবাদে ছোট গল্পের প্রাণকেন্দ্র নিজস্ব রচনাভঙ্গীকে বজায় রাখতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি; কোথাও কোনো অংশ সংযোজন বা বিকলন করিনি। ছায়ানুবাদ বা ভাবানুবাদের ব্যবসাগত সুবিধেবাদী নীতি বর্জন করে যথাযথ হতে চেয়েছি। মূল লেখকের রচনাকে ভাষান্তরের মধ্য দিয়ে বিশ্বস্তভাবে প্রকাশ করাই অনুবাদকের কাজ, অথচ মূলকে বজায় রেখে একাজ মোটেই অনায়াসের নয়। মূলের যথাযথ গৌরব ও অনূদিত ভাষার স্বকীয়তার মধ্যে মণিকাঞ্চনযোগ ঘটানোই অনুবাদকের সাধনা। এই সাধনার পথে প্রথম বাধা মূলভাষার অজ্ঞতা, দ্বিতীয় বাধা ভাষান্তরের মাঝপথে মূলের ধ্বনি ও বেগের অপরিহার্য পরিবর্তন বা ব্যত্যয়! প্রক্ষিপ্ত সৌন্দর্যও সৎ অনুবাদক বা সাহিত্য-ভক্তের পক্ষে বেদনাদায়ক। তাই কোনো রচনার অংশবিশেষ অবান্তর বা অতিবিস্তৃত মনে হলেও অনুবাদককে শস্তা জনপ্রিয়তার লোভ এড়িয়ে সাহিত্যিক নিষ্ঠাকেই বজায় রাখতে হয়।...(এ বইতেও দেখা যাবে, চমৎকার কোনো গল্পের শেষের দিকের বা আগের অংশ বিশেষ দোষাবহ, যেমন ব্যালজাকের 'মরুপ্রেম'; কোথাও বা মাত্র শেষ ছত্রটি বাদ দিলেই গল্পটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে, যেমন মুসেতের 'ক্যামিল'; হুগোর 'ক্লদ গুয়ে' গল্পের শেষাংশেরও কিছু কিছু বর্জন যোগ্য! অথচ এই সব অংশ বাদ দিলে অনুবাদককে লেখকের সংগেই বাদবিসম্বাদ করা ছাড়া পথ থাকে না। অধিকাংশ ইংরেজী অনুবাদক এদিক থেকে দায়িত্বশীল ও নিষ্ঠাবান।

বিদেশী সাহিত্য বাঙলা ভাষায় বাঙালীর কাছে দরদী হাতে পরিবেশন করাই বাঙালী অনুবাদকের প্রিয় কর্ত্তব্য। 'বাঙালীর কাছে' এবং 'বিদেশী সাহিত্য' এ দুটো কথাই লক্ষণীয়। একান্ত বেখাপ্পা কিছু বাঙালী ঢং-এ পরিবেশন করলেও ভোজ মাটি হবার সম্ভাবনা। তাই ফরাসীয়কে ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়ে স্বদেশী নামের ছাপ লাগিয়ে স্বদেশীয় করে তোলাটা যেমন হাস্যকর, তেমনি ফরাসীয়েরা উড়ে এসে জুড়ে বসে বাংলার অন্দরে বাহিরে অশোভন আলাপ আচরণ করবে তাও অসহ্য। বাঙ্‌লা সমাজে ফরাসী-সুলভ যত্র-তত্র ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ও চুম্বন-দান ও সুরাপান মোটেই সুখকর নয় এবং এরকম শুভ চেষ্টার পুরস্কার লাভ হয় শুধু লাঞ্ছনা।...অনুবাদককে দায়িত্বহীন হলে চলে না, তাকে সম্পাদকীয় চোখ রাখতে হয়। একান্ত বিজাতীয় ব্যাপার প্রক্ষিপ্ত না করলেও সংক্ষিপ্ত করতে হয়। তারপর সমজাতীয় ঐতিহাসিক পটভূমিকা পেছনে না থাকলে কোনো জাতির ঐতিহাসিক রচনার অনুবাদ যোগ্য সাড়া জাগাতে পারে না।...অনুবাদকের পক্ষে এটাও বড় বেদনাদায়ক। ষোড়শ লুই-র হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত গল্প ফরাসীয়ের কাছে সহজেই সংবেদনশীল, সেখানে লেখককে বা সমদেশীয় অনুবাদককে ঐতিহাসিক পটভূমিকা নতুন করে সৃষ্টি করতে হয় না। কিন্তু আমাদের বিচ্ছিন্ন ইতিহাসের দেশে সে গল্পের পেছনের কথা জানা থাকলেও ভালো লাগা শক্ত, অনুবাদ ভালো লাগা একেবারেই অসম্ভব। এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকের আগে রয়েছে নির্বাচক বা সম্পাদকের দায়িত্ব। একমাত্র আভিধানিক নজির মিলিয়ে নির্বাচন করতে গেলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠকতেও হয়।

তাই নামজাদা ফরাসী গল্প-মালার মধ্যে যেগুলির আবেদন অন্তরঙ্গ হবার যোগ্য তাই বিশেষভাবে নির্বাচন করেছি। স্থান-সংকোচের জন্যে

কোনো কোনো ভালো লেখকের যথেষ্ট সংখ্যক ভালো গল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ফরাসী গল্প-মালার পরবর্তী অংশ পরবর্তী খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করা হবে। প্রত্যেক গল্প লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্পের আগে তাঁদের জীবন-আলেখ্য সংযোজন করেছি। অনবধানতার জন্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে সেজন্যে লজ্জিত রইলাম। বইয়ের সুরুতে সেলের জীবনীর ৮ম ছত্রে 'লেখকদের' স্থলে হবে 'লেখকের'। পরিশেষে উল্লেখযোগ্য, এই গ্রন্থের 'সব পেয়েছি-র দ্বীপ' ও 'বুরবনের দুই বন্ধু' অনুবাদ করেছে স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩
কলিকাতা

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

নির্দেশিকা

* অনুবাদক বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প

(ফ্রান্স)

এস্তয়েন দ্য লা সেল (১৩৯৮—১৪৭০)

ইংলণ্ডের সংগে 'শতবর্ষের যুদ্ধের' ফলে ফ্রান্সের সাহিত্য-জগতে ক্রমেই অবনতি দেখা দেয়। ইংলণ্ডে গোলাপযুদ্ধ সুরু হওয়ার পরে ফরাসী সাহিত্য আবার বেড়ে উঠবার মতো নিশ্চিন্ত অবকাশ লাভ করে। বারগাণ্ডির ডিউক ফিলিপ দ্য গুডের রাজদরবার থেকেই পাওয়া যায় প্রথম ফরাসী গল্প-সংগ্রহ—সেণ্ট নভেলিস নভেলিস বা শত গল্প সংগ্রহ। বুরবনের ডিউকের দরবারে ছিলেন বিখ্যাত একজন ঔপন্যাসিক, এস্তয়েন দ্য লা সেল। ইনি ছিলেন প্রভঁসের অধিবাসী। ইতালীতে পড়াশুনো সমাপ্ত করে ইনি প্রবেশ করেন ডিউক অব বারগাণ্ডির রাজদরবারে। প্রখ্যাত এই প্রতিভাবান লেখকদের বিশিষ্ট উপন্যাস হ'ল—লা পেলিত দ্য সেইএঁ (La Pelit Jehan De Saientre.)

লা সেলের ছোট গল্প তখনকার দিনের অধঃপতিত দুষ্ট সমাজের পরিচয় দেয়। গল্পগুলি ডিউক ও তাঁর সভাসদদের দ্বারা কথিত বলে মনে হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজসভা বিনোদনের জন্যে যে রকম জঘন্য ও অশ্লীল কাহিনী বর্ণনা করা হ'ত তা আজকালকার শুঁড়ির আড্ডাখানার কাছেও ভয়াবহ ও বিস্ময়কর। লা সেল সেই গল্পগুলিই বিবৃত করেছেন মাত্র,—একথা নিজেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিজ নামীয় রচনার মধ্যে 'বিচিত্র উইল' তখনকার অধঃপতিত ফরাসী বিশপজীবনের উপরে উপাদেয় এক বিদ্রূপ কশাঘাত ; 'ব্যাগপাইপের গান' গল্পটি যুদ্ধের একটি নাটকীয় দৃশ্যের মতোই সুন্দর।

বিচিত্র উইল

—সেল

তা হ'লে শুনুন,—অবশ্যি ভালো লাগে যদি,—ব্যাপারটা ঘটেছে কয়েকদিন আগেই। আমাদের গাঁয়ে এক পাদ্রী ছিলেন, বেশ সাদাসিধে ভালো মানুষটি। এই ভালোমানুষির জন্যেই কিন্তু বিশপ তাঁকে জরিমানা করেছিলেন পাঁচ শ' স্বর্ণমুদ্রা। পাদ্রীর একটা কুকুর ছিল, বাচ্চাকাল থেকেই সেটাকে তিনি লালনপালন করে তুলেছিলেন। কখনো তিনি তাঁর লাঠি জলে ছুড়ে ফেললে, কোথাও টুপি ফেলে এলে বা ইচ্ছে করেই রেখে এলে—তা তুলে আনতে তার জুড়ি মিলত না কোথাও; এককথায় সত্যিকার সৎপ্রকৃতি ও বুদ্ধিমান কুকুরের যা যা জ্ঞাতব্য এবং কর্তব্য সবই ছিল তার নখাগ্রে! সবকিছুতেই সে ছিল অদ্বিতীয়! এজন্যে তার মনিব তাকে এত ভালোবাসতেন যে কুকুর বলতে তিনি ছিলেন অজ্ঞান!

কিন্তু তারপর যা ঘটল আমার পক্ষে তার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। এই বিশিষ্ট জীবটি হঠাৎ বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা লাগার জন্যে অথবা অনিষ্টকর কিছু উদরসাৎ করার ফলে—তা যে জন্যেই হ'ক অসুখে পড়ে মারা গেল। অর্থাৎ ইহসংসার ছেড়ে চলে গেল সোজা স্বর্গধামে—সৎ কুকুরেরা যেখানে গিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এই সৎ পাদ্রীটি করলেন কি তখন? তাঁর গির্জাবাসের পাশেই ছিল অভিজাত কবরভূমি! কুকুরটি ইহধাম ত্যাগ করে চলে গেলে তিনি ভেবেচিন্তে স্থির করলেন—এহেন সৎ ও বিজ্ঞ জীব যথোচিত সমাধিকৃত্য পাওয়ার সম্পূর্ণই উপযুক্ত। তাই

ঘরের পাশেই মাটি খুঁড়ে কুকুরটিকে তিনি কবর দিলেন,—ঠিক একজন ধার্মিক খৃষ্টানের মতোই !

তিনি তার কবরদেশে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করিয়ে সেখানে কোনো স্মৃতি-লিখাও খোদাই করে দিয়েছিলেন কিনা—সে কথা আমি বলতে পারব না, কাজেই এ প্রসংগে নীরব থাকব। তবে আমি ছাড়া আরও কত লোক রয়েছে, এই যা ভরসা। শিগগিরি এই মহানব্রত কুকুরের মৃত্যুসংবাদ চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল এবং ক্রমে ক্রমে পৌছল গিয়ে বড়কর্তা বিশপের কানে। ধার্মিক খৃষ্টানের মতোই একটি কুকুরকে কবর দেবার কাহিনী-টাও শুনতে তাঁর বাকী রইল না। কাজেই বিশপ তাঁর সামনে হাজির হবার জন্ত পাদ্রীটিকে শমন পাঠালেন।

শমনের সংবাদ নিয়ে এল এক পিওন। পাদ্রী তাকে দেখে বললেন—"সেকি ! আমি এমন কি অপরাধটা করলাম যে বিশপের বিচারালয়ে আমাকে হাজির হতে হবে। শমন দেখে সত্যি আমি ঘাবড়ে গেছি। কি অন্তায়টা হ'ল কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।"

লোকটি বলল—"তা দেখুন, আপনাকে কি জন্তে ডেকেছেন তার আমি কি বলব ? তবে, খৃষ্টানদের কবরভূমিতেই যে কুকুরটাকে আপনি কবর দিয়েছেন হয়ত বা সেজন্তেই—"

পাদ্রী ভাবলেন—"হায়রে, তবে তো তাই !"

হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, হয়ত তিনি একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছেন ! এবারে চরম পরিণামের জন্তেই প্রস্তুত থাকা ভালো।

বিশপটি ছিলেন একটি লোভীজীব বিশেষ,—এদিক দিয়ে সারাটি দেশে তাঁর জুড়ি ছিল না।

তাঁকে হাতে রাখতে হ'লে যে কি পরিমাণ তেল-মসলা খরচ করা দরকার—সেকথা স্থানীয় লোকজনের বেশ ভালো করেই জানা ছিল।

পাদ্রীটিও বেশ ভালো করেই জানতেন, শুধু জেলভোগ হ'লেই নিষ্কৃতি নেই, সংগে সংগে জরিমানাও দিতে হবে প্রচুর !

"টাকাই যখন খরচ হবে, এই বিপদ থেকে গা বাঁচাবার ফিকিরও বের করতে হবে।"—ভাবলেন তিনি।

কাজেই শমনের জবাবে তিনি সশরীরেই এসে উপস্থিত হলেন ধর্মাত্মা বিশপের সামনে। বিশপ কুকুরের কবর প্রসংগে কটু মন্তব্য করে সুদীর্ঘ এক ধর্মোদ্দীপিত বক্তৃতা দান করলেন। তার কথা শুনে মনে হ'ল,—ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করার মতো অপরাধও এর তুলনায় হালকা ও তুচ্ছ। সুদীর্ঘ ধর্মবাণীর শেষে পাদ্রীকে তিনি জেলে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন।

একটা অন্ধকার পাষাণ কুঠুরীর মধ্যে আটক রাখা হবে শুনে পাদ্রী তো ভয়ে আধমরা! বিশপকে তিনি পায়ে ধরে অনুরোধ করতে লাগলেন তাঁর কথা অনুগ্রহ করে শুনবার জন্তে। প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল। আর তখন,—সেই বিচারালয়ে ভিড় করে এল দলে দলে লোক, হাজার হাজার লোক : অফিসার, ব্যারিষ্টার, এটর্ণি, সেরেস্তাদার, কেরাণী, উকীল, মোক্তার এবং আরো কত। কুকুরের কবরের এই মোকদ্দমায় সবাই বেশ মজা লুটছিল! পাদ্রী তাঁর জবানিতে একটা কথা বললেন শুধু,—

"প্রভু, ধর্মাবতার! আমার মতো আপনিও যদি আমার কুকুরটিকে জানতেন, তবে তাকে ওরকম কবর দেওয়ায় মোটেই বিস্মিত হতেন না। কারণ, এর জুড়ি কখনো হয়নি, হবে না এবং হতে পারে না।"

এরপরে তিনি তার কুকুরের গুনগানে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন,—

"আজীবন সে বুদ্ধিমান ছিল বলেই মৃত্যুকালে সে আরো বেশী বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে গেছে, সে রেখে গেছে বিশিষ্ট এক উইল; আপনার প্রয়োজন এবং অভাবের কথা সে জানত বলেই আপনার নামে দান করে গেছে এই পাঁচ শ' স্বর্ণমুদ্রা। অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।"

পকেট থেকে থলিটা তুলে গুনে গুনে বিশপকে দান করলেন। ধর্মাবতার তাঁর এই ন্যায্য 'উত্তরাধিকার' পরম তৃপ্তিতে গ্রহণ করলেন। এবারে এই মহান কুকুরটির আশ্চর্য সৎবুদ্ধি, তৎকৃত উইল ও তাকে কবর দেওয়াকে যথার্থই প্রশংসা করলেন তিনি এবং এ বিষয়ে তাঁর একান্ত অনুমোদন জ্ঞাপন করলেন।

ব্যাগপাইপের গান

—সেল

বারগণ্ডাবাসী ও আরমানাকবাসীদের মধ্যে যুদ্ধকালে ট্রঁয়েতে ভারী মজার একটা ঘটনা হয়েছিল। ব্যাপারটা সত্যিই বর্ণনা করার যোগ্য। ট্রঁয়ের লোক প্রথমে ছিল বারগণ্ডির দিকে, তারপর যোগ দেয় আরমানাক-দের দলে। ট্রঁয়েতে ছিল একটি আধাপাগলা লোক, আমাদের সংগেই ছিল সে। মাথাটা তার একেবারে খারাপ হয়নি,—তবে স্বাভাবিকতার চেয়ে বরং পাগলামিই তার মধ্যে বেশী দেখা যেত। তবু সে তার হাত ও মুখের জোরে এমন অনেক কাজ সাধন করত,—বিজ্ঞজনদেরও যা হতবুদ্ধি করে তুলত।

এই লোকটি বারগাণ্ডির দলে দুর্গে কাজ করত। একদিন তার সংগীদের সে বলল, তাকে বিশ্বাস করলে এবং সাহায্য করলে সে ট্রঁয়ের অনেক যুযুকেই ধরিয়ে দিতে পারে। ঐ শহরের লোকদের সত্যি সত্যি ঘৃণা করে সে এবং তারাও একে প্রীতির চক্ষে দেখে না। একবার তাদের

হাতে পড়লে তারা তাকে ঝুলিয়ে দেবে ফাঁসিকাঠে,—এই ভয়ও দেখিয়েছে বহুবার।

"ট্রঁয়ের দিকে যাব আজ।"—বলছিল সে, "শহরের প্রান্তে গিয়ে শহরটা পর্যবেক্ষণ করার ভাব দেখাব ঠিক গুপ্তচরের মতোই, বর্শা হাতে নিয়ে পরিখাটাও পরিমাপ করতে থাকব। তখন তারা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে, শাস্ত্রী পাঠাবে ফাঁসিকাঠে ঝুলানোর জন্তে এবং শহরবাসী কেউ নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি তুলবে না। কারণ, আমাকে ঘৃণা করে তারা,—তারা সবাই। কাজেই, শিগগিরি তারা আমাকে নিয়ে যাবে ফাঁসিমঞ্চে। তোমরা কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে থাকবে কাছের বনঝোপেই। যেই শুনবে যে সদলবলে তারা আমাকে নিয়ে আসছে শহরের বাইরে মাঠে—অমনি ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের উপর, বন্দী করতে থাকবে একের পর একজনকে এবং আমাকেও মুক্ত করবে তাদের হাত থেকে।"

হ্যাঁ, সে যদি সাহস করে এরকম অভিযান গ্রহণ করে তো সমস্ত সেনাদলই তাকে সাহায্য করতে রাজি। আধা-পাগলা এই বীরটি এবার চলে এল ট্রঁয়ে এবং তার মৎলব অনুযায়ী বন্দী হ'ল। এবং এই খবর রটে গেল সমস্ত শহরে। এবার সবাই তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে চায়। শাস্ত্রী তাকে দেখেই গালিগালাজ বর্ষণ করতে করতে আদেশ দিল"কালবিলম্ব না করে ফাঁসির দড়ি লাগাতে।

"ধর্মাবতার, হুজুর, অনুগ্রহ করুন আমাকে! আপনাদের কোনোই ক্ষতি করিনি আমি।"—সে বলল।

"মিথ্যেকথা, বদমাস!"—বলে শাস্ত্রী,—"বারগণ্ডার দলকে তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ, শহরের সৎঅধিবাসী ও বণিকদের ক্ষতি করেছ তুমিই। এবার পাবে তার যোগ্য পুরস্কার,—ফাঁসিকাঠে ঝুলবে এক্ষণি।"

"হুজুর, ভগবানের নামে আমার একটিমাত্র শেষ প্রার্থনা!"—ভালো-মানুষটির মতোই বলল সে—"যখন মরবই ভোরেই যেন আমার মৃত্যু হয়,—শহরের প্রান্তে সুন্দর মাঠটিতে। কারণ, শহরে সবাই আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব; সবার সামনে এই শাস্তি যে আমার পক্ষে একান্তই নিদারুণ!"

"আচ্ছা বেশ, সে দেখা যাবে।"—বলে শাস্ত্রী।

পরদিন ভোরে জল্লাদ গাড়ী নিয়ে এল জেলের দোরে এবং সংগে সংগেই ঘোড়ায় চড়ে এল শাস্ত্রী, অফিসারগণ এবং পিছু পিছু আরো অনেক লোক। আমাদের এই লোকটিকে ধরে বেঁধে ফেলে রাখা হ'ল গাড়ীতে। শেষবারের মতো সে তার ব্যাগপাইপটা বাজাতে বাজাতে চলল বধ্যভূমিতে। তখন খুব ভোর হ'লেও দলে দলে লোকজন এসে জুটেছে ফাঁসি দেখবার জন্তে। এত জনসমাগম সাধারণত হয় না, কিন্তু আজ হয়েছে; কারণ লোকটিকে কেউ দু চোখে দেখতে পারে না, ঘৃণা করে সবাই।

এদিকে,—আপনাদের হয়ত খেয়াল আছে, বারগণ্ডিদল ফাঁসিমঞ্চের কাছেই বনঝোপে লুকিয়ে থাকতে ভুল করেনি, মাঝরাতেই তারা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে রয়েছে। উদ্দেশ্য,—তাদের এই পাগলা বন্ধুটিকে বাঁচানো এবং শত্রুদের বন্দী করা ও যথাপ্রাপ্য মালপত্তর হাত করা। আক্রমণের জন্তে তারা একেবারে তৈরী হয়ে রইল। একটা লোককে আগে থেকেই বসিয়ে রাখা হ'ল একটা গাছের উপরে; সে বলে দেবে ট্রঁয়ের লোকেরা বধ্যভূমিতে এসে পৌছল কিনা।

লোকটিকে খুব ভালো একটা জায়গায়ই রাখা হ'ল,—সবকিছুই যাতে সে ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে। ট্রঁয়ের লোকেরা ফাঁসিমঞ্চের কাছে এল, শাস্ত্রীও লোকটিকে ফাঁসির হুকুম দিল। কিন্তু আমাদের লোকটি

তো একেবারেই হতভম্ব! তার সংগীরা কোথায় সব? এই শয়তানদের তারা আক্রমণ করে না কেন? অস্বস্তিভরে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, —বিশেষ করে ঝোপটার দিকে। কিন্তু কৈ, কোনো সাড়াশব্দই তো নেই কোথাও! তার শেষ-জবানি তাই সে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে লাগল, কিন্তু শাস্ত্রীদের কাছ থেকে তাকে টেনে আনা হ'ল ফাঁসিমঞ্চের কাছে।

সত্যিই সে একেবারে ঘাবড়ে গেছে, বনের দিকে গোল গোল করে তাকাচ্ছে শুধু! কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা! কারণ, ওদিকে সেই পর্যবেক্ষণ-কারী পাহারাওয়ালাটি ঘুমিয়ে পড়েছে গাছের উপরেই!

কাজেই, বেচারা তখন কী যে করবে ঠাউরে উঠতে পারল না, এবার আর তার রক্ষে নেই! জহ্লাদ দড়িটা নামিয়ে এনে তার গলায় পরাতে যাচ্ছে,—তাই দেখে হঠাৎ লোকটির মাথায় একটি মৎলবের উদয় হ'ল। একটা ফন্দী আঁটলে হয়ত বা এই চরম অবস্থায়ও রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

শাস্ত্রীর কাছে বলল সে—"ভগবানের নামে অনুরোধ করছি, আমার মৃত্যুর আগে আমার প্রিয় ব্যাগপাইপটা একটু বাজাতে দিন। আর কিছুই প্রার্থনা নেই আমার, খুশিমনেই মরব আমি এবং আমাকে ফাঁসি দেবার জন্যে আপনাকে ও আপনাদের সবাইকে ক্ষমা করব।"

প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল; ব্যাগপাইপটা আলগোছে তুলে সে একটা গান বাজাতে লাগল, যা তার ঝোপের ভিতরের বন্ধুরা সবাই বেশ ভালোভাবেই জানত। গানটা হ'ল—

"এত দেরী কেন রবিন,
বলো এত দেরী কেন?"

সেই আওয়াজে ঘুম থেকে জেগে উঠল গাছের উপরকার সেই পাহারা-ওয়ালাটি! ভয়ের চোটে সে গাছ থেকে নীচে পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—

"সর্বনাশ, আমাদের বন্ধুকে ফাঁসি দিচ্ছে। জলদি ছোটো, জলদি!"

সৈন্যদল আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। যুদ্ধভেরীর বাজনা শুনে তারা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল শাস্ত্রী ও শহুরেদের উপরে! হৈ চৈ কাণ্ড! এর ভেতরে জল্লাদ তার বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। আমাদের লোকটিকে ফাঁসি দেওয়া তো দূরের কথা,—সে নিজেই প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগল। আমাদের বন্ধুটি কিন্তু তাকে সানন্দেই মাফ করত,—তবে সেটা তার অধিকারের বাইরে ছিল কিনা! সে অবিশ্যি এর চেয়েও ভালো কিছু করল,—ফাঁসিমঞ্চে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের আহ্বান করে বলতে লাগল,—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই লোকটিকে ধরো; পাকড়াও ঐ ব্যাটাকে; এই ব্যক্তিটি টাকার কুমীর; না, না ওটা কোনো কম্মেরই নয়!"

সংক্ষেপে,—বারগণ্ডিদল ট্রঁয়ের অসংখ্য লোককেই মেরে ফেলল, বন্দী করল অনেককে, এবং বাঁচাল তাদের দলের সেই বন্ধুটিকে।

তবে, ভবিষ্যতে কোনোদিনই সে আর এত ভয় খায়নি।

মার্গারেত দ্য নাভারে (১৪৯২—১৫৪৯)

তখনও ফরাসী রাজসভার আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর। রাজা ফ্রানক্‌য়ের বোন হলেন এই রাজকুমারী মার্গারেত। 'কতেরেৎসের' ঝর্ণাজলে স্নান-লীলার জন্তে তিনি একবার চলে যান পিরিনিজে। ঝর্ণার কাছে নীড় বাঁধলেন তিনি,—সঙ্গে কবি, গায়ক ও সুধীবৃন্দ। রাজকুমারী নিজেও কবি, দার্শনিক এবং আশ্চর্য্যরকম জ্ঞান-পিপাসু। গ্রীক হিব্রু তাঁর নখাগ্রে, আয়ত্ত করেছেন 'ক্যালভিনের নীতি'। এই ঝর্ণার পাশে বসেই তিনি রচনা করেন তাঁর "হেপ্টা মে'র"—অশ্লীলতায় এর জোড়া পৃথিবীতে আর নেই। জীবনের শেষভাগে মার্গারেত অল্প বয়সের এ-হেন রচনার জন্তে অনুশোচনার বশেই বোধহয় লিখেছেন "কলুষিত আত্মার প্রতিবিম্ব" নামক গ্রন্থ। এঁর রচিত ৭২টি গল্পের প্রায়ই ভদ্র-সমাজে পড়বার পক্ষে অনুপযুক্ত। দু'টি গল্প এখানে নির্ব্বাচিত হ'ল; "পাত্রীর ব্যাভিচার" গল্পটি তখনকার সমাজের একটা দিকের ছবি। "হতভাগ্য প্রেমিক"—লেখিকার বিশিষ্ট এবং অসাধারণ একটি শুভ্র মুহূর্ত্তের রচনা,—গভীর ভালোবাসার পবিত্র করুণ কাহিনী।

হতভাগ্য প্রেমিক

—নাভারে

প্রভাঁসের প্রান্তে বাস করত এক ভদ্র যুবক। তার শিক্ষা-দীক্ষা ও স্বভাব-চরিত্র ছিল অনিন্দ্য-সুন্দর, কিন্তু সেই অনুপাতে ধন-সম্পত্তি ছিল না। একবার একটি মেয়েকে সে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলল। মেয়েটির নাম বলব না, কারণ নামজাদা এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের আত্মীয়া সে। তা,—আপনারা ঘটনার যাথার্থে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারেন।

মেয়েটির মতো উঁচু বংশের লোক নয় বলে ছেলেটি তার নির্মল ভালোবাসা বাইরে প্রকাশ করতে সাহস পেল না। কোনোদিনই সে তাকে বিয়ে করতে পারবে না—এই হতাশায় তার সমস্ত প্রাণ ছেয়ে গেল। কিন্তু প্রিয়ার সম্মানে কোনোরকম আঘাত দেওয়ার চেয়ে বরং আপন দুঃখে মরে যাওয়াও সে ভালো মনে করে। তাকে সে ভালোবেসেছে প্রাণের টানে, ভালোবেসেছে যেহেতু ভালোবাসার মতোই নারী সে। তার দীর্ঘ দিনের এই আকুল প্রতীক্ষার কথা মেয়েটি শেষপর্যন্ত জানতে পেল। ব্যাকুল ভালোবাসা প্রাণের পবিত্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত দেখে এবং এমন একটি সুন্দর ও সৎ ছেলের ভালোবাসা পেয়ে নিজেকে সে ভাগ্যবতী মনে করতে লাগল, তাই তার সংগে সে এমন মিষ্টি ব্যবহার করতে লাগল যে ছেলেটি আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠল। এর চেয়ে বেশীকিছু সে আশাও করেনি।

কিন্তু ঈর্ষা হ'ল সবার শত্রু! নির্মল দুটি প্রাণের এমন শুভ্র-সুন্দর সম্পর্ক লোকে কিছুতেই আর সহ্য করে থাকতে পারল না। কে এক দুষ্ট লোক

এসে মেয়েটির মাকে বলল যে তাঁদের বাড়ীতে এই ভদ্রলোকটির এত ঘন ঘন যাতায়াতে সে খুবই বিস্মিত হয়েছে,—এবং সবারই নজর পড়েছে সে দিকে। সবাই বলছে, মেয়েটির রূপের মোহেই এতটা মাখামাখি! আর তা ছাড়া, দুজনকে নাকি অনেক সময়েই একসাথে দেখেছে তারা। মেয়ের মা এই ভদ্র ছেলেটির সততায় গভীরভাবেই বিশ্বাস করতেন, কিন্তু এই দেখা-শোনার একটা কদর্য অর্থ হয়েছে দেখে তিনি একটু চিন্তিতই হয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত কুৎসা বা ঈর্ষা প্রণোদিত কুসমালোচনার ভয়ে ভদ্রলোককে তিনি অনুরোধ করলেন,—কিছুদিনের জন্তে সে যেন এ বাড়ীতে না আসে। খুবই মর্মাহত হ'ল সে। কারণ, মেয়েটির সংগে সে যে রকম সংযত ও সম্মানজনক ব্যবহার করে এসেছে তাতে অন্য রকম প্রতিদান পাওয়াই সমীচীন ছিল। যা হ'ক, এ প্রসংগে অতিরিক্ত কাহিনী আর যাতে না বাড়ে তাই সে সরে দাঁড়াল দূরে, একে একে দেখাশোনা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু এই ব্যবধানে তার বুকের ভালোবাসা মোটেই নিভে গেল না। একদিন মেয়েটির সংগে দেখা করতে যাওয়ার পথে সে কাদের কথাবার্তা শুনতে পেল। মেয়েটির নাকি বিয়ে হওয়ার কথা চলছে এবং সেই পাত্রও তার চেয়ে ধনী বা উঁচুবংশের নয়, কাজেই সেই পাত্রের দাবী সে কোনোরকমেই অগ্রগণ্য মনে করল না। আবার আশায় বুক বাঁধল সে; তার পক্ষে কথা বলবার জন্য বন্ধুদের সে নিযুক্ত করল। মনে আশা,—মেয়েটি নিজে বর নির্বাচন করলে নিশ্চয়ই অন্যের চেয়ে তাকেই প্রাধান্য দেবে। কিন্তু সত্যিসত্যি দ্বিতীয় প্রার্থীটি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী ধনী, তাই মেয়ের মা এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন তাকেই পছন্দ করলেন।

যুবকটি বুঝল, এই ব্যবস্থা শুধু তার নয়, তার প্রিয়ার পক্ষেও দুর্ভাগ্যের এবং দুঃখের। প্রত্যাখ্যানে মর্মাহত হয়ে দিন দিন সে করে

যেতে লাগল, শেষে মনে হ'ল যেন মৃত্যুর কালো ছায়াই নেমে এসেছে তার মুখে। ক্রমশই হাসিমুখে সে এগিয়ে চলল নিশ্চিত মরণের মুখে। তবু তার বুকের মাণিককে না দেখে সে কিছুতেই থাকতে পারল না। শেষে তার সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে এলে সে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করল, তবু তার প্রিয়াকে এই সংবাদ জানাতে সে কিছুতেই রাজী নয়। তা হ'লে সে অযথা ব্যথা পাবে……গভীর হতাশায় কিছুই আর সে মুখে তোলে না, চোখে ঘুম নেই,—দিনরাতই সে তার প্রিয়ার চিন্তায় বিভোর। সে এতটা শীর্ণ ও মলিন হয়ে পড়ল যে তাকে এখন আর চেনাই যায় না!

তার এই করুণ অবস্থার কথা কে যেন মেয়েটির মাকে জানাল। মহিলাটি ছিলেন সহৃদয় মানুষ, তা' ছাড়া ভদ্রযুবকটির উপরে তাঁর এতটা শ্রদ্ধা ছিল যে তার আত্মীয়েরা সম্মত হ'লে এই রুগ্ন ছেলেটিই পাত্র হিসেবে বরণীয় হ'ত,—অন্তের ধনৈশ্চর্য্যের চেয়ে বড় বলে শ্রদ্ধা পেত তার অপূর্ব গুণরাশি! কিন্তু আত্মীয়েরা তা মানতে রাজী হ'ল না।

যা হ'ক, মা এবারে তার মেয়েকে নিয়ে হতভাগ্য যুবকটিকে দেখতে এলেন। রোগীর দেহে প্রাণের সাড়া নেই যেন। মৃত্যু এগিয়ে এসেছে তার সামনে,—ঠিকই জানে সে! তাই কারো সাথেই দেখা করতে সে নারাজ,—সবাইকেই একথা জানিয়ে রেখেছে। কিন্তু যে তার জীবন,—আর মরণও—তাকেই আবার কাছে পেয়ে সে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। বিছানার ওপরে উঠে বসে বলল সে "আপনারা আর এখানে এসেছেন কেন? যে পা বাড়িয়েছে কবরের দিকে আর যার মৃত্যুর কারণও আপনারাই—তাকে—তাকে কেন আর দেখতে এলেন?"

"সেকি! আমরা যাকে এত ভালোবাসি তার মৃত্যুর কারণ হব

আমরাই—একি সম্ভব? বলো, তোমাকে অনুরোধ করছি,—কেন এমন করে কথা বলছ তুমি!"

"দেখুন, যতদিন পেরেছি বুকেই চাপা রেখেছি আমার এ দুঃসহ ব্যথা। আত্মীয়েরা আমার জন্যে আপনার মেয়েকে প্রার্থনা করেছে, তারা আমার কথার চেয়ে বরং বেশী ক'রেই বলেছে। আজ আমার দুর্ভাগ্য আমি মর্মে মর্মে সহ্য করছি। দুর্ভাগ্য বলছি আমার ব্যক্তিগত সুখের জন্যে নয়,—আমি জানি যে আমার মতো এমন প্রাণভরে আর কেউ তাকে ভালোবাসতে পারবে না। এমন মিষ্টি ব্যবহার আর কারো কাছ থেকে পাবে না সে। এই দুনিয়ায় তার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুকে—তার সবচেয়ে অনুগত সেবককে সে যে চিরদিনের মতো হারাল—তাই আমাকে বারবার করে আমার মৃত্যুর চেয়েও বেশী দুঃখ দিচ্ছে। আমার প্রাণ, তাও একমাত্র তারই জন্যে আমি সযত্নে রক্ষা করে এসেছিলাম। আর, আজ তা' কোনো কাজেই আর লাগল না বলে সে প্রাণ এখন চলে গেলেই ভালো।"

মা ও মেয়ে দুজনেই তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। "এমন ভেঙে পড়ো না,"—মা বলছিলেন, "বেঁচে ওঠো, আমার মেয়ে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে স্বামী বলে বরণ করবে না। এই পাশেই তো রয়েছে সে, আমিও তাকে তা' প্রতিজ্ঞা করতে বলছি।"

মেয়েটি উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কথায়ই সায় দিল। কিন্তু ছেলেটি বুঝল, ভগবান তাকে সারিয়ে তুললেও তার প্রিয়াকে পাবে না সে কোনোদিনই,—তাকে শুধু সান্ত্বনা দিয়ে খুশি করার জন্যেই এই সব আশার কথা বলা হচ্ছে।

"তিন মাস আগেও যদি আপনারা এমন ভাবে কথা বলতেন, তবে এই মরত লোকের মধ্যে সবচেয়ে সুস্থ ও সবচেয়ে সুখী মানুষ হতাম

আমিই। কিন্তু আপনাদের এই আশার বাণী এত দেরীতেই এল যে আজ তা বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছি না, বা এই আশাতে ভর ক'রে থাকতে পারছি না।"

তখন তারা এই অবিশ্বাস ভেঙে দেবার চেষ্টায় কথা বলতে লাগল।

"যে সুখ আপনারা দিতে চাইলেও আমার ভাগ্যে আর ফলবে না,—তাই যখন আমাকে দিতে রাজী হচ্ছেন,—তখন ওর তুলনায় অনেক ছোট একটা কামনা আছে আমার। সে কথা বলতে আগে কোনোদিনই সাহস পাইনি।"

মেয়ে ও মা দুজনেই প্রতিজ্ঞা করল, তার প্রার্থনা সাগ্রহে পূরণ করবেন তাঁরা, তার মনের কথা খুলেই বলতে পারে সে।

"আমার একটিমাত্র সাধ,—যে আমার স্ত্রী হবে বলে কথা দিচ্ছেন তাকেই এখন আমার দুই বাহুর মাঝে এনে দিন; আমাকে সে আলিঙ্গন করে ধরবে, আমাকে চুমো খাবে সে। আপনি ওকে অনুমতি দিন।"

মেয়েটি অবশ্যি এমন ভাবে আলিঙ্গন করতে অভ্যস্ত নয়। সে আপত্তিই তুলতে যাচ্ছিল; কিন্তু তার মা তাকে যুবকটির অন্তিম অনুরোধ রাখতে বললেন। কারণ, তিনি দেখলেন, ছেলেটির মধ্যে জীবন্ত মানুষের আবেগ বা শক্তি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, সে যে মুমূর্ষু! মা'র আদেশ পেয়ে মেয়েটি আর দ্বিধা করল না, বিছানার পাশে এসে বসল—

"তুমি ভালো হয়ে ওঠো বন্ধু, আমি বলছি তুমি ভালো হয়ে উঠবে।"

মুমূর্ষু এই হতভাগ্য যুবকটি তার দুর্বল শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে দিল এবং গভীর আবেগে তাকে আলিঙ্গন করে ধরল। যার জন্ত সে মরছে

বসেছে তাকেই সারা বুকে জড়িয়ে ধরল,—নিজের হিমেল ঠোঁট দুটি তার ঠোঁটের উপর রেখে বিভোর হয়ে রইল।

"তোমাকে আমি ভালোবেসেছি।"—সে আবার বলতে লাগল,—"সে ভালোবাসা এত নিবিড়, এত গভীর, এত পবিত্র যে তোমাকে পরিণয় সূত্রে পাওয়ার কথা বাদ দিলে,—এর চেয়ে বেশী কিছু কখনোই আমি আশা করিনি। কিন্তু ভগবান যখন আমাদের মিলিত হতে দিলেন না,—আজ আমাকে তাঁর হাতেই তুলে দিচ্ছি, যিনি প্রেমময়, যিনি করুণার প্রতিমা—তাঁর হাতেই। আর সেই অন্তর্যামীই জানেন, তোমাকে আমি কত ভালোবেসেছি, কত পবিত্র আমার প্রাণের কামনা! আজ আমার সেই কামনার ধনকে, আমার বুকের মাণিককে বুকে ফিরে পেয়েছি.—তাই আমার প্রাণও আনন্দদোলায় পৌছবে গিয়ে তারি কাছে!" এই বলেই আবার সে তাকে প্রাণপণ আবেগে এমন নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল, যে তার দুর্বল ক্ষীণ প্রাণ সেই কঠিন চেষ্টার বেগ সহ্য করতে না পেরে চলে গেল তার দেহ ছেড়ে! জীবনের এই পরম নিবিড় আনন্দে প্রাণের আসন টলে উঠল, তার আত্মাও মিলিত হ'ল গিয়ে আনন্দময় ভগবানের সাথে।

হতভাগ্য যুবকটি মরে গেল, শিথিল হয়ে পড়ল তার বাহুর বাঁধন। কিন্তু এদিকে—মেয়েটির এতদিনের বুকচাপা ভালোবাসা বুক ভেঙে বেরিয়ে এল এমন অজস্র কান্নায়, এমন করুণ শোকোচ্ছ্বাসে যে মৃতপ্রায় প্রণয়িনী মেয়েটিকে তার প্রণয়ীর নিষ্প্রাণ বুক থেকে ছাড়িয়ে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল।

হতভাগ্য যুবকটিকে সসম্মানে কবর দেওয়া হ'ল। সেই শোকযাত্রায় অভাগিনী মেয়েটির অবাধ অশ্রু ও অসহ কান্নার দৃশ্যটিই হয়েছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক! তার জীবিতকালে নিজের ভালোবাসা যেমন সে আড়ালে

চাপা রেখেছিল,—আজ তেমনি বাঁধ-ভাঙা আবেগে বেরিয়ে পড়ল সবার সামনেই। যে অন্যায় সে সহ্য করে গেছে, যে দুঃখ সে পেয়ে গেছে একান্ত প্রিয়জনের হাতে—আজ সে যেন তার সমস্ত প্রতিশোধ নিচ্ছে নিজের উপরে।

সান্ত্বনা দেবার জন্যে আত্মীয়েরা এর পরে তাকে এক ভদ্রলোকের সংগে বিয়ে দিলেন, কিন্তু সারা জীবনেও কোনোদিন সে আর সুখের মুখ দেখেনি!

পাদ্রীর ব্যভিচার

—নাভারে

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ম্যাকমিলিয়ানের রাজত্বকালে পাদ্রীদের বিশিষ্ট একটি সংঘারাম ছিল এবং তার পাশেই ছিল এক ভদ্রলোকের বাড়ী। এই ভদ্রলোকটি পাদ্রীদের গুনে এত মুগ্ধ ছিলেন যে তাঁদের প্রার্থনা ও উপবাসের ধর্ম্মফল অংশত লাভ করার উদ্দেশ্যে তিনি সর্বস্বও তাদের অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারতেন। এই পাদ্রীদের মধ্যে ছিল সুন্দর এক দীর্ঘাঙ্গ যুবক। প্রতিবেশী ভদ্রলোকের ধর্ম্মপিতা সে এবং সেই বাড়ীতে তার আধিপাত্য ছিল ঠিক গৃহকর্তার মতো।

ক্রমে এই পাদ্রীযুবক ভদ্রলোকের স্ত্রীর অপূর্ব রূপলাবণ্য ও অনিন্দ্য ভদ্রতায় এত মুগ্ধ ও আসক্ত হয়ে পড়ল যে সবরকম যুক্তিবুদ্ধিও হারিয়ে ফেলল সে এবং তার সংকল্প সাধনের জন্যে সে একদিন একাকী চলে এল

সেই ভদ্রমহিলার বাড়ীতে। বাড়ীতে আর কেউ নেই দেখে পাদ্রীযুবকটী জানতে চাইল তার স্বামী কোথায়। ভদ্রলোকের স্ত্রী বলল, তিনি গেছেন জমিদারী দেখতে, দুদিন পরেই ফিরবেন ; তবে জরুরী কিছু হ'লে লোক পাঠিয়ে যথাশীঘ্র ডেকে আনা যায়। পাদ্রীটি জানাল যে তার দরকার নেই। সে তখন বাড়ীর আশেপাশে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা সুরু করল, মাথার মধ্যে ঘুরছে যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় !

পাদ্রীটি ঘর থেকে চলে গেলেই মেয়েটি তার এক পরিচারিকাকে বলল (পরিচারিকা ছিল দুজন)—"ফাদারের কাছে ছুটে যাও, উনি কি জন্যে এসেছিলেন জেনে এস। কারণ, তাঁর চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম, মোটেই খুশি হননি তিনি।"

পরিচারিকাটি আঙিনায় এসে তাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করল, তাঁর কি অভিলাষ ? উত্তরে সে বলল যে তার একটি অভিলাষ আছে এবং তাকে এক কোণে নিয়ে এসে জামার নীচ থেকে একটা ছোরা বের করে আমূল বসিয়ে দিল তার বুকে। ঠিক তক্ষণি জমিদারী থেকে এক তহশীলদার ঘোড়ার পিঠে ঢুকল এসে সেই আঙিনায়। নেমে এসে সে ধর্মপিতা পাদ্রীকে যেই অভিবাদন করবে—পাদ্রীও অমনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছোরাটা বসিয়ে দিল পিঠের দিকে।

পরিচারিকাটি ফিরছে না দেখে, বিশেষ করে তার এতটা বিলম্বে চিন্তিত হয়ে মেয়েটি তার অন্য ঝিকে বলল—"দেখো তো, ও ফিরছে না কেন ?" ঝিটি বেরিয়ে এল। কিন্তু ধর্মপিতা পাদ্রীযুবক তাকে দেখতে পেয়েই একদিকে ডেকে এনে আগের মতোই ব্যবস্থা করে ফেলল। এবারে একা সে, মুক্ত সে ! মহিলাটির কাছে এসে সে তার বহুদিনের কামনা নিবেদন করে বলল, এখন তার অনুগত হয়ে চলা উচিত। মহিলাটি এমন ব্যাপার স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, উত্তর দিল সে—

"ফাদার, বরং আমার এই বিশ্বাস, দুর্ভাগ্যবশত আমি যদি আসক্তও হতাম তবু আপনার প্রথম কর্তব্য হ'ত আমাকে অভিশাপ দেওয়া,—কঠোর শাস্তি দেওয়া।"

"তাহ'লে বাইরে উঠানে এসে দেখো তোমার জন্যে কী করেছি আমি।"

মেয়েটি বাইরে এল ও তার দুটি পরিচারিকা ও এক তহশীলদারকে ঘাসের উপরে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে ভয়ে পাষাণমূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। এই পাষণ্ড দস্যু তাকে সাময়িকভাবে কামনা করছিল না। তাই সে বুঝল, এখানে পশুবল প্রয়োগ করা সুবিধে হবে না। পাদ্রী বলল—

"ভয় নেই তোমার। সারা দুনিয়ায় যে তোমাকে সব চেয়ে ভালোবাসে তারই হাতে আছ তুমি।"

—এই বলেই সে তার জামার নীচ থেকে একটা আলখাল্লা বের করে মেয়েটির হাতে দিল ও তাকে ভয় দেখিয়ে পোশাকটা পরতে বলল, যদি সে দ্বিধা করে তো সবার মতোই দশা হবে তার।

ভয়ে মেয়েটির দশা তখন একান্ত করুণ! বাধ্যের মতোই ভাব দেখাল সে,—নিজের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় এবং কিছুটা সময় হাতে পাবার ভরসায়। ইতিমধ্যে হয়ত তার স্বামীও এসে পৌঁছবেন। পাদ্রীর আদেশে মাথার ওড়নাটা সে ধীরে ধীরে খুলে ফেলল। তার অনিন্দ্য কেশসৌন্দর্যের জন্যে পাদ্রী যুবকটির একটুও মায়া হ'ল না, ঝপ্ ক'রে তা কেটে ফেলে তার মাথায় পরিয়ে দিল পাদ্রীর টুপি! এতদিনের লোভের সামগ্রীটিকে পাশে নিয়ে এবারে সে ছুটে চলল বিদ্যুদ্বেগে।

কিন্তু ভগবানের করুণা জাগ্রত হ'য়ে আছে নিপীড়িত দুর্বলের জন্যে। নারীর করুণ কান্নায় ব্যথিত হ'য়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাই করলেন তিনি। তার স্বামী অতি শীঘ্রই কাজকর্ম সেরে বাড়ীর মুখে ফিরছিলেন একান্ত

আশাতীত ভাবে। সেই পথেই পাদ্রী যুবকটি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছিল। দূর থেকেই মহিলাটির স্বামীকে দেখতে পেয়ে সে বলল—

"ঐ তোমার স্বামী আসছে, তুমি তার দিকে একবার তাকালেই সে তোমাকে আমার হাত থেকে মুক্ত করতে চাইবে—তা বেশ ভালো করেই জানি আমি। কাজেই আমার সামনে হাঁটো তুমি, তার দিকে মাথা ঘুরিও না। তুমি একটুও ইঙ্গিত করেছ কি আমিও তোমার বুকে বসিয়ে দেব এই ছোরা,—তোমার স্বামী এসে তোমাকে মুক্ত করবার সময়ও পাবে না আর!"

ভদ্রলোক এসেই জিজ্ঞেস করলেন·—কেথেকে আসছেন তিনি।

"আপনার বাড়ী থেকেই, আপনার স্ত্রীর সব কুশল দেখে এসেছি। আপনার প্রতীক্ষা করছে সে!"—বলে পাদ্রী।

ভদ্রলোক তার স্ত্রাকে লক্ষ্য না করে ঘোড়ায় চড়ে চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার অনুচরটি প্রভুপত্নীকে হঠাৎ ডাক দিল, ফাদারের সাথে প্রভু-পত্নী রয়েছে বলেই তার ধারণা হ'ল। ফাদারের অনুচর হ'ল ফকির জন, তাকে সে বহুবার দেখেছে, বহুবার কথাও বলেছে।

বেচারী মেয়েটি সবার দিকে মাথা ঘুরোতে সাহস পেল না, স্বামীর অনুচরটির কথায় সে জবাব দিল না কোনো। অনুচরটি ছদ্মবেশী এই ফকির জনের মুখখানা একবার ভালো করে দেখবার জন্যে রাস্তাটা পেরিয়ে এল। কিন্তু মহিলাটি কোনো কথা না বলে ছলছল চোখে একটু ইশারা জানাল শুধু। অনুচরটিও মনিবের কাছে এসে বলল—

"দেখুন, সত্যি বলছি। ঐ ফকির জন হুবহু আপনার স্ত্রীর মতো, রাস্তাটা পেরোবার সময় আমি তাকে ঠিক ঠিক লক্ষ্য করেছি। নিশ্চয়ই সে ফকির জন নয়। আর তা যদি হয়ও,—অবিরল কাঁদছে সে, আমার দিকে সে করুণভাবে তাকিয়েও ছিল।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখছে! হেসেই তিনি উড়িয়ে দিলেন সমস্ত সন্দেহ!

কিন্তু অনুচরটির সন্দেহ যায় না, নিশ্চয়ই কিছু গণ্ডগোল আছে এর মধ্যে। সে আবারো তাদের কাছে ফিরে গিয়ে ব্যাপারটার একটা সমাধান করতে চায়; মনিবকে সে তার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানাল। ভদ্রলোক তাকে যেতে দিলেন,—ব্যাপারটা শেষ অবধি দাঁড়ায় কেমন দেখা যাক। কিন্তু পাদ্রীটি দেখল, অনুচরটি ফকির জনের নাম ধরে ডেকে ডেকে তাকে অনুসরণ করছে। সে বুঝল যে সে ধরা পড়ে গেছে। অমনি তার দিকে ধেয়ে গিয়ে সে লোহায় মোড়া লাঠিটা দিয়ে তাকে এমন এক নিদারুণ ঘা মারল যে লোকটা ঘোড়া থেকে পড়ে গেল; পাদ্রীটিও অমনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোরাটা আগা-গোড়া বসিয়ে দিয়ে তাকে শেষ করে ফেলল।

ভদ্রলোক দূর থেকে তার অনুচরকে পড়ে যেতে দেখে ভাবলেন হয়ত বা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটেছে! তিনি তাই বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন তাকে সাহায্য করবার জন্যে। কাছাকাছি আসতেই পাদ্রী যুবকটি তাকে এক বাড়ি মারল, ভদ্রলোকও পড়ে গেলেন ঘোড়া থেকে। কিন্তু ভদ্রলোক ছিলেন ভয়ানক শক্তিশালী, পাদ্রীটিকে তিনি এমন নিদারুণ শক্তিতে আকড়ে ধরলেন যে সে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ল, হাত থেকে পড়ে গেল ছোরাটা।

ভদ্রলোকটির স্ত্রীও অমনি সেটাকে তুলে এনে স্বামীর হাতে এগিয়ে দিল এবং নিজেও তার মাথাটা ঠেসে ধরল প্রাণপণ বলে; স্বামীও ছোরাটা তুলে ঘা মারতে লাগল বারবার।

পাদ্রীটি আর কিছু করতে না পেরে শাস্তি প্রার্থনা করল এবং নিজের পাপ অভিসন্ধিও স্বীকার করল। ভদ্রলোক তাকে একেবারে হত্যা

করলেন না, স্ত্রীকে বললেন লোকজন ডাকতে, বন্দীকে চালান দেবার জন্তে গাড়ী ডাকতে। মহিলাটি তার ধর্মযাজকীয় পোশাকটা ফেলে দিয়ে খালি মাথায়ই সোজা ছুটে এল বাড়ী। সব লোকজনও জানোয়ারটাকে খাঁচাবন্দী করবার জন্তে ছুটে এল। আসামীকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল ফ্লাগুারে,—সেখানে সম্রাটের অধীনস্থ বিচারকদের কাছে বিচার হবে তার।

আসামী পাদ্রী যুবক এই একটিমাত্র অপরাধের কথাই স্বীকার করেনি, এই সংগেই ধরা পড়ল আরো অনেক পাপকর্মের কাহিনী। এই মহিলাটির মতোই আরো অনেককে সে গির্জাবাসে এই একইভাবে নিয়ে এসেছে। লোক পাঠিয়ে সংগেসংগেই জানা গেল যে প্রকৃতই তাই। কখনো যদি সে এই পাপকার্যে বিফল হয়েছে—সে কেবল ভগবানের ইচ্ছায়।

গির্জাবাসে যে ক'টি মেয়ে পাওয়া গেল তাদের এবং অন্তান্ত হৃত ধনসম্পদ স্থানান্তরিত করা হ'ল; তারপর, পাদ্রীদের সহ সমস্ত সংঘারাম ভস্মীভূত করে ফেলা হ'ল। এই ভয়ানক পাপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি হ'ল।

যে প্রেমের মূলে রয়েছে পাপ তার চেয়ে নিষ্ঠুর ও জঘন্ত আর কিছুই হতে পারে না, আবার পবিত্র প্রাণের ভালোবাসার মতো শুভ্র-সুন্দরও নেই আর কিছুই।

বিশপ ফেনেলন (১৬৫১—১৭১৫)

লুইর আমলে ফরাসী জাতীয় জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিকটা ফুটে উঠেছে এর গল্পের ভেতরে। ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকদের মধ্যে ইনি একজন। এই উদার-প্রাণ বিশপটি ছিলেন রাজার নাতিদের শিক্ষক। "সব পেয়েছির দ্বীপ" গল্পটি তাদের মন গ'ড়ে তুলবার জন্যেই লেখা। এই লেখকের বাণীভঙ্গী ছিল অনিন্দ্য সুন্দর। "সব পেয়েছির দ্বীপ" —গল্পটি আশ্চর্যরকম সহজ স্বচ্ছন্দ। ফরাসী বিশপ জীবনে ফেনেলনের মতো গুণসম্পন্ন আর কয়েকটি উদার-প্রাণ লোক থাকলে তাঁদের ইতিহাসই অন্যরকম করে রচিত হ'ত।

সব পেয়েছির দ্বীপ

—ফেনেলন

বহুদিন ধরে প্রশান্ত মহাসাগরে চলবার পর দূরে একটা চিনির দ্বীপ দেখতে পেলাম আমরা। শুকনো ফলে তৈরী সেখানকার পাহাড়গুলো, পাথরগুলো সব রসগোল্লা আর পান্তুয়ার, মাঠের মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সিরাপের নদী। দ্বীপটার অধিবাসীরা কিন্তু বড্ড লোভী। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তাগুলোই চাটতে সুরু করে তারা, আর নদীতে হাত ডুবিয়ে আঙুল-গুলোই চুষতে থাকে! লম্বা লম্বা মিষ্টি গাছের অনেক বন আছে সেখানে, তার তলায় পড়ে থাকে প্রচুর কেক। নাবিকেরা একটুখানি হা করতে না করতেই হাওয়া এসে সেগুলোকে পুরে দেয় তাদের মুখে।

চারিদিকেই শুধু কড়া মিষ্টির এত বেশী সমাবেশ দেখে যে দেশে নানা রকমের অন্যসব ভাল খাবার পাওয়া যায় এমন দেশে আমাদের যাবার ইচ্ছে হ'ল! শুনতে পেলাম আরো দশ মাইল দূরে আর একটা দ্বীপ আছে। সেখানে চপ কাটলেট মাংস প্রভৃতির খনি আছে। পেরুর স্বর্ণখনির মতোই ওগুলোকে খুঁড়ে বার করতে হয়। এছাড়া লেবুর রসের নদী, ব্যসমের দেয়ালওয়ালা বাড়ীঘর, আরো অনেক কিছুই। ঝড়ের দিনে সেখানে হয় সুরা-বৃষ্টি, আর শান্ত সুন্দর ভোর বেলায় উজ্জ্বল সুরার শিশির পড়ে থাকে পাতায় পাতায়, গ্রীসদেশীয় সিরাজের মতোই।

সেখানে পৌঁছে আমরা আধডজন ভুঁড়িসর্বস্ব লোক চারিদিকে ছেড়ে দিলাম। আসবার সময় পথে তারা এত জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল যে, সেই হাওয়ায় পাল খাটিয়েই আমরা বেশ তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম এই নতুন দ্বীপটায়। কিন্তু এখানে এসে নামতে না নামতেই তীরে একদল

ফিরিওয়ালাকে ক্ষুধা বিক্রী করতে দেখলাম। এখানকার লোকগুলো নাকি নানা আমোদ প্রমোদের মাঝে এই ক্ষুধার কথা একেবারেই ভুলে যায়। আবার, আর একদল লোককে দেখলাম ঘুম বিক্রী করতে। ঘণ্টা হিসেবে এর দাম ঠিক করা আছে। স্বপ্নের গুণ অনুপাতে কতকগুলো ঘুম আবার অন্যগুলোর চাইতে অনেক দামী। সব চাইতে ভালো স্বপ্ন-গুলোর দাম খুবই বেশী।

সব চেয়ে ভালো দেখে এমন একটা ঘুম কিনলাম এবং অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, কিন্তু শুয়ে পড়তে না পড়তেই একটা ভয়ংকর শব্দ শুনতে পেলাম। ভয় পেয়ে সাহায্যের জন্যে চীৎকার করে উঠলাম আমি। দ্বীপবাসীরা আমাকে অভয় দিল। তারা বলল—"পৃথিবী তার মুখ খুলেছে। রোজ রাতেই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পৃথিবী হা করে ফুটন্ত চকোলেট, কেক ও আরও নানা রকমের তরল পানীয় উদ্গীরণ করে থাকে!" আমি ঝটপট বেরিয়ে পড়ে কিছু সংগ্রহ করে নিলাম। বেশ সুস্বাদু লাগল সেগুলো।

তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের ঘোরে মনে হ'ল, পৃথিবীটা যেন দানা বেঁধে গেছে, মানুষগুলো সুগন্ধির সাহায্যে বড় হচ্ছে। হাঁটতে হলেই নাচছে তারা, আর কথা বলতে হ'লেই গাইছে গান। হাওয়ায় উড়বার জন্য পাখা আর জলে চলবার জন্য পাখনা—দুটোই রয়েছে তাদের। কিন্তু ঠিক বারুদের মতো তারা! স্পর্শ করতে না করতেই রেগে অগ্নিশর্মা! ঠিক জ্বালানী কাঠের মতোই সহজে জ্বলে ওঠে! এত অল্পেই তাদের উত্তেজিত হতে দেখে আমি কাছে না এসে আর পারলাম না। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম—"খুব সামান্য ব্যাপারেই তোমরা এত চটে যাও কেন?" সে আমায় ঘুষি দেখিয়ে বলল—"না, কৈ? আমিতো কখনো চটি নি।"

ঘুম থেকে জাগতে না জাগতেই ক্ষুধার ফিরিওয়ালা এসে আমার কতটুকু ক্ষুধার দরকার জানতে চাইল, ইচ্ছে হ'লে সারাদিন খেতে ব্যস্ত থাকবার মতো ক্ষুধাও কিনতে পারি তাও জানিয়ে দিল। আমি তাই কিনলাম. টাকার বদলে সে আমায় চেলীর তৈরী একডজন থলে দিল। থলেগুলো পাকস্থলীর কাজ করায় বিরাট বিরাট ভোজের খাবার একজনে খেলেও বদহজম হয় না। থলেগুলো পেটের চারধারে বেঁধে নিতেই ক্ষুধায় পেট জ্বলে যেতে লাগল। আমি খেতে বসে গেলাম। একটা পাত্র শেষ হতে না হতেই ক্ষুধা আমায় পেয়ে বসে, কিন্তু আমি তাকে বেশীক্ষণ জ্বালাতন করতে দিই না। ওখানকার লোকগুলো বলল, ক্ষুধাটা পেটুক ক্ষুধা ছিল ব'লে আমার খাওয়া ঠিক পরিমাণ মতো হতে পারে নি। খাবারের স্বাদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিমাপ সম্বন্ধে তারা বেশ অভিজ্ঞ দেখতে পেলাম।

সারাদিন শুধু বসে বসে খাওয়ার পর রাতে বড্ড শ্রান্ত মনে হ'ল। ঠিক করলাম, পরের দিন অন্য খাবার খাব আর সুগন্ধির সাহায্যে শরীরটাকে একটু তাজা করে নেব। পরের দিন সকালের জলখাবার সেরে নিলাম কমলাফুলের গন্ধ দিয়েই। দুপুরের পর্ব শেষ হ'ল গোলাপ, যুঁই, চাঁপা প্রভৃতি নানারকম ফুলের হালকা গন্ধে। সমস্ত রকম সুগন্ধি ফুল ও শুকনো ফলে ভরা মস্ত এক ঝুড়ি এল সন্ধ্যেবেলার খাবার। সারাদিন এত সব পুষ্টিকর সুগন্ধি নেবার জন্য সেই রাতে আমার বদহজম হ'ল। পরের দিন এমন করে খাওয়ার শ্রান্তিকর আনন্দ থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ক্রমে আমি জানতে পেলাম, সেই দেশে শুধু একটি শহরই আছে। ওখানকার লোকগুলো আমাকে এক বিচিত্র যানে করে সেই শহরে নিয়ে যাবে কথা দিল। একদিন খুব মস্তবড় দুটো পাখাওয়ালা একটা

হালকা চেয়ারে তারা আমায় বসাল। তারপর মস্ত বড় বড় পাখাওয়ালা উটপাখীর মত বড় বড় চারটে পাখীকে সিল্কের সুতো দিয়ে বেঁধে আমার চেয়ারের সংগে জুড়ে দিল। পাখীগুলো উড়ে চলল। অধি-বাসীদের কথামতো আমি তাদের পূব দিকে চালাতে লাগলাম। পায়ের নীচে উঁচু উঁচু অনেক পাহাড় দেখতে পেলাম। এত বেশী তাড়াতাড়ি উড়ে চলছিলাম যে, নিঃশ্বাস টানতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল, আমার মনে হচ্ছিল যেন বাতাসের বিরাট বিরাট ঢেউয়ের ভেতর ভীষণ জোরে সাঁতার কেটে চলেছি।

ঘণ্টাখানেকের ভেতর আমরা সেই বিখ্যাত শহরে এসে পড়লাম। শহরের সবটাই মার্বেল-পাথরে গড়া। আকারে প্যারির চাইতে কম করে তিনগুণ বড় হবে। গোটা শহরটাই একখানা বাড়ী। চব্বিশটা আদালত আছে এখানে এবং এর প্রত্যেকটাই পৃথিবীর সব চাইতে বড় যে কোনো বাড়ীর চাইতেও বড়। এদের ঠিক মাঝখানে আবার এদের চাইতেও ছয়গুণ বড় আরো একটা আদালত আছে। এখানকার সব বাড়ীগুলো একই ধরণের; কারণ, এখানকার বাসিন্দাদের সবার অবস্থাই সমান। কোনো চাকরবাকর বা গরীব দুঃখী কেউ নেই এখানে। যে যার নিজের কাজ নিজেই করে, কাউকে অন্যের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় না। কামনা নামে চঞ্চল ও আমুদে একরকমের জীব আছে এখানে। এক মুহূর্তে তারা অন্যের যে কোনো প্রার্থিত জিনিষ এনে দেয়।

এখানে এলে পর এইরকম একটি জীব এসে আমার সংগ নিল। আর কোনো অভাবই বোধ করতে দিল না আমায়। কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করতেই সে তা এনে দেয়, কোনো কিছু পাবার ইচ্ছে হ'লেই অমনি তা পাওয়া যায়। সব সময় এরকম অভাবশূন্য হয়ে

থাকায় আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। আমার এতদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝলাম, —ক্রমবর্ধমান অভিলাষ ও সাড়ম্বর জীবনের চাইতে একটু শান্তি, একটু আনন্দ অনেক ভালো।

শহরটার অধিবাসীরা বিনীত নম্র এবং বেশ অমায়িক। তারা আমায় খুব সমাদরে অভ্যর্থনা জানাল, আমি যেন তাদেরই একজন। আমি কিছু বলতে গেলাম, কিন্তু আমার কথা ভাষায় প্রকাশ করবার আগেই তারা তা বুঝে নিয়ে সেই মতো কাজ করতে লাগল। এতে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। দেখলাম ঃ তারা নিজেদের ভেতর কখনও কোনো কথা বলে না। আমরা যেমন করে বই পড়ি তারাও তেমনি একে অন্যের চোখ দেখেই মনের কথা বুঝে নেয়। তারা আমায় সুরভি-সংগীতের ঘরে নিয়ে গেল। চড়া মিহি নানা পর্দার সুর পর পর সাজিয়ে আমরা যেমন ঐকতানের সৃষ্টি করে থাকি তারাও তেমনি উগ্র মৃদু নানা সুরভি পর পর সাজিয়ে এক ঐক্যগন্ধের সৃষ্টি করেছে।

এদেশের মেয়েরা পুরুষদের শাসন করে। তারা মামলা মকর্দমার বিচার করে, যুদ্ধ চালায় তারা, আর ছেলেমেয়েদের সবরকম বিজ্ঞান শিক্ষাও তারাই দেয়। পুরুষেরা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সাজ পোশাক আর স্নো পাউডার ঘষামাজা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সুতো কাটা, সূচীকাজ এবং আরও নানারকম কারুশিল্পের কাজে তারা বেশ পটু। আবার, কথামতো না চললে স্ত্রীদের হাতে মার খাবার ভয়ে ত্রস্ত থাকে তারা।

অনেকদিন আগে অবিশ্যি সবই ছিল উল্টো। কিন্তু ক্রমে কামনার প্রাদুর্ভাবে পুরুষেরা অলস নিস্তেজ ও অজ্ঞ হয়ে পড়ল। মেয়েরা এরকম পুরুষের দ্বারা শাসিত হয়ে নিজেদের অপমানিত মনে করতে লাগল। তার একত্র হয়ে প্রজাতন্ত্রের ধ্বংস করল। তারা সাধারণের জন্য বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা করল। মেয়েরা খুব ভালোভাবে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করল। স্বামীদের নিরস্ত্র করে রাখল তারা, আর স্বামীরাও যুদ্ধের দায় থেকে বেঁচে হাঁফ ছাড়ল। মেয়েরা তাদের হাত থেকে বিচারের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সব আইন কানুন পরীক্ষা করে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করল। এইভাবে তারা গণতন্ত্র রক্ষা করল। তা না হ'লে পুরুষদের দুর্বলতা এবং চপলতার জন্যে রাজ্যটাই নষ্ট হয়ে যেত আর কি।

এই সব দৃশ্য দেখে আমি তো মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং এত খাওয়া দাওয়া আর গানবাজানার চোটে নিজেকে বড্ড শ্রান্ত মনে করলাম। শেষ পর্যন্ত বুঝলাম—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ যতই মধুর হ'ক না কেন মানুষকে তা অধঃপাতের পথেই নিয়ে যায়,—মানুষকে তা কখনও সত্যিকারের সুখী করতে পারে না। তাই আমি খুশিমনে বাড়ী ফিরে সাধরণ কাজ-কর্মের ভেতর দিয়েই শান্ত সদ্‌জীবন যাপন আরম্ভ করলাম। যে স্বাস্থ্য শান্তি এবং আনন্দ এত খাওয়া-দাওয়ার ভেতর দিয়ে ফিরে পাইনি, তাই ফিরে পেলাম আবার।

আরিয়েত্ দ্য ভল্টেয়ার (১৬৯৪—১৭৭৮)

এই জগদ্বিখ্যাত বিদ্রোহী লেখকের জন্ম হয় প্যারীতে। ছোটবেলা থেকে আরিয়েতের কবিতা লেখার প্রতিভা ছিল, প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও লাভ করেছেন। দশ বছর বয়সে ভর্তি হন কলেজ লুই দ্য গ্রান্দ-এ ; কিন্তু প্রাপ্ত শিক্ষাকে শ্রদ্ধা না করাই ছিল তাঁর স্বভাব। সতের বছর বয়সে স্বগৃহে ফিরে সাহিত্য-জীবিকা গ্রহণ করতে চাইলে পিতাপুত্রে দ্বন্দ্ব বাধে এবং পিতার আদেশ অনুযায়ী আপাতভাবে আইন অধ্যয়নে যুক্ত থাকেন। এর পরে যান হেগ-এ ; ইতিমধ্যেই আপত্তিকর কবিতা লেখার জন্যে পিতার অপ্রিয় হয়ে ওঠেন, প্রিন্স রিজেন্টের নামে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার জন্যে নির্বাসিত হন। এর পরে তাঁকে ফ্রান্সের বিখ্যাত বন্দীশালা বাস্তিল-এ অবরুদ্ধ হতে হয় এবং এই থেকেই তিনি 'ভল্টেয়ার' নামে পরিচিত হন।

আরো বহুবার কারাভোগ ও নির্বাসনের পরে "অদিপ" নামক একটি নাটক রচনা করেন এবং আবারো নির্বাসিত হন। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর ইনি বিদ্রোহী দলের সংগে যুক্ত হন। এক দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যাপারে নির্ব্বাসিত হন ইংলণ্ডে, তিন বছর পরে ফিরে আসেন প্যারীতে। এই সময়কার লিখিত বহু দর্শনগ্রন্থ ও নাটকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'ল 'মেরপ' নাটক এবং এটিই লেখকের শ্রেষ্ঠ নাটক। এরপর প্রুশিয়াতে গিয়ে ভল্টেয়ার অনেক নিষিদ্ধ ব্যাপারে সংযুক্ত হওয়ায় তাঁকে ফ্রান্সে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

ভল্টেয়ারের মতো এমন বহুমুখী প্রতিভা জগতে বিরল। কবিতা, নাটক, গল্প ও উপন্যাস—সমস্ত রকম গ্রন্থই ইনি লিখেছেন এবং অপর্যাপ্ত সংখ্যায়। লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা হ'ল গল্প ও উপন্যাস। অসাধারণ বাণী-সংযম ও ভাষা-সারল্য এঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিদ্রূপ, হাস্যরস, মন্তব্য সবই সংযত ও ধারালো। ভল্টেয়ারের রচনা পড়ে বোঝা যায় যে, এঁর মধ্যে জাগ্রত ছিল আশ্চর্য এক সাংবাদিক প্রতিভা। বাণীভঙ্গী ও আঙ্গিকবোধ সর্বত্রই একেবারে নিখুঁত। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র কথায়—

"নিখুঁত ও বহুমুখী সাহিত্য-নৈপুণ্যের দিক থেকে সমস্ত পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় কেউ নেই, প্রতিদ্বন্দ্বীও আছে কিনা সন্দেহ।"

সাধু বাবাবেক ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা

—ভল্টেয়ার

এক সময়ে ছিলাম আমি বারাণসীতে গঙ্গাতীরে,—ব্রাহ্মণদের পবিত্র প্রাচীন তীর্থে। স্থানীয় ধর্ম ও রীতিনীতির সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে আমার উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। ভারতীয় ভাষা বুঝতাম চলনসই; দেখেছি সবকিছু, শুনেছিও অনেক। আমার সংগী ছিল দোভাষী অমরি, এমন অমায়িক লোক আমার চোখে আর পড়েনি। সে ব্রাহ্মণ আর আমি মুসলমান; মহম্মদ বা ব্রহ্মা নিয়ে একটিবারও তর্ক করিনি আমরা। নিজ নিজ প্রথায় দিতাম ভক্তি-অঞ্জলি, লেমনেড পান করতাম একই বোতল থেকে, খেতাম একই ভাত। ঠিক দুটি ভাইয়ের মতো।

একদিন গেলাম গাভানির মন্দিরে। অনেক দল সন্ন্যাসী দেখলাম সেখানে এবং আরও অনেক সাধু—সেই প্রাচীন ঋষিদের শিষ্য! এই সব লোকের ভাষা খুবই বিখ্যাত,—সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণদের নিজস্ব ভাষা। এই ভাষায় বেদ বলে একটি পবিত্র গ্রন্থও আছে। জেন্দ অবেস্তার কথা বাদ দিলে এটিই বোধ হয় এশিয়ার সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। এক সন্ন্যাসী এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করছিলেন, আমি যাচ্ছিলাম পাশ দিয়ে।

হঠাৎ তিনি গর্জে উঠলেন—

"রে দুরাত্মন! স্বর-সংখ্যা গণনায় তুই এসে গোল বাঁধিয়েছিস্। এর ফলেই আমার আত্মা যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে কাকাতুয়ার বদলে কাকরূপে!"

তাকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে একটা টাকা বের করে দিলাম। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই দুর্ভাগ্যবশত হাঁচি দিয়ে ফেললাম এবং সেই শব্দে

জেগে উঠলেন আর এক সাধু। তিনিও ধ্যানলোকের আনন্দে বুঁদ হয়ে ছিলেন।

"একি বজ্রনিনাদ! আমি এ কোথায়?"—তিনি বলছিলেন—"অহো কি নিদারুণ অধঃপতন! আমি যে এখন আর আমার নাসিকাপ্রান্ত দর্শন করতে পারছি না, অন্তর্ধান হয়েছে স্বর্গীয় দর্শনজ্যোতিঃ!"

আমি বললাম—

"নাসিকাপ্রান্ত দেখতে না পাবার কারণ যদি আমিই হয়ে থাকি তো আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই মুদ্রাটি রাখলাম প্রণামী,—স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ফিরে আসুক আবার!"

বুদ্ধি করে এই বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করে এলাম অন্য সন্ন্যাসীদের কাছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কয়েকটা সুঁচ-কাঁটা বের করে আমার বাহুতে ও উরুতে ফোড় দিতে চাইল—ব্রহ্মার নামে। সুঁচ কটা কিনে নিলাম,—কার্পেট সেলাই তো চলবে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ চলছিলেন একপায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কারও পায়ে ছিল শৃঙ্খল, কেউবা তাঁর মাথা ঢুকিয়ে রেখেছেন দশসেরী এক পস্থুরির নীচে। বেশ মজার সব লোক! অমরি এবার আমাকে নিয়ে এল বিশিষ্ট এক সাধুর গুহায়। নাম তাঁর বাবাবেক। দিগম্বর তিনি বনমানুষের মতোই। গলায় বাঁধা একটা শেকল, ওজন হবে তার আধমনের বেশী। অদ্ভুত একটা কাষ্ঠাসনের উপরে তিনি সমাসীন; অসংখ্য তীক্ষ্ণ পেরেক ফুড়ে আছে নিতম্বের মাংসের মধ্যে! কিন্তু তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন ফুলের গদিতেই উপবিষ্ট! অনেক ধরণের মেয়েলোক তাঁকে ঘিরে রয়েছে উপদেশবাণী শোনার জন্যে। পারিবারিক প্রসঙ্গেরই দ্রষ্টা তিনি এবং সব দেখে শুনে যা মনে হয় পসার তাঁর প্রচুর! অমরি ও তাঁর মধ্যে এক আলোচনার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম একবার।

অমরি বলছিল—

"সাধুবাবা! আপনার কি আজ্ঞা হয়, সপ্তজন্মচক্র পরিক্রমার পরে আমি পৌছব সেই ব্রহ্মধামে?"

"তা, নির্ভর করছে তোমার জীবনযাত্রার উপর!"

অমরি বলল—

"আমি চেষ্টা করি সৎভাবে জীবনযাপন করতে,—সৎস্বামী, সৎপিতা ও সৎবন্ধু হতে। ধনীদের টাকা ধার দিই আমি বিনা সুদে, গরীবদের করি দান। আমার প্রতিবেশীর সুখশান্তিও আমার জীবনের কাম্য!"

সাধু জিজ্ঞেস করলেন—

"তা পৃষ্ঠদেশে স্ট্ঁচ বা পেরেক ফুড়েছ কখনো?"

"না বাবা, সেরকম তো করিনি।"

"অতীব দুঃখের কথা! কখনোই তুমি পৌছতে পারবে না উনবিংশ স্বর্গে! তোমার জন্যে করুণা হয়!"

"তা হ'ক, আমার ভাগ্য নিয়ে আমি তো খুব শান্তিতেই আছি; তীর্থ করে যদি আমি সৎকাজে ব্রতী হই, আর পরলোকে গিয়ে পাই শান্তিতে বিশ্রামের স্থান—উনবিংশ কি বিংশস্বর্গে কী আসে যায় আমার? এখানে সৎজীবন যাপন ও ব্রহ্মলোকে শান্তিময় বিশ্রাম—এই কি যথেষ্ট নয়? আচ্ছা, আপনি এই বাবাবেক সাধু,—আপনি এত সব কাঁটা ও শেকল নিয়ে যাবেন কোন স্বর্গে বলুন তো একবার?"

"পরত্রিংশ স্বর্গে!"

"আপনার বিনয় অতি চমৎকার!"—অমরি বলে উঠল,—"আমার চেয়ে ঊর্ধ্বে আপনার স্থান ভেবে রেখেছেন তো বেশ! এ আপনার উচ্চ দুরাশার ফলমাত্র। এ জীবনে যারা মানসম্মানের জন্যে ঘুরে তাদের আপনি ঘৃণাভরে

পতিত মনে করেন,—অথচ পারলৌকিক সম্মানের জন্যে এত আগ্রহ কেন আপনার? সেখানে আমার চেয়ে ভালো ব্যবহার পাবেন আশা করেন কোন হেতুতে? জানবেন, আপনি আপনার ঐ লোহা-কাঁটা ও শেকল নিয়ে যা দান করেন দশ বছরে—আমি তার চেয়ে ঢের বেশী দান করি মাত্র দশ দিনে! গলায় শেকল ঝুলিয়ে নগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছেন এতে ব্রহ্মার আসে যাচ্ছে কী? দেশের খুব উপকার সাধন করছেন বলে মনে করেন? আপনার মতো যাঁরা সব নাকের ডগায় তাকিয়ে থাকেন বা ঘাড়ে নিয়ে থাকেন ভারী ভারী পাথর—তাদের সবার চেয়ে শতগুণ শ্রদ্ধা করি আমি তাকে যে শুধু শাকসব্জি লাগায় বা মাঠে লাঙল ঠেলে।"

অমরি এবার তার গলার স্বর নরম ক'রে এনে খুব প্রশংসা করল এই সাধু-বাবাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে শেকল ও কাঁটা ছেড়ে এসে স্বাভাবিক-ভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য করাল। ধোয়া মোছা হ'ল তাঁকে, গায়ে লাগানো হ'ল সুগন্ধি, পরানো হ'ল ভদ্র পোশাক। একপক্ষকাল ভদ্র-জীবনই কাটালেন তিনি এবং নিজেই স্বীকার করলেন যে আগের চাইতে সুখে আছেন শতগুণে। কিন্তু সমস্ত চেলাচামুণ্ডারাই যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, মেয়েরাও কাছে ঘেঁষেনা আর!

কাজেই, শ্রদ্ধালাভের প্রবল আকর্ষণে অমরিকে ছেড়ে আবার তিনি ফিরে এলেন তাঁর সেই কাঁটা আর শেকলের কাছেই!

জিনট ও কলিন

—ভল্টেয়ার

অনেক লোকেই চাক্ষুষ দেখেছে এই জিনট ও কলিনকে;—আভারণের ইসয়ের গাঁয়ের ছেলে তারা। এই জায়গাটা শিক্ষা দীক্ষা ও লৌহশিল্পের জন্তে পৃথিবীতে পরিচিত। জিনট নামজাদা এক সহিসের ছেলে আর কলিনের বাবা স্থানীয় এক চাষী মজুর, খুব চরিত্রবান লোক। কলিনের বাবা গরীব মানুষ, তার পক্ষে আয়কর সামরিককর, পরিচ্ছদকর, চৌকদারীকর, আবগারীকর ব্যক্তিগতকর এবং আরো নানারকম কর মিটিয়ে দিয়ে সংসার চালানই দুষ্কর হয়ে উঠত।

সমস্ত আভারণের মধ্যেই জিনট ও কলিনের মতো ছেলে নেই। এ ওকে প্রাণের মতো ভালোবাসে, সবরকম গোপন কথায় সবরকম দুষ্টুমিতেই দুজনে গলায় গলায় ভাব। এ ভারী মধুর সম্বন্ধ। ছেলে বেলায় এইসব খুঁটিনাটি, এইসব ছোটখাট কথাই পরিণত জীবনে দেখাসাক্ষাত হ'লে লোকে কত খুশিভরে মনে করে থাকে।

তাদের একসংগে পড়াশুনো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,—তখন একদিন একটি লোক জিনটের হাতে এনে দিল ভেলভেটের নীল একটা কোট ও চমৎকার ফ্যাশানের একটা পশমী সার্ট। সংগে জিনটের বাবার চিঠি। কলিন বিস্মিত হয়ে দেখতে থাকে,—তা ব'লে তার ঈর্ষা হয়নি একটুও। জিনট কিন্তু সংগে সংগেই একটা বাহাদুরীর ভাব দেখায়,—কলিন তা দেখে একেবারেই ব্যথিত ও বিব্রত হয়ে পড়ে।

এরপরে জিনট পড়াশুনো একদম ছেড়ে দিল। আয়নায় নিজের মুখখানা দেখে দেখে সে গর্বে ফুলে ওঠে,—ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

কিছুদিন পরেই দ্রুতগামী ডাকে এল আর একটা চিঠি—চিঠি পাওয়ার পরমুহূর্তেই ছেলেকে সোজা প্যারী পাঠিয়ে দিতে হবে। জিনট ঘোড়ার গাড়িতে উঠে কলিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, মুখে গর্বিত হাসি! কলিন নিজের দীনতা বুঝতে পেরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। জিনট চলে গেল, আপন গৌরবে বিজয়ীর মতো।

উৎসুক পাঠকেরা এখানে শুনে রাখুন যে মঁশিয়ে জিনট (ছোট্ট জিনটের বাবা) একটু একটু ক'রে বর্তমানে বাগিয়ে নিয়েছেন বিরাট এক সম্পত্তি। জানতে চাইছেন,—কি ক'রে লোকে সৌভাগ্য অর্জন করে? উত্তর—সৌভাগ্য হয় ব'লেই। মঁশিয়ে ছিলেন সুপুরুষ, স্ত্রীটিও ছিলেন সুন্দরী, ঢলোঢলো ছিল তাঁর দেহের লাবণ্য। এক মোকদ্দমার ধাক্কায় তাঁরা এসে পড়েন প্যারীতে এবং ক্রমে সর্বস্বান্ত হন। কিন্তু ভাগ্য ভিখারীকে রাজা করে, রাজাকে ভিখারী। আর সেই ভাগ্যের খেয়ালেই তাঁরা আবার এসে পড়লেন এক সামরিক হাঁসপাতালের ম্যানেজারের স্ত্রীর কাছে। এই ম্যানেজারটিকে বেশ প্রতিভাবান বলতে হবে বৈ কি! দশবছর ধরে কামানের গোলায় যে ক'টা মানুষ মরেনি, তাঁর দ্বিগুণ সৈন্য মেরেছেন তিনি এক হাঁসপাতালে বসেই!

জিনট মহিলাটিকে বেশ তৃপ্তিই দান করলেন, এবং জিনটের সুন্দরী স্ত্রীও তৃপ্তি দান করলেন ম্যানেজারকে।

ফলে, জিনট শিগগিরি এই কর্মকর্তার কারবারের মধ্যে অংশীদার হলেন এবং একেএকে আরো অনেক ব্যাপারে হাত বাড়ালেন তিনি। জোয়ারের মুখে পড়লে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি বা করা যায়? দেখতে না দেখতে একদিন শেষে অনায়াসেই হওয়া যায় মস্ত বড় ধনী। তখন দুই তীরের জনতা তোমাকে পাল তুলে যেতে দেখে বিস্ময়ে হাবার মতো তাকিয়ে থাকবে, ভাবতে ভাবতে হতভম্ব হয়ে যাবে—কী ক'রে লোকটা

এত ধনসম্পত্তি করে ফেলল? সব কিছুতেই তোমাকে তারা হিংসা করবে,—তোমার বিরুদ্ধে লিখবে গাদা গাদা পুঁথিপত্র—যা তুমি একবার পড়েও দেখবে না। মঁশিয়ে জিনটেরও হ'ল তাই। দেখতে দেখতে তিনি হয়ে পড়লেন— মঁশিয়ে দ্য লা জিনটেয়ার।

কিন্তু কলিনের প্রাণটা রয়েছে বরাবরের মতোই দরদী ; পুরানো বন্ধুর কাছে সে লিখল—"তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।" মার্কু ইস জিনট অবশ্যি উত্তর দেওয়া দরকার মনে করে না। কলিন শোকে একেবারে ভেঙে পড়ল।

ছোট্ট মার্কু ইসের জন্যে তার বাবা মা একজন শিক্ষক রাখলেন। এই শিক্ষকটি ছিলেন কায়দাদস্তুর লোক ; নিজে তিনি কিছুই জানতেন না, কাজেই কিছু না জানাটা বেশ ভালোভাবেই শেখাতে পারতেন। বাবার ইচ্ছা ছেলে লাতিন শেখে, কিন্তু মা'র ইচ্ছা তা নয়। অতএব মধ্যস্থতা করার জন্যে আমন্ত্রণ করা হ'ল একজন গ্রন্থকারকে। ইনি সেই সময় কয়েকটা মোহন-সিরিজ লিখে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এঁকেই তাঁদের সংগে এসে চা খাবার জন্যে আমন্ত্রণ করা হ'ল। গৃহস্বামীই প্রথম সুরু করলেন—

"আপনি লাতিন ভাষায় বিশেষ পারদর্শী এবং একজন বিশিষ্ট সুধীব্যক্তি, তাই—"

"আমি? না স্যর, লাতিন জানি না আমি, একবর্ণও না এবং জানিনা বলেই গর্ব অনুভব করি। কারণ, একথা নিঃসন্দেহ, মানুষ তার মাতৃভাষা আরো সুন্দর ক'রে বলতে পারে তখনি—যখন তার পাঠ্য বিষয় মাতৃভাষা ও বিদেশীভাষার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত না হয়ে যায়। আমাদের এই মহিলাদের কথাই ধরুন না,—পুরুষদের চেয়ে তাদের প্রকাশভঙ্গী অনেক সুন্দর, অনেক বেশী মর্যাদাময়। তাই না? তাদের চিঠিপত্র কত প্রাণ-মুখর! হ্যাঁ,

তাদের এই যে শ্রেষ্ঠত্ব তার মূলে রয়েছে শুধুমাত্র লাতিন না জানার সৌভাগ্য।"

"কি, শুনলে তো? আগেই বলিনি আমি?"—মাদাম বললেন—"আমার ছেলেকে আমি বিশিষ্ট একজন বুদ্ধিমান ক'রে তুলতে চাই—সারা দুনিয়ায় সে যাতে নাম রেখে যেতে পারে। তা' এবার বুঝলে তো, লাতিন জানলে সবি মাটি হ'ত। তা ছাড়া, থিয়েটার কি লাতিনে হয়? বলো। কোর্টে কেউ লাতিনে সওয়াল জবাব করে? কেউ কি ভালো-বাসা করে লাতিনে?"

মঁশিয়ে এই সব অপূর্ব জ্ঞানে প্রদীপ্ত হ'য়ে তার মন্তব্য নিবেদন করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হ'ল, তরুন মার্কুইস মিসারো হোরেস আর ভার্জিল নিয়ে মাতামাতি ক'রে তার অমূল্য সময় নষ্ট করবে না। তবে কি সে শিখবে? একটা কিছু তো শিখতে হবে,—ভূগোল একটু দেখলে হয় না?

"কি কাজে লাগবে এই 'ভূগোল? ভূ মানে পৃথিবী, তা তো গোল রয়েছেই!"—শিক্ষক উত্তর দিলেন—"মহামান্য মার্কুইস যখন তার জমিদারী দেখতে যাবেন, সহিস কি চিনবে না কোন পথে নিয়ে যেতে হবে? নিশ্চয়ই বিপথে না যাবার মতো যথেষ্ট চেতনা থাকবে তার, বেড়াবার সময় মানচিত্র আর কাঁটা কম্পাস নিয়ে যাওয়া দরকার হবে না। প্যারী থেকে আভরনি যে কেউ চোখ বুজে চলে যেতে পারে,—কোন দ্রাঘিমার যাচ্ছে তার হিসেব না জানলে কণামাত্রও অসুবিধে ঘটে না।"

"ঠিক কথাই বলেছেন"—বাবা ও মা দুজনেই সায় দেন—"কিন্তু কোথায় যেন শুনেছি বিজ্ঞানের চমৎকার একটি বিষয় আছে—নামটা জ্যোতিষশাস্ত্রই বোধ হয়।"

"সে আরো হাস্যকর!"—শিক্ষক মাত্রা চড়িয়ে দেন,—"গ্রহ-নক্ষত্রের

নির্দেশ মতো এই পৃথিবীতে কে চালায় তার জীবন? আর তা ছাড়া এটা কি আপনি একটুও দরকার মনে করেন যে মার্কুইস গ্রহণকাল হিসেব করতে গিয়ে মাথা ফেটে মরবে—ঠিক সময়টি তো পাঁজিতেই লেখা আছে স্পষ্টাক্ষরে। শুধু তাই নয়, সেখানে তার সাথে আছে উৎসব-উপবাসবিধি, তিথি নক্ষত্র এবং ইউরোপের সমস্ত রাজকন্যাদের বয়সের নির্ভুল তালিকা।"

মাদাম তো শিক্ষকটির সংগে একেবারেই একমত। ছোট্ট মার্কুইসও ভারী খুশি; কিন্তু তার বাবা কিছুটা যেন দোমনা।

"তা হ'লে ছেলে কী শিখবে?"—তিনি জিজ্ঞেস করলেন। বিজ্ঞ হিতৈষী ব্যক্তিটি বললেন,—"নিজেকে সবার প্রিয় করে তুলতে হবে। সবাইকে যে খুশি রাখতে শিখেছে, সবি শিখেছে সে। এবং এই বিশিষ্ট বিদ্যাটি মার্কুইস তার মার কাছ থেকেই শিখে নিতে পারবে,—অন্য শিক্ষকদের নিয়ে ঝামেলা করারও দরকার করবে না।"

মাদাম উচ্ছ্বসিত হয়ে এমন হিতৈষী বন্ধুকে আলিঙ্গন করে বললেন—"এবারে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে আপনার মতো বিজ্ঞজন সারা পৃথিবীতেই খুঁজে পাওয়া শক্ত। আমাদের ছেলের শিক্ষার ভার আমি আপনার হাতেই দিলাম। তবু যেন মনে হচ্ছে ওকে একটু আধটু ইতিহাস শেখালে ভালো হ'ত না?"

"না, না মাদাম! তাতে লাভটা হবে কী? বর্তমান ইতিহাসের চেয়ে শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক আর কী আছে? একজন বিজ্ঞলোক বলেছেন—"সমস্ত প্রাচীন ইতিহাসই পুরোনো একটা ছেঁড়া লিষ্টি ছাড়া কিছুই নয়। এবং বর্তমান ইতিহাসও এক হট্টগোল বিশেষ—তার মাথামুণ্ড বুঝে ওঠা ভার। সম্রাট সারলেমনি যে ফ্রান্সের দ্বাদশ

নাইটের আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সম্রাটের উত্তরাধীকারী যে তোত্‌লা ছিলেন তাতে মশিঁয়ে মার্কুইসের এসে গেল কি?"

শিক্ষকটি বলেই যাচ্ছেন—"শিশুদের মন মেরে ফেলা হচ্ছে বাজে যত শিক্ষার জঞ্জালে। যত সব বিদঘুটে এবং অর্থহীন বিজ্ঞানের চাপে! আমার মতে—জ্যামিতিই হ'ল সর্বাপেক্ষা অপদার্থ বিদ্যা; প্রতিভার সমস্ত স্ফুলিংগকেই তা ফুৎকারে নিভিয়ে ফেলে। এই হাস্যকর বিজ্ঞানটির বিষয়বস্তু হ'ল—রেখা, বিন্দু ও ভূমি—যার অস্তিত্বই নেই বাস্তব জগতে। হাজার দশেক বক্র রেখা কল্পনার ক্যাপামিতে এক একটা বৃত্ত ও তৎসংলগ্ন একটা সরল রেখার মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হ'ল,—অথচ তার মধ্য দিয়ে কিন্তু একটা খড়কুটোও পুরে দেওয়া যায় না। এক কথায়—জ্যামিতি হচ্ছে একটা উপাদেয় ইয়ার্কি।"

মঁশিয়ে ও মাদাম যে শিক্ষকের সব কথাই বুঝেছেন তা নয়, তবে তাঁর সংগে তাঁরা একমত।

"মঁশিয়ে মার্কুইসের মতো একজন সম্রান্ত মানুষের পক্ষে"—গ্রন্থকার বলে চললেন—"এসব বাজে বিষয় নিয়ে পড়ে থেকে মাথাটি খেয়ে ফেলা উচিত নয়। কখনো যদি তাঁর জমিদারীর কোনো নক্সা করার জন্যে জ্যামিতি-বিদ্যার দরকার হয় তো—টাকার লোভেই ছুটে আসবে কত আমীন! তাদের যাকে খুশি রাখতে পারেন তিনি। আর তাঁর দূরবিস্তৃত সম্রান্ত বংশের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করতে চান তো একজন ঐতিহাসিক ডাকিয়ে আনতে পারবেন না? সবরকম আর্ট বা ললিতকলার কথাও তাই। এক তরুণ মার্কুইস কোনো শুভগ্রহের সুনজরে জন্মলাভ করেছে বলেই চিত্রকর, সংগীতজ্ঞ বা স্থাপত্যশিল্পী বা ভাস্কর হয় না—কিন্তু ঐশ্বর্য ও মর্যাদা অনুপাতে তাই সে বিকশিত করে তোলে। এবং এসব চর্চা করার চেয়ে উৎসাহ দেওয়াটাই বরং তার পক্ষে ঢের ঢের বড় কথা।

মার্কুইসের এদিকে যে রুচি আছে তাই তো যথেষ্ট। এইজন্যেই একথা বলার উপযুক্ত হেতু রয়েছে যে সত্যিকার গুণীলোক (মানে, ধনী লোকের কথাই বলছি) কিছুই জানে না অথচ সবই জানে! কারণ, বস্তুতই—যেসব জিনিষ তারা কিনতে চায় এবং টাকা খরচ করে কেনে,—তাদের দোষগুণের বিচার ভালোভাবেই করতে জানে তারা।"

এই বিনীত বক্তাটি আবারো বলতে সুরু করলেন—"মাদাম, আপনি যথার্থই বলেছেন মানুষের মহান উদ্দেশ্য হ'ল সমাজে একটা বড় আসন দখল করে বসা, একথা তা হ'লে খুব গুরুত্ব নিয়েই জিজ্ঞেস করছি,—তা বিজ্ঞানের সাহায্যে কি এবিষয়ে কোনো সফলতা লাভ করা যায়? কোনো পদস্থ লোকে কি ভুলেও একবার জ্যামিতির কথা চিন্তা করে? বিশিষ্ট রুচিবিদদের কেউ কখনো গিয়ে কি জিজ্ঞেস করেছে—"আচ্ছা মশাই, আজ ভোরে সূর্যের সাথে সাথে উদয় হয়েছে কোন নক্ষত্র? রাতে খেতে বসে কে জানতে চায় কেশবতী ক্লডিয়া পার হ'ল কিনা রাইন?"

"কেউই জানতে চায়না, সে ঠিক।"—বললেন মাদাম। শুধু তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের দৌলতেই তিনি ঠেলে উঠেছেন সমাজের একটা বিশিষ্ট আসনে। তাই তিনি বলছিলেন—"এসব পচা পদার্থ দিয়ে ছেলের প্রতিভা নষ্ট করে ফেলব এ আমার কাম্য নয়। কিন্তু একটা কিছু তো শিখতে হবেই। কারণ, একজন তরুণ লর্ডকে তো মাঝে মাঝে সমাজের মাঝখানে সবার চোখ ঝলসে দিয়ে দাঁড়ানো দরকার,—আমার স্বামী ঠিকই বলেছেন। এক বিশপ আমাকে একবার বলেছিলেন যে দুনিয়ায় যতরকম জ্ঞানবিজ্ঞান আছে বলে জানা যায় তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে—কি যেন, নামটা ঠিক মনে নেই। হ্যাঁ, প্রথম অক্ষর 'উ'।

"প্রথম অক্ষর 'উ' তো!—উদ্যানকর্ষণবিকর্ষণবিদ্যা। কি, ঠিক না?" —শিক্ষকটি চট করে উত্তর জোগালেন।

"না উদ্যানকর্ষণের কথা তো বলেন নি। হ্যাঁ, 'উ' নয় সুরুতে 'কু'—শেষে 'জ'।"

"আঃ, তাই বলুন মাদাম। কুলজী! কুলজী অবশ্যি বিখ্যাত এক বিশিষ্ট বিদ্যা, কিন্তু বর্তমানে অচল হয়ে গেছে। গাড়ীর দোরে যেমন "আসুন আসুন" ভঙ্গীতে হাত এঁকে রাখাটা বেচাল হয়ে গেছে। একদিন সুশাসিত ষ্টেটে এটা বিশেষ কাজেরই ছিল, কিন্তু যাই একবার বেশী চলিত হয়ে যায়, তারই কদর থাকে না আর।"

শেষ পর্যন্ত সবরকম বিদ্যার দোষগুণ বিচারের পরে স্থির হ'ল,—নাচই শিখবে মার্কুইস। স্বভাবের প্রভাব অসীম এবং তারই প্রসাদে সে এপথে উন্নতি করল চমৎকার। গাথায় ও গানে অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠল তার দক্ষতা। যৌবন-সৌন্দর্যের সাথে এই আশ্চর্য গুণটির মণিকাঞ্চন সংযোগে সে বিশিষ্ট একটি উদীয়মান যুবক হয়ে উঠল। মেয়েদের প্রণয়ী হ'ল সে, সব সময়েই তার মাথায় গান গুঞ্জন করে ফেরে—এবং তাই এনে সে উপহার দেয় প্রণয়িনীদের। ব্যাকাস ও কিউপিড্ ঘেঁটে ঘেঁটে লেখে একটা সনেট, নাইট এণ্ড ডে, চারম্স ও এ্যালারমস ঘেঁটে আর একটা। কিন্তু মহা মুস্কিল! গানের লাইন বেমিল বা ছোট বড় হয়ে পড়ে!—তাই গান-পিছু বিশ শিলিং খরচ ক'রে সেগুলিকে শুদ্ধ করে নেয়। এই ভাবেই সে এমন কি 'লিটিরারী ইয়ার' পত্রিকাতে পর্যন্ত বিশিষ্ট স্থান লাভ করল,—লা ফেয়ার, হ্যামিল্টন, ম্যারাসিন, ভয়েটুর প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের পাশেই!

ম্যাদাম ভাবলেন, এবার আর রোখে কে? তিনি নামজাদা লোকের মা ব'লে বিখ্যাত হয়ে পড়লেন! তাই প্যারীর সব নামজাদা লোকেদের আমন্ত্রণ করলেন একটা ভোজে। যুবক মার্কুইসের মাথাই ঘুরে গেল,

কথার মানে না বুঝেই অনর্গল কথা বলে যাওয়ার আর্ট অর্জন করল সে।

ছেলের এমন বক্তৃতা শক্তি দেখে মঁশিয়ে মার্কুইস ছেলেকে লাতিন শেখাননি ব'লে সত্যিসত্যি আফশোষ করতে লাগলেন। কারণ, তাহ'লে আইন-বিভাগে সে যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারত! কিন্তু মায়ের রুচি অতটা অমার্জিত নয়,—ছেলেকে করতে চান তিনি সমাজের জনপ্রিয় নেতা। কিন্তু ইতিমধ্যে ছেলে পড়ল প্রেমে! অথচ সামাজিক যশ লাভের চেয়েও ব্যয়বহুল হ'ল প্রেমলাভ, বহু অর্থই উড়ে গেল। এদিকে তার বাবা মাকেও লর্ড চালে থাকবার জন্য খরচ করতে হচ্ছে প্রচুর!

পাড়ায়ই একটি তরুণী বিধবা ছিল,—সংগতি-সম্পদও তার মন্দ নয়। মাদাম ও মঁশিয়ে জেনেটের বিপুল সম্পত্তি বিশিষ্টভাবে রক্ষার জন্যেই একটা মহান অভিলাষ জাগল তার, এবং সেই সাথে নিজের কাজও হাঁসিল করে নেওয়া,—মানে মার্কুইসকে বিয়ে করা। সে তাকে প্রেমে হাবুডুবু খাইয়ে রাখল এবং নিজে যে উদাসীন নয় তাও তাকে বুঝতে দিল। ধীরে ধীরে সে তার মোহজাল বিস্তার ক'রে মার্কুইসকে হাত করে ফেলল;—বিশেষ যে একটা বেগ পেতে হ'ল তাও নয়। মার্কুইসকে কখনো সে প্রশংসা করে, কখনো দেয় উপদেশ। ক্রমে ক্রমে সে মার্কুইসের বাবা-মারও বিশেষ প্রিয় হ'য়ে উঠল। বিয়ের প্রস্তাব আনলেন এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী। বাবা-মা দুজনেই সোৎসাহে এবং সগৌরবেই গ্রহণ করলেন এই প্রস্তাব,—তাদেরই একমাত্র পুত্ররত্নকে এই পরিচিতা মেয়েটির হাতেই সমর্পণ করা হবে।

তরুণ মার্কুইস এবার বিয়ে করতে যাচ্ছে তার প্রণয়িণীকে—তার প্রাণের প্রতিমাকে, তার দয়িতাকে। এই পরিণয়-সম্পর্কে সমস্ত আত্মীয়দেরই

নিমন্ত্রণ করা হ'ল। বিয়ের আয়োজন হতে লাগল, বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ আর গানবাজনার বিপুল ব্যবস্থা!

একদিন সে প্রেমালাপ করছিল তার ভাবীস্ত্রীর সাথে—কয়েকদিন পরেই তো সে তাকে নিবেদন করবে প্রেম, স্নেহ, বন্ধুত্ব ও প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি! প্রাণভরা ভালোবাসার কথায় একদিন তারা মশগুল হয়েছিল। যেন তাদের এই মিষ্টি জীবনকে তারা রঙীন কথার বাঁধনে পার্শেল করে পাঠাচ্ছিল মিলনদিনের মুখে! ঠিক তখনি মার্কুইসের মায়ের একটি পরিচারিকা এসে হাজির হ'ল,—ভয়ে সে একেবারেই আধমরা!

"ভয়ানক খবর। পুলিশ এসে আপনাদের ঘরবাড়ী তচ্‌নচ করে ফেলেছে, পাওনাদারেরা সব কিছুই হাত করে নিয়েছে। আর, আপনাদেরও আটক করবার কথা হচ্ছে। আমি বাবু, আপনার কাছে ছুটে এসেছি আমার মাইনেটার জন্যে!"

"আচ্ছা?"—মার্কুইস বলে—"এর মানে, এরকম হঠাৎ ঘটার মানে?"

"যাও শিগগিরি গিয়ে ব্যাটাদের একটু শিক্ষা দিয়ে দাও!"—বিধবা মেয়েটি বলে।

বাড়ী ছুটে এল মার্কুইস তার বাবা ও মাকে জেলে নিয়ে গেছে, ঘরের চাকর-বাকর চলে গেছে যে যেদিকে খুশি এবং হাতের কাছে যা যা পেয়েছে নিয়ে যেতে একটুও ভুল করেনি! মা বসে বসে কাঁদছে,—একা, অসহায়! সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো লোকও নেই কাছে। গত জীবনের স্মৃতিটুকু ছাড়া আজ আর কিছু নেই তাঁর,—সেই সুন্দর দিনগুলি, অতীতের ভুলভ্রান্তির নিষ্ঠুর স্মৃতি, আর অসীম ঐশ্বর্যের স্বপ্ন-মরীচিকা!

মা'র পাশে বসে বহুক্ষণ চোখের জল ফেলে সে তাঁকে সাহস করে এটুকু বলল—

"মা ভেঙে প'ড়ো না। মেয়েটি আমাকে প্রাণের মতো ভালোবাসে। শুধু ধনী নয় সে, প্রাণটাও তার উদার! এটুকু আমি নিজেই বলতে পারি তোমাকে। এখনি যাচ্ছি আমি, তোমার কাছে নিয়ে আসছি তাকে।

প্রণয়িণীর কাছে ছুটে এসে সে দেখে—অপূর্ব সুন্দর একটি অফিসারের সংগে সে গোপনে আলাপ পরিচয় করছে।

"একি! তুমি? মঁশিয়ে মার্কুইস্! এখানে কি করছ? মাকে ফেলে রেখেছ ওইভাবে? সত্যি, আজ তার কী দুর্ভাগ্য! যাও, তার কাছে গিয়ে এক্ষুণি বলো যে আমি তার কল্যাণ কামনা করছি। হ্যাঁ ভালো কথা, আমার একজন পরিচারিকা দরকার এবং নিশ্চিতই তার আবেদন আমি অগ্রগণ্য ব'লে বিবেচনা করব।"

অফিসারটি বলল, "বাঃ, বেশ ছেলেটি তো! কেমন ফিটফাট, তা, তুমি আমার কোম্পানীতে ঢুকতে চাও তো আজি নিয়ে নিচ্ছি তোমাকে।"

মার্কুইস স্তম্ভিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটল তার প্রবীণ শিক্ষকের খোঁজে, সমস্ত যন্ত্রণা বুকে চেপে রেখে সে একান্ত বাধ্যের মতো তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করল। শিক্ষকটি উপদেশ দিলেন, তার মতো মার্কুইসেরও এখন শিক্ষক-জীবন গ্রহণ করা উচিত।

মার্কুইস হতাশভাবে বলে,—"কিছুই যে জানিনা আমি, কিছুই তো শেখাননি আপনি,—আমার দুর্ভাগ্যের কারণও আপনিই।"—বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে।

"প্রেমের গল্প লিখুন!"—উপস্থিত এক বিজ্ঞ ভদ্রলোক উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিলেন,—"ও তো প্যারীর রসগোল্লা! স্রেফ্ লুফে নেবে!"

যুবকটি হতাশায় পাগলের মতো ছুটে এল তার মায়ের দীক্ষাগুরুর কাছে। ইনি ছিলেন এক প্রভাবশালী সাধু, একমাত্র বিশিষ্ট বংশের মহিলাদের আত্মার উন্নতি নিয়েই তিনি তার মহামূল্য মস্তিষ্কটি চালনা করতেন। মার্কুইস জিনট তাকে দেখতে পেয়ে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ল।

"একি, একি মঁশিয়ে মার্কুইস! হেঁটে এসেছ তুমি! তোমার মা,—সম্ভ্রান্ত সেই মহিলাটি কেমন আছেন?"

হতভাগ্য যুবকটি তাদের সমস্ত বিপদের কথা বলল এবং সাধুটিও ক্রমে ক্রমে স্থির গম্ভীর একটি তুরীয় ভাব ধারণ করলেন।

তিনি বললেন—"ভাগ্যই তোমাদের খারাপ! ভগবানের ইচ্ছায়ই তোমাদের এমন হয়েছে। সবই দয়াময়ের ইচ্ছা। তবে ধনদৌলত আসলে আত্মাকেই বিষাক্ত করে। তোমার মাকে বিপদের মধ্যে টেনে এনে ভগবান আসলে তার উপরে আশীর্বাদই বর্ষণ করেছেন।"

"হ্যাঁ, সাধুবাবা।"

"এখন যে সে প্রকৃত ঐশ্বর্যের প্রতিমূর্তি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারবে—তা নিঃসন্দেহ।"

"কিন্তু সাধু বাবা,"—মার্কুইস বলে—"ইতিমধ্যে এই পৃথিবীতেও কি কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যায় না?"

"তা হ'লে এবার এস তুমি, কেমন? আমার জন্যে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা অপেক্ষা করছেন।"

মার্কুইসের তখন ফিট হবার দশা। সমস্ত বন্ধুদের কাছেই পেল সে আশ্চর্য ব্যবহার। তার এই বয়স পর্যন্ত যে জ্ঞান হয়নি—এই বারো ঘণ্টার মধ্যেই সে তার চেয়ে বেশী জ্ঞান লাভ করল।

গভীর শোকে অভিভূত হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল বিমূঢ়ের মতো। তখন সে একটা পুরানো ধরণের জুড়ি গাড়ী এগোতে দেখল,—পিছু পিছু মস্ত

বড় একটা মালগাড়ী। গাড়ীর ভেতরে সুন্দর পোষাক পরা একটি যুবক। চমৎকার দেখতে, গোলগাল চেহারা,—সমস্ত চেহারায়ই ফুটে আছে শান্তি ও সন্তোষ! পাশেই শ্যামবর্ণা মোটাসোটা একটি মেয়ে,—দেখতে মন্দ নয়। গাড়ীটা ফ্যাশান-দস্তুর গাড়ীর মতো উপেক্ষাভরে গড় গড় করে ছুটে গেল না, গাড়ীর সেই যুবকটি তাই শোকাচ্ছন্ন মার্কুইসকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পেল।

"সে কি! আমাদের জিনটই বোধ হয়!"—গাড়ীর সহিস যুবকটি ব'লে ওঠে। মার্কুইস নিজের নাম শুনে চমকে ওঠে, গাড়ীটাও থমকে দাঁড়ায়।

"হ্যাঁ আমিই সেই জেনেট।"—মার্কুইস দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

তখন সেই মোটাসোটা যুবকটি গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পুরানো বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরল। জিনট চিনতে পারল কলিনকে,—দুঃখে লজ্জায় ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে।

কলিন বলল—"আমাকে তুমি ত্যাগ করেছ, কিন্তু তুমি বড়লোক হ'লেও তোমাকে চিরদিনই ভালোবাসব আমি।"

মর্মাহত জিনেট বিব্রত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার জীবন-কাহিনীর একটা অংশ বিবৃত করল।

"আগে চলো হোটেলে, তারপর সবটা বলবে'খন।"—কলিন বলল—"এই আমার স্ত্রী,—একে তুমি স্নেহ-সম্ভাষণ করো। তারপরে চলো একসংগে খেয়ে আসি।"

তিনজনে মিলে পায় হেঁটেই রওনা হ'ল,—পিছু পিছু মালপত্তর।

"আচ্ছা এসব কেন, এসব তোমার?"—জিনট বলে।

"হ্যাঁ আমাদের। এই তো আমরা গাঁ থেকে আসছি,—গাঁয়ে আমাদের টিন ও তামার কারখানা আছে। বড় একজন ব্যবসায়ীর

মেয়েকে বিয়ে করেছি আমি,—তাদের নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্রের কারবার আছে। খুব পরিশ্রম করি আমরা, তাই ভগবান আমাদের সুদিন দিয়েছেন ; কিন্তু তা ব'লে জীবনযাত্রা বদলে ফেলিনি। সুখেই আছি আমরা। আমাদের বন্ধু তুমি, তোমাকেও সাহায্য করব, কিন্তু বন্ধু, আমাদের কাছে আর মার্কুইস হয়ে থেক না। বন্ধুত্বের চেয়ে বড় দুনিয়ায় আর কিছুই নেই। আমাদের সাথেই গাঁয়ে চলো, আমাদের কাজ কারবার শিখিয়ে দেব তোমাকে। বেশী শক্ত কাজও নয়, আমাদের সাথে অংশীদার করে নেব তোমাকে এবং সবাই মিলে সুখে ঘর বাঁধব পল্লীর এক কোণে।"

বিস্মিত জেনেট বিমূঢ় হ'য়ে পড়ল ব্যথায় ও আনন্দে,—ভালোবাসায় ও লজ্জায়। সে আপন মনে শুধু বলছিল—

"সব বিলাসী বন্ধুরাই আমাকে প্রতারণা করেছে, কিন্তু এই কলিন,— যাকে আমি ঘৃণা করেছি—একমাত্র সেই আজ আমাকে সাহায্য করতে রাজি!"

কী নিদারুণ শিক্ষা! কলিনের সাহচর্যে আজ জেনেটের প্রাণের মধ্যে জেগে উঠেছে মহৎ আদর্শ! সমাজ এই আদর্শ বোধটুকু এখনো তার প্রাণ থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। তার বাবা মাকে ফেলে একা চলে যেতে তাই তার ইচ্ছে হ'ল না।

"আমরাই তোমার মাকে দেখব। তোমার বাবা তো এখন জেলে, —আর তা ছাড়া ওসব ব্যাপার আমি ভালো বুঝিও না। তবে পাওনা-দারেরা যখন দেখবে যে ঋণ পরিশোধ করবার মতো কানাকড়িও তাঁর হাতে নেই—তখন সামান্য কিছু পেলেই সব মিটিয়ে ফেলতে চাইবে। সব ব্যাপার আমিই দেখব তখন।"

কলিন শিগগিরি তার বন্ধুর বাবাকে জেল থেকে মুক্ত করল। জিনট

তার বাবা মাকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এসে আগের ব্যবসা সুরু করল এবং বিয়ে করল কলিনেরই এক বোনকে। বোনটিও ছিল ভাইয়ের মতোই ভালো, জিনটকে সে সুখে শান্তিতে রাখল। জিনট ও তার বাবা মা এবারে হাড়ে হাড়ে বুঝল যে বিলাসের মধ্যে শান্তি নেই।

কোজি স্যাংটা

(আফ্রিকার একটি উপাখ্যান)

—ভল্টেয়ার

মহান কোনো মঙ্গলের খাতিরেও ছোটখাট অন্যায় কাজ ঠিক নয়, এটা একটা মিথ্যা নীতি কথা। বিখ্যাত মহাপুরুষ সাধু আগষ্টাইনের মত ছিল তাই। তিনি একটি ভ্রমণকাহিনীতে তা স্পষ্টই করেই বিবৃত করেছেন—"বুক অফ দি সিটি অব গড্" বা "ঈশ্বরের রাজ্য" নামক গ্রন্থে।

হিপ্পোতে ছিলেন এক সাধুবাবা। খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃ সম্প্রদায় বা ব্রাদার সম্প্রদায়ের বিখ্যাত একজন প্রতিষ্ঠাতা তিনি এবং সেই অঞ্চলের সমস্ত মেয়েদেরই ধর্মপিতা। ভগবান প্রেরিত মহাপুরুষ বলে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল, ভাগ্য গণনায়ও হাত ছিল চমৎকার!

একদিন তাঁর কাছে এল একটি মেয়ে। নাম তার কোজি স্যাংটা! সমস্ত রাজ্যের মধ্যেই এমন সুন্দরী আর নেই। মেয়েটির বাবা-মা গোঁড়া ধার্মিক, মেয়েকেও লালন পালন করেছেন গোঁড়া মতে। অনেক প্রেমিকই

মধু-সন্ধানে তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, কিন্তু শিক্ষাগুণে একটিবারও নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেনি। দিন কয়েক হ'ল তার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে—কুপিনো নামক এক হাড় বেরোনো বুড়োর সংগে! তিনি অবশ্যি হিপপোর বিখ্যাত এক আইনজীবী। খিটখিটে রুক্ষ লোক, কথাবার্তা শুধু যে অপ্রীতিকর তাই নয়, তার উপরে চালবাজ ও চটকদার। বিষ ও হুল দুটোই তার জিভে সমভাবে বর্তমান। ভয়ানক ঈর্ষাপরায়ন লোক, তার স্ত্রীর কোনো বন্ধুর সংগে ভালো ব্যবহার করা তার পক্ষে মরে গেলেও সম্ভবপর নয়। বেচারী মেয়েটি কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করল ঐ লোকটিকেই ভালোবাসতে; তিনিই তো তার স্বামী হবেন। মনেপ্রাণে চেষ্টা করল বটে, তবে মনকে কিছুতেই মানাতে পারল না।

সে তার সাধুবাবার কাছে জানতে এল, এই বিয়ে মঙ্গলের হবে কিনা। বৃদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন—

"তোমার গুণই ডেকে আনবে অনেক বিপদ। তোমার স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হবে তুমি তিনবার এবং সেইসূত্রেই অর্জন করবে সাধ্বী নারীর মহিমা।"

এমন কথা শুনে তো সরলা কোজি স্যাংটা একেবারে ভেঙে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে সে সবকথা বুঝিয়ে দিতে বলল। কিন্তু এটুকু শুধু সে জানতে পেল, তিনবার অর্থে একই লোকের সংগে নয়; তিনবার তিনটি বিভিন্ন ঘটনা।

কোজি স্যাংটা এতে উদ্ধত আপত্তি জানাল, এমন কি সে সাধুবাবাকে অপমান করল পর্যন্ত! না কখনো সে অমন সাধ্বী হতে চায় না।

…কয়েকদিনের মধ্যেই বিয়ে হ'ল তার। ঘটা হ'ল খুবই! মুখ বুজে ভীরু লাজে সে চারিদিকের ঠাট্টা ইয়ার্কি সয়ে গেল। কয়েকটি সুন্দর যুবকের সংগে রাতে নাচল সে এবং কি ভাবতে ভাবতে জেগে উঠল ভোরে।

তার ভাবনার কারণ অবশ্যি মুখ্যত তার স্বামী নয়,—অন্য একজন যুবক, রাইবলডজ। কখন যে এই তরুণটি তার মনের রাজ্য জুড়ে আছে,—তা সে নিজেই জানে না। রাইবলডজ যেন কামদেবেরই প্রতিমূর্তি। প্রণয়স্ফুট সারল্যে পরিপূর্ণ তার রূপ,—লীলাচতুর প্রেমিক যুবক সে। কিছুটা খেয়ালী বটে, তবে তা তার দরদীদের মধ্যেই। সমস্ত হিপ্‌পোরই সে বুকের মানিক; তার জন্তেই শহরের সমস্ত মেয়েদের মধ্যে লেগে থাকে ঝগড়াঝাটি, মনোমালিন্ত। রাইবলডজ হঠাৎ কারো প্রেমে পড়ে বসত,—অনেকটা খেয়ালের বশেই। তবে কোজি স্যাংটাকে ভালোবাসল সে প্রাণের মতো এবং সে দুর্লভ নারী ব'লেই তার জন্তে ক্রমেই পাগল হয়ে উঠল।

বুদ্ধিমানের মতো প্রথমে সে নানা দিক থেকেই কোজি স্যাংটার স্বামীর সংগে ভাব জমাতে, চেষ্টা করল। সে তাঁর চেহারা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির খুব প্রশংসা করল, তাস খেলতে বসে ইচ্ছে করেই হারল বারবার এবং রোজই তাকে বিশ্বস্তসূত্রে বলে গেল নিজের সব গোপন কাহিনী। কোজি স্যাংটাও রাইবলডজের মতো এমন সুন্দর পুরুষ দেখেনি কোনোদিন। নিজে সে সচেতনভাবে অতটা না বুঝলেও তার প্রণয়ে ডুবে রইল। নিজে সে বোঝেনি বটে, তার হয়ে স্বামী বুঝলেন সবই। স্বামীটি বুড়ো হ'লেও সন্দেহ-বাই ছিল তার সাংঘাতিক,—তা হ'লে ত শুধু তাঁর উদ্দেশ্যেই সে আসে না! কোনো অছিলা খুঁজে এবার তিনি যুবকটির সংগে ঝগড়া বাঁধিয়ে নিলেন, এবং তাকে তাঁর বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে নিষেধ করে দিলেন।

কোজি স্যাংটা দুঃখিত হ'ল খুবই, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে সাহস পেল না। রাইবলডজের সামনে খাড়া হ'ল বাধার পাহাড়, কিন্তু ক্রমেই তার কামনা তীব্র হয়ে উঠল, সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে তাকে দেখবার প্রতীক্ষায় সে অধীর হয়ে রইল। সাধু-ফকির, ফিরিওয়ালা, বহুরূপী—কতভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে সে তার কাছে যেত, তবু তার প্রিয়ার মনে কোনো নির্দিষ্ট

পরিবর্তন আনতে পারল না। কোজি স্যাংটা যদি তার প্রণয়ীর সংগে হাতে হাত মিলিয়ে চলত—তবে তারা এমন ব্যবস্থাও করতে পারত যে স্বামীর সন্দেহ করার কোনো কথাই উঠতে পারত না। মেয়েটির মন তার প্রাণের বিরুদ্ধে কেবল মাথা ঠুকে মরতে লাগল, কিন্তু বাইর থেকে তা বোঝার জো ছিল না, শুধু তার মুখের উপরে দেখা যেত কেমন একটা মলিন ছায়া। আর স্বামী মনে করতেন তাকে পাপিষ্ঠা!

বুড়ো স্বামী খুবই বদমেজাজী, তাঁর স্ত্রীর সতীত্বের উপরেই ঝুলে আছে নিজ সম্মান—পদ্মপত্রে নীরের মতো। তাই বুঝে স্ত্রীকে তিনি আচ্ছা করে অপমান করলেন এবং শাস্তিও দিলেন খুশিমতো। কারো চোখে কোজি স্যাংটাকে সুন্দর লেগেছে এই তার অপরাধ। মেয়েটির দশা তখন ভাবো একবার। একে মিথ্যা দুর্নাম, তার উপরে স্বামীর যথেচ্ছ অত্যাচার—অথচ এই স্বামীর কাছেই একান্ত বিশ্বস্ত সে। অন্যদিকে, প্রণয়ের তুষানলে নিজের সংগে সে যুদ্ধ করে মরছে দিনের পর দিন।

যদি তার প্রণয়ী কাছে না আসে তবে তার স্বামীও হয়ত এমন ব্যবহার করবেন না, প্রণয়ের ক্ষুধিত শিখাও ধীরে ধীরে নিভে আসবে—এই ভেবে সাহসভরে সে চিঠি লিখল একটা:

"আপনার শুভবুদ্ধিকেই উদ্দেশ করে লিখছি, আমার দুঃখে ইন্ধন যোগাবেন না। আপনার ভালোবাসার জন্যেই আমার স্বামীর সন্দেহ জেগে উঠেছে, দিন দিন বাড়ছে দুর্ব্যবহার। কিন্তু আমি যে তাকে মেনে নিয়েছি চিরদিনের জন্যে। আমার জীবনের এই অগ্নিপরীক্ষা! দয়া করে আপনি এখানে আসবেন না আর। যে ভালোবাসা, আপনাকে আকুল করে তুলেছে—এবং আমাকেও—সেই ভালোবাসাকে উদ্দেশ করে মিনতি করছি আপনার কাছে।"

সরলপ্রাণ কোজি স্যাংটা ভাবতেই পারেনি তার চিঠির ফল করতে

রকম। সতীত্ব প্রণোদিত হলেও চিঠিটা কেমন ব্যথাভরা, কেমন করুণ! কাজেই ফল হ'ল উল্টো, মেয়েটি তা বুঝতেই পারেনি। ছেলেটির বুকে দ্বিগুন বেগে জ্বলে উঠল কামনার আগুন। তার প্রণয়িণীকে একটিবার প্রাণভরে দেখবার চেষ্টায় যদি তার মৃত্যু হয় সেও ভালো।

ক্যাপিটো ছিলেন অতি ধূর্ত, সব দিকেই তাঁর কড়া নজর। তাই তিনি কয়েকটি পাকা গোয়েন্দা রেখেছেন। একদিন তিনি জানতে পেলেন,—রাইবলডজ ফকির সেজে তাঁর স্ত্রীর কাছে আসছে অনুগ্রহলাভের। আশা ক্যাপিটো ভাবল,—এবার উপায়? সাধুর পাল্লা সৎস্বামীর পক্ষে যে সব চয়ে বিপজ্জনক!

চাকরদের তিনি নিযুক্ত করলেন রাইবলডজকে মেরে তাড়িয়ে দেবার জন্যে! যুবকটি বাড়ীতে ঢুকতেই তার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়ে সবাই তাকে অভ্যর্থনা জানাল! বেচারা চীৎকার করছিল শুধু, সাধু ফকিরদের উপরে কেন এই অত্যাচার? কিন্তু, কে শোনে কার কথা? সে এমন মারই খেল যে মাথার একটা আঘাতের চোটে মারা গেল দিন সাতেক পরেই। শহরের সমস্ত মেয়েরাই তার জন্যে চোখের জল ফেলল। কোজি স্তাংটা কিছুতেই তার মন শান্ত রাখতে পারল না। এমনকি কুপিটোও দুঃখিত হল,—সে অবশ্যি অন্য কারণে! এই সূত্রেই সে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ল।

বিচারক এসিন্দিনাসের আত্মীয় হ'ল রাইবলডজ। তাই তিনি স্থির করলেন, এবারে এমন বিচার করবেন যে দেশশুদ্ধ লোক একেবারে রাইবল যাবে। সমস্ত দেশেই কুপিটোর মতো ধূর্ত উকীল আর নেই, তাঁর তীব্র হা এই বিচারকের ঝগড়াও হয়েছে আগে। এবার তাকে হাতে হয়ে র, ধরে ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে পারলেই তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। লুকিয়ে জেই কোজি স্তাংটার চোখের সামনেই নিহত হ'ল তার প্রণয়ী,

স্বামীও এখন ঝুলতে যাচ্ছে ফাঁসিকাষ্ঠে। অপরাধ,—তার সতীত্ব! সে যদি রাইবলডজের দিকে একটু সুনজর রাখত, তবে স্বামীকে বুদ্ধিমানের মতোই ফাঁকি দেওয়া চলত।

এইভাবেই ফলে গেল ভবিষদ্বাণীর প্রথম দিকটা। কোজি স্যাংটার ভয়ানক ভাবনা হ'ল,—শেষের দিকটাও তবে সত্য হতে যাচ্ছে! ভেবে ভেবে সে স্থির বুঝল—নিয়তির বন্ধন না যায় খণ্ডন! তাই নিজেকে সে ছেড়ে দিল বিধাতার হাতে এবং বিচিত্র উপায়ে পৌঁছল এসে যশের রাজ্যে!

বিচারকটি ছিলেন লোভী ও কামুক—ভ্রষ্ট চরিত্র! আইনের ধার ধারতেন না তিনি মোটেই, খুব বদমেজাজী ভয়ংকর লোক। সুতরাং হিপ্‌পোর প্রায় নারীই তার সংগে কিছু না কিছু সম্বন্ধ রাখত,—নিজেদের অমঙ্গলের আশংকায়!

বিচারকটি ডেকে পাঠালেন কোজি স্যাংটাকে। সে এসে উপস্থিত হ'ল ছলোছলো চোখে। কাজেই, দেখতে হ'ল আরো সুন্দর!

"আপনার স্বামীর ফাঁসি হতে যাচ্ছে, কিন্তু—আপনি ইচ্ছে করলে তাঁকে বাঁচাতে পারেন।"

"সেজন্যে আমি প্রাণ দিতেও রাজি—"

"কিন্তু প্রাণ চাইনে আমি—"

"কি করতে হবে আমাকে?"

"আপনার একটি রাত চাই আমি—"

"কিন্তু সে তো আমার নয়, আমার রাত আমার স্বামীর। আমি শির দিতে পারি, কিন্তু সম্মান দিতে পারি না।"

"ধরুন, আপনার স্বামীই যদি রাজি হন?"

"তিনিই মালিক,—নিজের জিনিষ তিনি যেমন খুশি ব্যবহার করতে

পারেন। কিন্তু আমার স্বামীকে জানি আমি, কখনো তিনি রাজি হবেন না। বরং ফাঁসি যাবেন, তবু আমার গায়ে কেউ হাত দেবে তা তিনি সহ্য করবেন না।"

"আচ্ছা সে দেখা যাবে!"—রেগে উঠলেন বিচারক।

আসামীকে তক্ষুণি নিয়ে আসা হ'ল তাঁর সামনে। ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে চান তিনি, না ভ্রষ্টার স্বামী হতে চান? দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর কোনো প্রশস্ত ক্ষেত্রই নেই।

বুড়ো অবশ্যি গররাজি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ অবস্থায় সবারই যা হয়, তাই হ'ল। স্ত্রী নিজগুণে বাঁচাল তার স্বামীকে, এই প্রথমবার।

ঠিক সেই দিনই কোজি স্যাংটার ছেলের মারাত্মক অসুখ হ'ল। হিপপোর কোনো ডাক্তারেরই সাধ্য নেই তাকে সারায়। একটিমাত্র ডাক্তার আছেন যিনি তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন এবং তিনি থাকেন আকিলাতে, হিপপো থেকে কয়েকমাইল দূরে। সেই সময়কার প্রথা ছিল: কোনো ডাক্তার নিজ শহর এলাকার বাইরে ব্যবসা করতে পারবেন না। অন্য উপায় না দেখে কোজি স্যাংটা নিজেই চলল সেই শহরে, সংগে আদরের ভাইটি!

পথে ধরল দস্যুতে। দস্যুসর্দারের চোখে কোজি স্যাংটাকে ভারী সুন্দর লাগল। দস্যুরা তার ভাইকে খুন করতে উদ্যত হ'ল। সর্দার কোজি স্যাংটার কাছে এসে বলল, সে যদি একটু অনুগ্রহ করে তা হ'লেই তার ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা হতে পারে,—একটুখানি অনুগ্রহ মাত্র! রাজি হ'লে এইমাত্রই। যে স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনি তাঁর জীবন সে রক্ষা করে এসেছে; আর এখন, তার প্রাণের ভাইকে হারাবে সে! শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে? বিশেষ করে তার ছেলের অবস্থাও গুরুতর। একটি মুহূর্তও আর দেরী করা উচিত নয়। নিজেকে সে ভগবানের

হাতে সমর্পণ করে দিল,—তার কর্তব্য সমাপন করল সে। এই দ্বিতীয়বার।

সেদিনিই পৌঁছল সে এসে আকিলার ডাক্তারের কাছে। এই ডাক্তারটি ছিলেন একটি বাবুবিশেষ। একটু সর্দি হলেও যাকে দিয়ে মেয়েদের বুক পরীক্ষা না করালে চলত না,—মানে যখন কোনো অসুখই থাকত না আর কি! শহরের অনেকেরই তিনি বিশ্বস্ত বন্ধু,—অনেকের প্রণয়ী! ভদ্র, বিনয়ী এবং দরদী মানুষ! ডাক্তার-সংঘের সভাপতি তিনি; তাকে নিয়ে লোকে ঠাট্টাও করত খুব। কোজি স্যাংটা তার ছেলের অসুখের কথা ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলল ও তার হাতে দিল একখানা হাজার টাকার নোট।

"কিন্তু দেখুন,"—ডাক্তার সাহসভরে বলতে লাগলেন—"আমার পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থই কাম্য নয় আমার। আমি নিজেই আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি ঢেলে দিতে পারি আপনার পায়ে—আপনি নিজেই যদি একটা আরোগ্যের ব্যবস্থা করেন। আপনাকে দেখে আমার যে এই উন্মত্ততা তাই সারিয়ে দিন,—আমিও আপনার ছেলের অসুখ সারিয়ে দিচ্ছি।"

এমন দাবী একটু বাড়াবাড়ি বৈ:কি! কিন্তু নিয়তি তাকে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে ঠেলে পাঠিয়েছে। ডাক্তারটিও একজেদী লোক,—তাঁর প্রার্থিত ধন ছাড়া আর কিছুই নেবেন না তিনি।

কোজি স্যাংটার স্বামীও এখন কাছে নেই যে তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করে নেবে; কিন্তু কেমন করেই বা সে তার ছেলেকে,—তার বুকের মাণিক্কে ঠেলে পাঠাবে মরণের মুখে,—নিজে একটুখানি সাহায্যও এগিয়ে না দিয়ে! আদর্শ ভগ্নীর মতো, আদর্শ জননী সে! নির্দ্ধারিত দাবীর মূল্যে পেল সে তার ছেলের রোগমুক্তি। এই শেষবার।

ভাইকে নিয়ে এল সে হিপপোতে। সমস্ত পথেই ভাইটি তার দিদির অপূর্ব সাহসের প্রশংসা করছিল,—তার প্রাণও বাঁচিয়েছে সে-ই।

কোজি স্যাংটা একদিন বেশী সাধ্বী হতে যাওয়ার ফলেই ডেকে এনেছিল তার প্রণয়ীর মৃত্যু, স্বামীকেও হারাতে যাচ্ছিল প্রায়। কিন্তু বিনীত হয়েই বাঁচিয়েছে তার ভাই ও ছেলের প্রাণ! এই নারী তার সমাজের মধ্যে পেল অসীম সম্মান। মৃত্যুর পরে তাকে সেইণ্ট বা সাধ্বী সম্মানে মহিমান্বিতা করা হ'ল; কারণ, দেহনির্যাতনের মধ্য দিয়ে সে মঙ্গলপ্রতিষ্ঠা করেছে তার প্রিয় পরিবারের মধ্যে। সবাই মিলে তার স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তুলে সেখানে লিখে রাখল,—

"মহান মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটু অন্যায়"

দেনিস দিদেরত, (১৭১৩—১৭৮৪)

এই লেখক পারিবারিক জীবনে নিষ্ঠুর হ'লেও দরিদ্রের উপর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন নিখুঁত দরদের সংগে। লেখক ফরাসী বিপ্লবের কাজে যুক্ত ছিলেন, বিপ্লবের সময় যারা ফরাসীদের জীবনে সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছিলেন—তাদের মধ্যে একজন সত্যিকার কর্মী হলেন এই লেখক। এঁর লেখা এনসাই-ক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ ফরাসী চিন্তাধারায় এনে দেয় অপূর্ব্ব জাগরণ। 'বুরবনের দুই বন্ধু' বিপ্লব সংক্রান্ত গল্প।

হাল্‌কা ধরণের হাসির গল্পও এঁর হাতে ফুটে উঠত চমৎকার। তার একটি নিদর্শন হ'ল—'সার্জন কম ও একটি শব'।

সার্জন কম ও একটি শব

—দিদেরত

এই যে আপনাদের জন্যে ভারী মজার একটা ব্যাপার ঘটনাটা হয়েছিল আমাদের বাড়ীর পাশেই দাতব্য চিকিৎসালয়ে! অস্ত্রোপচার পরীক্ষণের জন্যে সার্জন কমের একটা শব প্রয়োজন হ'ল। হাঁসপাতাল-রক্ষীর কাছে এলেন তিনি।

"ঠিক সময়েই এসেছেন, স্যর!"—হাঁসপাতাল-রক্ষী বলেন,—"ঐ যে আপনার ৪৬নং, ঐ যে লম্বা চওড়া যুবকটি দেখছেন, বড় জোর আর দুঘণ্টা বাঁচবে!"

"দুঘণ্টা?"—সার্জন কম বলেন,—"তা, তাহ'লে তো ঠিক হচ্ছে না, আমার পক্ষে একটু বেশী তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমাকে যে ইতিমধ্যে একবার ফন্টেনব্লুতে যেতে হবে, খুব সম্ভব কাল সাতটার আগে আর ফিরতে পারছি না।"

"আচ্ছা বেশ, তাই হবে!"—হাঁসপাতালরক্ষী বলেন—"আপনি স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন, রোগী যাতে সে সময় পর্যন্ত আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে, সেজন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি।"

সার্জন কম চলে গেলেন। হাঁসপাতালরক্ষী এক ডাক্তারকে ডেকে ৪৬নং-এর জন্যে ভালো একটা বলকারী অষুধ দিতে বললেন। পুরো ছ ঘণ্টা ধরে একটানা ঘুমল রোগীটি। ভোরবেলায় হাঁসপাতালরক্ষী রোগীর বিছানায় এসে তো অবাক! বসে বসে সে গলা ঝেড়ে কাশছে। জ্বর নেই, শ্লেষ্মা নেই, বুকের ব্যথাটাও আছে নামমাত্র।

"আঃ ডাক্তার বাবু! আপনি কি দিয়েছেন জানি না, কিন্তু আপনি প্রাণদান করেছেন!"

"ও, তাই কি?"

"হ্যাঁ সত্যি স্যর! আর একবার ঐ অষুধটা দিলেই সব সেরে যাবে।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু সার্জন সাহেব এসে বলবেন কি?"

"সার্জন সাহেবের কথা কি বলছেন আপনি?"

"না, কিছু না!"—বলেন হাঁসপাতালরক্ষী আর হাত মোচড়াতে মোচড়াতে তাকিয়ে থাকেন বিরস মুখে, ঠিক ভ্যাবাচ্যাকার মতো।

রোগী তা দেখে বলে—"আপনাকে বিমর্ষ দেখছি কেন! আমি সেরে উঠেছি বলে কি আপনি দুঃখিত হয়েছেন?"

"না, না, তা নয়!"

তবু হাঁসপাতালরক্ষী বারবার রোগীর বিছানার কাছে এসে জিজ্ঞেস করতে থাকেন—

"আচ্ছা, এখন কি রকম আছেন?"

"খুব ভালো, স্যর!"

"তা হলে তো"— হাঁসপাতালরক্ষী তার ঘরে যেতে যেতে ভাবেন— "তা হলে তো সার্জন কমের নির্দ্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশী সময়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছি!"

এবং সত্যিসত্যি ব্যাপারটা ঘটল তাই। সন্ধ্যাবেলা সার্জন কম এলেন অস্ত্রোপচার পরীক্ষণের জন্যে।

"এই যে!" হাঁসপাতালরক্ষীকে বলেন সার্জন সাহেব—"তা, আমার শবটি কোথায়?"

"আপনার শব? তা, নেই তো!"

"নেই মানে ?"

"দেখুন স্যর, ব্যাপারটা ঘটেছে আপনারই দোষে। রোগীটি তো মরবার কামনাই করছিল দিনরাত। কিন্তু সম্প্রতি সে তার মত বদলে ফেলেছে এবং তার কারণও আপনি! এখন তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনাকে আরো দেরী করতে হবে। কোন্ কাজে যে গিয়েছিলেন ফণ্টেনব্লুতে! আপনি এখানে থাকলে তো ভুলেও ঐ অষুধটি দেবার কথা মনে উঠত না, এখন আপনার পরীক্ষাও চলতে পারত চমৎকার!"

"আচ্ছা, আচ্ছা!"—সার্জন সাহেব বলেন—"এ আর একটা বিশেষ কি ক্ষতি হ'ল। এখানকার নতুন আর একটি রোগীর জন্য অপেক্ষা করলেই হবে!"

বুরবনের দুই বন্ধু

—দিদেরত্

বুরবনে দুইজন বন্ধু ছিল। অলিভার ও ফেলিক্স্। একদিনে একই বাড়ীতে দুজনের জন্ম হয় দুই সহোদরা বোনের কোলে। একই স্তন্যে লালিত পালিত হয়েছে তারা,—কারণ বোনদের একজন প্রসব করেই মারা যায়, তখন অন্য বোন দুই শিশুকেই দেখাশোনা করে। একসংগেই তারা বেড়ে উঠতে লাগল অন্যান্য ছেলেদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে। নীরবে নিঃস্বার্থভাবে একে অন্যকে তারা গভীর ভাবে ভালোবাসত। এই ভালোবাসা তারা অনুভব করত প্রতিটি মুহূর্তে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কেউ কখনো কোনো কথা বলত না। একবার ফেলিক্স বিখ্যাত সাতারু হবার

বাহাদুরী নিতে গিয়ে প্রায় ডুবেই যাচ্ছিল ; অলিভারই সেবার তাঁকে বাঁচায়। অথচ কেউই সেকথা মনে করে রাখেনি। অলিভার স্বভাবতই নানা আপদ বিপদে পড়ত, আর ফেলিক্স্ই তাকে উদ্ধার করত, এজন্যে ফেলিক্স্কে একটা ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজনও মনে করত না অলিভার। হয়ত চুপ করেই থাকত বা অন্য কোনো বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে বাড়ী ফিরত।

দেশরক্ষীবাহিনীতে যোগ দেবার প্রথম টিকেট কাটল ফেলিক্স্। অমনি অলিভার বলে উঠল "পরের খানাই আমার।" একসংগেই চলে গেল তারা। তারপর নিজের গ্রামে ফিরে এলে পরস্পরকে আগের চাইতে অনেক বেশী প্রিয় মনে হতে লাগল। একযুদ্ধে অলিভারের মাথাই দু'ফাঁক হয়ে যেত, তলোয়ারের একঘায়ে। কিন্তু ফেলিক্স্ তার সামনে লাফিয়ে পড়ে বাধা দিয়েছিল, আর ফিরে এসেছিল গভীর এক রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে। অবশ্যি লোকে বলে, ফেলিক্স্ এজন্যে গর্ব অনুভব করত। কিন্তু সে সব বাজে কথা বিশ্বাস করি না আমরা। আর এক যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিক্স্কে মৃতদেহের স্তূপ থেকে উদ্ধার করেছিল অলিভারই।

জিজ্ঞেস করা হ'লে এক বন্ধু অন্য বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া সাহায্যের কথাই উল্লেখ করত,—নিজে কি সাহায্য করেছে তার কথা কখনো বলত না, বা কেউ কখনো প্রশংসাও করত না অন্যকে। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবার কিছুদিন পরে তারা প্রেমে পড়ল, ঠিক একই মেয়েকে ভাল-বেসে ফেলল। অথচ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল না। ফেলিক্স্ তার বন্ধুর গভীর ভালোবাসা লক্ষ্য করে নিজেকে সরিয়ে নিল, অলিভার বিয়ে করল সেই মেয়েটিকে। এরপর তার বন্ধু কেন যেন কতকগুলো বিপদজনক কারবারে জীবন ভাসিয়ে দিল ; শেষে দুঃসাহসিক কাজে,—নানা নিষিদ্ধ কারবারেও নিযুক্ত হ'ল সে।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ঐ নিষিদ্ধ দলের বিচারের জন্য ফ্রান্সের বেল রীমস, ভ্যালেনস্ আর তুলোতে চারটা আদালত আছে। এগুলোর ভেতর আবার রীমসই হ'ল সবচাইতে কঠোর আদালত, এখানকার বিচারপতি কেলুর প্রাণটা ছিল পৃথিবীর হিংস্র প্রাণীদের চাইতেও ভয়ংকর। হাতে নাতে ধরে ফেলে ফেলিক্স্‌কেও বিচারের জন্য আনা হ'ল এই কেলুর কাছেই। আগের অন্যান্য পাঁচশ' জনের মতই কেলু তাকে প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। রাতে অলিভার ফেলিক্সের এই দুর্ভাগ্যের কথা শুনে স্ত্রীর পাশ থেকে উঠে গিয়ে রীমসে চলে গেল। সেখানে বিচারক কেলুর পায়ে পড়ে সে তার বন্ধুর সংগে দেখা করবার ও তাকে একটু আলিঙ্গন করবার অনুমতি ভিক্ষা চাইল। কেলু নীরবে তার দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে ইঙ্গিত করল। অলিভার বসল। ঠিক আধঘণ্টা বাদে কেলু তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল: বন্ধুকে জীবন্ত দেখতে হ'লে তাড়াতাড়ি করো। তাঁরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে, আর আমার ঘড়ি ঠিক হ'লে আর দশ মিনিটের ভেতরেই তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।"

পাগলের মতো অলিভার উঠে দাঁড়াল এবং কেলুর ঘাড়ে লাঠির এমন এক ঘা মারল যে, অমনি সে পড়ে গেল মরার মতো। তারপর সে বধ্যভূমিতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠে এক আঘাতে ধরাশায়ী করে ফেলল জহ্লাদকে, পুলিশ প্রহরী—সবাইকেই আক্রমণ করল ভীষণভাবে; উত্তেজিত দর্শকেরা মিলে ঘটিয়ে তুলল একটা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। জনতা ফেলিক্স্‌কে উদ্ধার করলে সে পালিয়ে গেল। অলিভারও তার পিছু পিছু যাবে ঠিক করল। কিন্তু মাঝপথেই তাকে গেঁথে ফেলল একদল অশ্বারোহী পুলিশ। শহর অবধি নিজের দেহটাকে সে কোনো রকমে টেনে নিয়ে এল, কিন্তু আর একটুও এগোতে পারল না। কয়েকজন দয়ালু গাড়োয়ান তাকে গাড়ীতে

তুলে এনে তার বাড়ীর দরজায় রেখে দিল। কিছুক্ষণ বাদেই সে মারা যাবে। বৌকে কাছে ডেকে বলল, তোমায় একটু আদর করতে দাও। আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু ফেলিক্স্‌কে তো বাঁচাতে পেরেছি।” মৃত্যুর আগে শুধু এই কথা কয়টিই সে বলতে পেরেছিল।

ফেলিক্স্‌ কিন্তু তখনও বেঁচে আছে। বিচারকের হাত এড়িয়ে সে সেই দেশের বনের ভেতর চলে গেল। সেইখানেই তার হাতে খড়ি হ'ল বেআইনী ব্যাপারে। তারপর ধীরে ধীরে সে অলিভারের বাড়ীর দিকে এগোতে লাগল। তখনও সে অলিভারের মৃত্যুর কথা জানে না।

সেই বনের মাঝখানে ছিল এক কাঠুরের কুটির। সেটিই ছিল বেআইনীদলের আশ্রয় এবং তাদের মালপত্তর অস্ত্রশস্ত্র রাখবার গুদাম। প্রায় ধরা পড়তে পড়তেই ফেলিক্স্‌ এখানে এসে পৌছল। কারণ, গুপ্ত পুলিশে তার খোঁজ করছিল সব জায়গায়, পিছু পিছুই আসছিল তারা। এদিকে ফেলিক্সের কয়েকজন সহকর্মী রৗমসে তার ফাঁসি হবার কথা শুনে এসেছে। তাই কাঠুরে ও তার স্ত্রী মনে করল, ফেলিক্স্‌ মরে গেছে।

আমি অবশ্য কাঠুরের স্ত্রীর মুখ থেকে যা শুনেছি তাই বলছি আপনাদের এবং এই অল্প কিছুদিন হ'ল সে মারা গেছে।

কুটিরের চারপাশে ছেলেমেয়ের দল খেলা করছিল। তারাই প্রথমে ফেলিক্স্‌কে দেখতে পেল। তারা সবাই “ফেলিক্স্‌! ফেলিক্স্‌!” ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে কুটিরে ছুটে গেল। তাদের মা-বাবা আনন্দেকলরব করে বেরিয়ে এল, কিন্তু ক্ষুধায় পরিশ্রমে সে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তার কথা বলবার শক্তি ছিল না। সে প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে গেল তাদের বাহুর মধ্যে। তারা যথাসাধ্য তাকে সেবা শুশ্রূষা করল,— রুটি মদ এবং আরও নানা খাবার খেতে দিল তাকে। খাওয়া দাওয়া দাওয়া করেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম থেকে জেগেই তার প্রথম কথা : "অলিভার ? অলিভারের কোনো কথা তোমরা জানো ?"

"না।"—বলল সবাই।

সে তখন রীমসের সেই দুঃসাহসিক কাহিনী বলতে লাগল। সেই রাত এবং তার পরের দিনটা সে সেইখানেই কাটিয়ে দিল। অলিভারের কথা বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে মনে করল, অলিভার বোধহয় রীমসেই বন্দী হয়ে আছে। সেখানে গিয়ে তার সংগে একত্রে মরতে চাইল সে। কিন্তু কাঠুরে অনেক করে তাকে এ মতলব থেকে নিবৃত্ত করল।

দ্বিতীয়দিন মাঝরাতে একটা বন্দুক আর একখানা রামদা নিয়ে ফেলিক্স্ আস্তে আস্তে কাঠুরেকে ডাকল "বন্ধু, তোমার কুঠার নিয়ে আমার সংগে এস।"

"কোথায় ?"

"প্রশ্ন কর কেন ? অলিভারের বাড়ীতে।"

তারা একসাথে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বনটা পার না হতেই একদল অশ্বারোহী পুলিশ তাদের ঘিরে ফেলল। আমি অবশ্যি কাঠুরের স্ত্রী যা বলেছে তাই শুধু বলতে পারি। এমন কথা আমি তো কোনোদিন শুনিনি যে শুধু দুজন পথিক একদল অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে! তবে মনে হয়, পুলিশেরা বোধহয় চারদিকে ছড়িয়ে থেকে তাদের জ্যান্ত ধরতে চাইছিল। সে যা হক, ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। পাঁচটা ঘোড়া খোঁড়া হ'ল আর সাতজন অশ্বারোহী ধরাশায়ী হ'ল কুঠার ও রামদার আঘাতে। কপালে একটা গুলি লেগে কাঠুরে ঘটনাস্থলেই মারা গেল। ফেলিক্স বনে ফিরে এল। তারপর বিদ্যুৎবেগে একগাছের গোড়া থেকে আর এক গাছের তলায় গিয়ে গুলি চালাতে আর বাঁশীতে ফুঁ দিতে লাগল নানা দিক থেকে একটু পরে পরেই অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ! বাঁশীর শব্দে

অশ্বারোহীরা মনে করল যে বেশ বড়রকমের একটা গুণ্ডাদলের সংগে লড়াই হচ্ছে, তাই অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে তারা পালিয়ে গেল।

ফেলিকস্ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে মৃত কাঠুরেকে কাঁধে করে কুটিরে ফিরে এল। কাঠুরের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তখনো ঘুমিয়ে ছিল। দোরের কাছে ফেলিক্স্ দাঁড়াল এসে। মৃতদেহটা পায়ের কাছে রেখে দোরের দিকে মুখ করে একটা গাছে হেলান দিয়ে সে বসে পড়ল। এই ভাবেই সে অপেক্ষা করছিল কাঠুরের স্ত্রীর জন্যে। ঘুম ভাঙলে স্ত্রী স্বামীকে তার পাশে দেখতে পেল না। ফেলিক্স্কে খুঁজতে চারিদিক তাকাল, কিন্তু ফেলিক্স্ নেই! উঠে পড়ল সে, বেরিয়ে এসে তার সামনেই দৃশ্য দেখে মাটিতে পড়ে গেল। ছেলেমেয়েরা আর্তনাদ করে উঠল। তারা একবার তাদের বাবার উপর একবার মায়ের উপর আছড়ে পড়তে লাগল। ছেলেমেয়েদের চীৎকারে ও আছাড়ে হতভাগ্য রমণীর জ্ঞান ফিরে এল। সে তার নিজের গাল খামচে ধরল, চুল ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। ফেলিক্স্ পাগলের মতো গাছতলায় চক্ষু বুঁজে বসে রইল, মাথাটা হেলে পড়ল পেছনের দিকে। ভগ্নস্বরে সে বলল,—"আমাকে তোমরা মেরে ফেলো!" কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপরে আবার আরম্ভ হ'ল শোকের আর্তনাদ। ফেলিক্স্ আবারো বলল: "আমায় হত্যা করো তোমরা। দয়া করে আমায় হত্যা করো!" এরকম করেই শোকে দুঃখে কেটে গেল তিন দিন তিন রাত। চারদিনের দিন ফেলিক্স্ মৃত কাঠুরে বন্ধুর স্ত্রীকে বললে: "তোমার থলেতে কিছু রুটি ভরে আমার সংগে এস!"

পাহাড়ের উপরকার বনপথ দিয়ে অনেক ঘুরে ফিরে তারা অলিভারের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল। অলিভারের বাড়ীটা ছিল গ্রামের শেষ প্রান্তে। আর সেখান থেকে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে দুদিকে গেছে। এখানেই এল ফেলিক্স্।

"অলিভার কোথায়?" হঠাৎ সে তার বন্ধুপত্নীকে জিজ্ঞেস করল। তার নিস্তব্ধতা, চোখের জল এবং শোকপরিচ্ছদ দেখে ফেলিক্স্ বুঝলে যে অলিভার মরে গেছে। তার সর্বশরীর কেমন ঝিমঝিম করতে লাগল। সে পড়ে গিয়ে একটা বাটিতে আঘাত পেল। বিধবা দুটি তাকে তুলে নিল। রক্তে নেয়ে উঠল তার দেহ। ওড়না দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করার সময় ফেলিক্স্ বলল: "তোমরা তো তাদেরই স্ত্রী, তবু, তবু আমায় সেবা করছ! তারপরেই সে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ল, চেতনা ফিরে এলে সে বলল: "সে কেন আমায় একা ছেড়ে দিল না? কেন সে রীমসে গেল? যা ঘটবার তাই ঘটত!"

এরপর তার মাথা খারাপ হবার মতো হ'ল, মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগল সে; জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলতে লাগল, রামদা এনে নিজেকে হত্যা করতে চাইল। কিন্তু স্ত্রীলোক দুজন তাকে জড়িয়ে ধরে সাহায্যের জন্য চীৎকার করে উঠল, পাড়া প্রতিবেশীরা এসে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল। সাত আটবার রক্তপাত হ'ল তার ক্ষত থেকে, দুর্বল হয়ে পড়বার সাথে সাথে তার উন্মত্ততা কমে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। প্রথমে সে চারদিকে তাকাতে লাগলো, ঠিক যেন গভীর ঘুম থেকেই উঠল! তারপর বলল, "আমি কোথায়? তোমরা, তোমরা কারা?"

"আমি কাঠুরের স্ত্রী!"—একজন বলল।

"ওঃ! আমি তোমায় চিনি, কিন্তু ঐ অন্য স্ত্রীলোকটি কে?"

অলিভারের স্ত্রী চুপ করে রইল, ফেলিক্স কাঁদতে আরম্ভ করল মুখটা দেওয়ালের দিকে ফিরিয়ে। তারপর বলতে লাগল "আমি অলিভারের বাড়ীতে!...এই অলিভারের বিছানা...আর ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে...ঐ অলিভারেরই স্ত্রী, হায় ভগবান!"

কিন্তু স্ত্রীলোক দুজন তার খুব যত্ন নিতে লাগল। সহানুভূতি দেখিয়ে সমবেদনা জানিয়ে তাকে সঞ্জীবিত করে তুলল। তাদের ব্যবহারে এমন দরদ প্রকাশ পেল যেন সেই তাদের একমাত্র সম্বল! তাই সে তাদের কথা মেনে নিল।

সব সময় সে ঘরেই পড়ে থাকত, বিছানায় শুতে যেত না। রাতে সে বেরিয়ে পড়ত, মাঠের মাঝে ঘুরে বেড়াত। আর অলিভার অলিভার ব'লে চীৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি যেত। একজন স্ত্রীলোক সব সময় তার পিছু পিছু থাকত এবং ভোর বেলায় তাকে ফিরিয়ে আনত।

কয়েকজন লোকে জানত, যে ফেলিকস আছে অলিভারের বাড়ীতে। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইল। বিধবা দুজন তাকে তার বিপদের কথা জানাল। দুপায়ের মাঝে রামদা এবং টেবিলের উপর দু'কনুই রেখে এবং দু'হাতে চোখ ঢেকে সে একদিন একটা বেঞ্চির উপর বসে ভাবছিল। প্রথমে সে কিছুই বলল না। অলিভারের আঠার বছরের একটি ছেলে এবং কাঠুরের চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে ছিল।

"ফিরে গিয়ে তোমার মেয়েকে নিয়ে এস।"—কাঠুরের স্ত্রীকে বলল সে।

তারপর এদিকে কাঠুরেয় স্ত্রী বনে গিয়ে মেয়েকে নিয়ে ফিরে আসছিল, ইতিমধ্যে ফেলিক্স তার নিজের সব জমিজমা বিক্রী করে ফেলল। কাঠুরের স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলে অলিভারের ছেলের সংগে মেয়েটির বিয়ে দিল ফেলিক্স্; সম্পত্তি বিক্রী করে যত টাকা পেয়েছিল সবই তাদের দিয়ে দিল। তাদের আলিঙন করে সে কাঁদতে লাগল এবং তার কথা সবাইকে ভুলে যেতে বলল। তারপর ছেলে মেয়ে দু'টি এক কুটিরে সংসার পাততে চলে গেল। সেখানে তারা এখনো বাস

করছে, এখন তারা সন্তানের বাবা মা হয়েছে। বিধবা দু'জন এক সংগেই বাস করতে লাগল।

অলিভারের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা আবার যেন ফিরে পেল দুজন মা ও একজন বাবা!

বছর দেড়েক হবে ক্যাঠুরের স্ত্রী মারা গেছে। অলিভারের স্ত্রী বেঁচে আছে এখনো।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বিধবা দু'জনই ফেলিক্সের কাছে বসে ছিল—কারণ, তাদের একজন তাকে চোখে চোখে রাখত সব সময়ই। তারা দেখল ফেলিক্স্ কাঁদছে। তারপর সে তার বিছানা পত্তর বাঁধাছাঁদা করতে লাগল। নীরবে তারা তিনজনে একত্রে খাওয়া দাওয়া করল, বিধবা দুটি তাকে কোনো কথা বলল না। কারণ, তাদের কাছ থেকে কত তাড়াতাড়ি এর বিদায় নেওয়া প্রয়োজন তা তারা ভালোভাবেই জানত।

রাতে চুপি চুপি ফেলিক্স্ উঠে পড়ল। স্ত্রীলোক দু'জনও ঘুমোয় নি। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে সে দরজার কাছে এগিয়ে এল। সেখানে একটু থামল, তারপর বিছানায় শায়িত বিধবা দু'টির দিকে ফিরে চাইল এবং দু'হাতে চোখ মুছে বেরিয়ে পড়ল। স্ত্রীলোক দু'জন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বাকী রাতটা কেঁদেই কাটিয়ে দিল। কেউ জানল না ফেলিক্স্ কোথায় চলে গেল। পর পর কয়েকটা সপ্তাহই কেটে গেল, তবু বিধবাদের কাছে কোনো চিঠি বা টাকা পয়সা এসে পৌছল না।

ফেলিক্স্ আছে এখন প্রুশিয়ার রক্ষীবাহিনীতে। সবাই বলে, তার সহকর্মীরা তাকে বেশ ভালোবাসে। অলিভারের বিধবা স্ত্রী আমায় বলেছে যে, ফেলিক্স্ তাকে টাকা পয়সা পাঠাচ্ছে।

হনরি ড ব্যালজাক (১৭৯৯—১৮৫০)

লেখকের জন্ম তুরস্-এ। ইনি শিক্ষালাভ করেছেন কলেজ অ ভেন্দম-এ, পরে আইন অধ্যয়ন করেন। বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে আইনজীবী হয়, কিন্তু ব্যালজাক তাঁর সংগে একমত হতে পারেননি, তাই সাহিত্যজীবন গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ী ছেড়ে চলে যান। এর পরে কয়েক বছরের সাহিত্য-চর্চা বিশেষ সুফলপ্রসূ হয় না, লেখা হয় অখ্যাত কতগুলি গল্প। এই সময়ে ব্যালজাক অর্থলাভের চেষ্টায় ঘুরে কয়েকটা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে লালবাতি জ্বালিয়ে ঋণজালে জড়িত হয়ে পড়েন। প্রথম সার্থক গল্প লেখা হয় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে। এরপরে আরো কয়েকখানা উপন্যাস লেখার পরে লেখা সুরু হয় এর জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস—কমিডি হিউমেইন। গ্রন্থটি সভ্যজগতের শহরপল্লী, বিভিন্ন পেশা নেশা ও বিচিত্র নরনারীর ইতিহাস। ব্যালজাক উক্ত গ্রন্থের ৪০ খণ্ড লিখে যান, কিন্তু উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করবেন ভেবেছিলেন ১২১ খণ্ডে। ইনি 'চৌদ্দ থেকে আঠারো ঘণ্টা লিখতেন এবং বিশ বছরে লিখে গেছেন ৮৪ খানা উপন্যাস !' কিন্তু সেই পরিমাণে আর্থিক স্বচ্ছলতা উপভোগ করতে পারেননি। শেষের দিকে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লে ইনি মাদাম হাস্কে নাম্নী ধনী এক পোল্যাণ্ডবাসিনী বিধবাকে বিয়ে করেন ; তিন মাস পরেই ব্যালজাকের মৃত্যু হয়।

মানুষ হিসেবে ব্যালজাক খুব আলাপপ্রিয় ও সহৃদয় ছিলেন—অর্থাৎ ঠিক ভল্টেয়ারের উল্টোটি। কল্পনার ঐশ্বর্যে, রচনার প্রাচুর্যে ও জীবনের রসায়নে এর রচনা পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এঁর প্রায় গল্পই লেখা হয়েছে উপন্যাস রচনার আগে, এবং বিভিন্ন রচনাভঙ্গীতে। গল্পগুলির বিষয় বস্তুও মুখ্যত নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত। ব্যালজাকের রচনায় বর্ণনাবাহুল্য লক্ষনীয় ; আঙ্গিকবোধ থেকেও কিছুটা দুষ্ট। "মরু-প্রেম" "আনিন্দ্য প্রাসাদ", "ক্রাইষ্ট ইন ফ্লাওারস্" "রেইন অব টেরর" বিখ্যাত কয়েকটি গল্প।

মরুপ্রেম

—ব্যালজাক

"সত্যি কী ভয়ানক দৃশ্য!" মার্টিনের পশুশালা থেকে বেরোতে বেরোতে একটি মহিলা বলছিলেন। এই মাত্রই তিনি হায়নার খাঁচায় দেখেছেন এক দুঃসাহসিক খেলা! "আশ্চর্য, মানুষ যে কী করে এ হেন হিংস্র পশুকে বশ করে ফেলে!"

"আপনি যাকে আশ্চর্য ভাবছেন আসলে তা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র!"

"ও, তাই নাকি?"—অবিশ্বাসের হাসিতে মহিলাটির ওষ্ঠ বাঁকিয়ে ওঠে।

"তা হ'লে বলতে চান, জানোয়ারদের বুকে ভালোবাসা ব'লে কিছু নেই? আমাদের জীবনের অনেক কিছুই শেখানো যায় ওদের!"—আমি বললাম।

মহিলাটি আমার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি বলছিলাম —"তবু একথা সত্যি, প্রথম যেদিন এই মার্টিনের খেলা দেখি আপনার মতো আমিও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। তখন আমার পাশেই, দাঁড়িয়ে ছিল একজন প্রৌঢ় সৈনিক। ডান পা কাটা,—দেখলেই চমকে উঠতে হয় এমন। তার সর্বাঙ্গে যুদ্ধের স্বাক্ষর, কপালে লেখা যেন নেপোলিয়নের সমর ইতিহাস। কিন্তু চমৎকার আমুদে লোক সে, খুব সহজ সরল, আমারও আবার ভালো লাগে এমন সব লোকই! কোনো কিছুতেই সে যেন দমবার পাত্র নয়; মুমূর্ষু সংগীর হাঁপানির মধ্যেও খুঁজে পায় সে হাসির খোরাক, বুক পেতে দিতে পারে গুলিগোলার সামনে।

খেলোয়াড়টির দিকে এক দৃষ্টে তাকাতে তাকাতে তার ওষ্ঠে ফুটে উঠল অনির্বচনীয় তৃপ্তি। মার্টিনের খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে সে একটু হাসল ও মাথা নেড়ে নেড়ে বিজ্ঞের মতো বলল—"ও সবই বুঝি আমি!"

"আপনি যদি এই রহস্যটা একটু খুলে বলেন তো আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

কিছুক্ষণের মধ্যে পরিচয় হয়ে গেলে একটা রেস্তোঁরায় এলাম আমরা। পুরো একবোতল শ্যাম্পেনের প্রসাদে সম্পূর্ণভাবেই খুলে গেল তার স্মৃতির দুয়ার। সে আমাকে একটা কাহিনী শোনাল।

বাড়ী এলে সেই মহিলাটি এমন মিষ্টি সুরে আমাকে বিরক্ত করতে লাগল যে কথা দিতে হ'ল কাহিনীটা তাকে লিখে পাঠাব, পরের দিনই লেখাটা তার হাতে দিলাম :

—উত্তর ইজিপ্টে জেনারেল ডেশাইর অভিযানকালে একজন ফরাসী যোদ্ধা আরবীর দস্যুদের হাতে বন্দী হয়, তারা তাকে ধরে নিয়ে যায় নীলনদের পরপারে। ফরাসী সৈন্যদলের আড্ডা থেকে দূরে নিরাপদে থাকার জন্য তারা প্রবল বেগে এগোতে থাকে ঘোর সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং তালগাছ ঘেরা একটা কুয়োর কাছে এসে তাঁবু ফেলে; এখানেই লুকানো ছিল তাদের খাদ্য সম্ভার। বন্দীটি যে পালিয়ে যেতে পারে এটা ছিল তাদের ধারণার বাইরে। সবাই তাই খেয়ে দেয়ে এবং ঘোড়াদের খেতে দিয়ে শুতে গেল।

শত্রুরা আড়ালে চলে গেছে দেখে যোদ্ধাটি দাঁত দিয়ে তুলে নিল একটা তলোয়ার এবং দুই হাঁটু দিয়ে সেটাকে এঁটে ধরে কেটে ফেলল হাতের দৃঢ় বাঁধন। এবারে মুক্ত সে! এক মুহূর্তও আর দেরী নয়, সংগে নিল বন্দুক, ভোজালি, কিছুটা ময়দা, খেজুর আর কার্তুজ। তারপর তলোয়ার

হাতে লাফিয়ে বসল একটা ঘোড়ায় এবং ঝড়ের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে দিল একদিকে। সম্ভবত ঐ দিকেই আছে ফরাসী সৈন্যবাহিনী। নিজেদের তাঁবুতে ফিরে যাবার অস্থির আগ্রহে সে ক্লান্ত ঘোড়াটিকে ছুটিয়ে দিল এমন দুরন্ত বেগে যে জুতোর তলাকার কাঁটায় রক্তাক্ত হ'ল ঘোড়াটার দুই পার্শ্বদেশ এবং সে বেচারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরে গেল। ধূ ধূ মরুর বুকে যোদ্ধাটি দাঁড়িয়ে রইল নিঃসঙ্গ একা!

নিরুপায় হয়ে সে সীমাহীন বালুরাজ্য ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল,—বুকে জেগে রইল পলাতক আসামীর দুঃসাহস। নেমে এল রাত্রি—প্রাচ্য দেশের সুন্দর রাত্রি, কিন্তু আর একটুও এগোবার শক্তি নেই তার। তবু ভালো, তালগাছ ভরা একটা উঁচু জায়গাতেই উঠেছে সে। দূর থেকেই এই গাছগুলির পাতা হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, তাই দেখতে পেয়ে তার প্রাণে জেগে উঠেছিল নিরাপত্তার আশা। একান্ত ক্লান্তিতে এবার সে এলিয়ে পড়ল একটা গ্রানাইট শিলার উপরে। ঘুমের মধ্যে যে বিপদ এসে উপস্থিত হতে পারে—সে কথা একবারও খেয়াল হয়নি, সে যেন জীবনের শেষ সীমান্তেই এসে পড়েছে। ঘুমোবার আগের মুহূর্তটিতেও ভাবছিল সে,—এর চেয়ে আরব দস্যুরাই ছিল ভালো। এখন অনুশোচনা হচ্ছিল তাদের ছেড়ে আসার জন্যে। এখন সে যে মনুষ্য জগতের ওপারে, মানুষের সমস্ত সাহায্যের বাইরে!

হঠাৎ জেগে উঠল সে,—জ্বলন্ত রোদ খাড়াখাড়ি পড়ায় লোহার মতো তেতে উঠেছে গ্রানাইট প্রস্তর। যোদ্ধাটী কিন্তু সেদিকে একান্তই উদাসীন! সবুজপাতাভরা গাছটীর গর্বিত ছায়াশ্রয়ে শুতে যাবার মতো উৎসাহও ছিল না তার, শুয়েছে সে উল্টো দিকেই। এই নিঃসংগ নিস্তব্ধ গাছগুলির দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল তার প্রাণ। কয়টী গাছ আছে,—একে একে গুণল সে, তারপর চারদিকটা তাকিয়ে দেখল। তার সমস্ত

আত্মাকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে ভয়ংকর একটা হতাশা। চারদিকেই দিগন্তহীন সমুদ্র! বিষণ্ণ বালুরাশি ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে,—যতদূর চোখ যায় ঝলমল করছে শুধু, ঝকমকে ইস্পাতের মতো! চোখের সামনে সমুদ্র, না, কাচের মতো উজ্জ্বল স্বচ্ছ সরোবর শ্রেণী? কম্পমান মরু-প্রান্তরের উপর দিয়ে ছোট ছোট তরংগ-লীলায় ধু ধু করছে যেন জ্বলন্ত কুয়াশা। সমস্ত আকাশে প্রাচ্য দেশীয় নির্মল দীপ্তি,—এই দীপ্তিতে ভরে ওঠে হতাশা,—পঙ্গু কল্পনায় জাগে না কোনো কামনার রেশ! পাল্লা দিয়ে জ্বলছে যেন আকাশ ও মরুদেশ! আদিম এক ভয়াবহ মহিমায় বিরাট সে স্তব্ধতা, চারিদিকের এই নিঃসীম বিরাট যেন সমস্ত আত্মার উপরে কঠিন এক নির্যাতন। আকাশে নেই মেঘ, বাতাসে নেই নিঃশ্বাস। ছোট ছোট নিশ্চল তরংগ-শ্রেণীতে বালুরাশি পড়ে আছে নিঃসাড় নিঝুম। দূরান্তে স্পষ্ট দেখা যায় দিগন্ত-রেখা,—ঝকমকে বাঁকা তলোয়ারের মতো। গ্রীষ্মের দিনে দেখায় যেমন সমুদ্র সীমান্ত।

যোদ্ধাটী দুই বাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধরল কাছের তালগাছটিকে,—সে যেন এক প্রিয় বন্ধুর দেহ! তারপর কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল গ্রানাইটের উপর,—গাছটীর সরল ও সংক্ষিপ্ত ছায়ায়। ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল সমুখের শ্মশান-দৃশ্যের দিকে এবং উদাসীন নিস্তব্ধতাকে সচেতন করার জন্যেই উচ্চ-কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল। তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে গিয়ে দূরান্তে জাগল ক্ষীণ একটু শব্দ, প্রতিধ্বনিহীন একটু শব্দ;—প্রতিধ্বনি তার ফাঁকা প্রাণের মধ্যেই!

বাইশ বছরের যুবক প্রভেন্সাল,—বন্দুকটায় সে গুলি ভরে নিল।

"না, এখনো সময় আছে তার।"—মনে মনে ভাবতে ভাবতেই সে মুক্তির এই শেষ অস্ত্রটিকে নামিয়ে রাখল মাটিতে।

বিষণ্ণ মরুবালুরাশি ও কূলহারা নীলাকাশের দিকে এক এক করে

তাকাতে তাকাতে স্বপ্নের মতো ভেসে উঠল তার ফ্রান্স দেশ। পরম শান্তিতে সে যেন চলে গেল সেই প্যারিতে। ছবির মতো মনে পড়ল শহরের পরিচিত কত পথ, প্রিয় বন্ধুদের মুখ,—জীবনের ছোট্ট ঘটনাটি পর্যন্ত! কল্পনায় জেগে উঠল—প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির রৌদ্রোজ্জ্বল প্রান্তরের বুকে সেই সুন্দর সুন্দর ঘুড়ির মেলা। কিন্তু এই নির্দয় স্বপ্ন-মরীচিকা তাকে আরো শংকিত করে তুলল। সে কালকের পথের বিপরীত দিক দিয়েই পাহাড়ে উঠতে লাগল এবং সুন্দর একটি গুহা দেখতে পেয়ে তার আনন্দের আর সীমা রইল না। পাহাড়ের পাদদেশে বিরাট একটা গ্রানাইট শিলা থেকে প্রকৃতির হাতেই গঠিত এই গুহা। মাতুরের একটা ছেঁড়া অংশ দেখে বোঝা গেল বিষণ্ণ ধূসর এই নিরালায় একদিন বাসা বেঁধেছিল কোনো মানুষ। আর একটু এগিয়েই সে একগুচ্ছ ফলওয়ালা একটা খেজুরগাছ পেল। আবার তার বুকে জেগে উঠল বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা। কোনো আরবীর দস্যু এসে পড়ার আগ পর্যন্ত অন্তত বাঁচবে সে। হয়ত, শিগগিরি শুনতে পাবে সে ফরাসীয় কামানের গর্জন। কারণ, নেপোলিয়ান তখন মিশরে অভিযান করছিলেন। এই ভাবনায় সঞ্জীবিত হয়ে সে ফলভারনত একটা খেজুরগাছ থেকে কেটে নিল তুই গোছা খেজুর। অপ্রত্যাশিত এই অমৃত ফল আস্বাদ করে সে এবার বুঝল, এখানকার অধিবাসীরাই চাষ করেছে এই গাছগুলি।

নির্মম কঠিন হতাশা থেকে সহসা যোদ্ধাটি জেগে উঠল এক উন্মাদ আনন্দে। আবারো পাহাড়ে উঠল সে এবং সমস্ত দিনটাই কাটিয়ে দিল বন্ধ্যা একটা খেজুরগাছ কাটতে কাটতে। আগের রাতে এরই আশ্রয়ে শুয়ে ছিল সে। মনে পড়ল হিংস্র মরুজানোয়ারের ভয়ের কথা। পাহাড়ের মাঝে বালুপথে একটি স্রোতধারা কলকল করে ছুটে চলছে। এখানে জলের খোঁজে আসতে পারে তারা! গুহাশ্রয়-মুখে একটা ঢাকনা

দিয়ে নিজেকে নিরাপদ রাখবে সে। রাতে ঘুমের মধ্যেই সাবাড় হয়ে যেতে পারে,—এই ভয়ে প্রাণপণ পরিশ্রম করল। তবু একদিনে এই বিরাট গাছটিকে খণ্ড খণ্ড করে কাটা তার পক্ষে অসম্ভব। না, কেটেই ফেলবে। সন্ধ্যার দিকে ভূপাতিত হ'ল এই মরুসম্রাট। সহসা প্রতি-ধ্বনিত হয়ে উঠল দূর দূরান্তর। গোঙানি দিয়ে উঠল যেন মহান এই নৈঃশব্দ্য! কেঁপে উঠল সৈন্যটি;—ঐ ধ্বনি যেন কোন অশুভ ইঙ্গিতবাণী! কিন্তু ভাবী উত্তরাধিকারী যেমন আত্মীয় বিয়োগে বেশীক্ষণ শোকপ্রকাশ করে না,—এই সৈন্যটিও কিছুক্ষণ পরেই চওড়া পাতাগুলি আবার কাটতে লেগে গেল এবং তাই দিয়েই সেরে নিল তার শোবার মাদুরটা। রোদে আর শ্রমে শ্রান্ত হয়ে এবার সে ঘুমিয়ে পড়ল গুহাবাসের লাল ছাদের নীচে।

মাঝরাতে হঠাৎ সে জেগে উঠল ভয়ানক এক শব্দে। নিঝুম নিস্তব্ধতার বুকে কার নিশ্বাস-ধ্বনি! মানুষের, না, হিংস্র পশুর? গাঢ় অন্ধকারে গাঢ়তর একটা ভয়,—চারিদিকেই ভয়ানক নৈঃশব্দ, আর তারি সাথে সদ্য ঘুম-ভাঙা স্বপ্নাবেশ—সব মিলে হিম হয়ে এল তার সমস্ত শরীরের রক্ত, সংকুচিত হ'ল যেন তালুর হাড় পর্যন্ত। হঠাৎ তার বিস্ফারিত চোখের সামনে আবছা অন্ধকারে জ্বলে উঠল নিষ্প্রভ দুটি হলদে আলো। এবারে রাতের শান্ত জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে উঠল গুহার সব কিছু। সর্বনাশ! দুহাত দূরেই শুয়ে আছে বিরাট এক জানোয়ার!

সিংহ,—বাঘ, না কুমীর? কোন জাতীয় শত্রু সে, যোদ্ধাটি বুঝতে পারল না, কিন্তু ভয়ে সে শিউরে উঠল। বুঝতে পারল না বলেই ভয় হ'ল নানা রকম। একটুখানি নড়তেও সাহস হচ্ছে না। প্রতিটি মুহূর্তেই গর্জে উঠছে ভয়ানক নিশ্বাসের অদ্ভুত শব্দ-বৈচিত্র্য। শেয়ালের গায়ের মতো বিদঘুটে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ গন্ধ ভুরভুর করছে সমস্ত গুহায়।

নাকের মধ্যে সেই গন্ধের ঝাপটায় সমস্ত গা কাঁটা দিয়ে উঠল। এই হিংস্র জানোয়ারের আরাম নীড়েই তবে আশ্রয় নিয়েছে সে! অস্তমান চাঁদের আলোয় এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল সমস্ত গুহা, ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল বিরাট এক চিতাবাঘের অপূর্ব দেহশ্রী। চক্রাকার দাগ সর্বাঙ্গে।

মিশরের পশুরাজ সে। নিদ্রাসুখে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে আদুরে এক কুকুরের মতো,—এক পলক চোখদুটি খুলেই আবার বুজে গেল। মুখখানি ঘোরানো যোদ্ধাটির দিকেই।

চিতাবাঘের হাতে বন্দী এই যোদ্ধার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠল অজস্র ভাবনা। গুলি করবে সে? কিন্তু বন্দুকটা সোজা করে ধরবার ফাঁকও যে নেই দুজনের মধ্যে। বন্দুকের নলটাই সে এগিয়ে যাবে শিকার ছাড়িয়ে! উঠে পড়ে যদি? সম্ভাবনার আভাসেই পাষাণ-মূর্তির মতো শক্ত হয়ে গেল সে। স্তব্ধতার মধ্যে তার বুকের টিপ্ টিপ্ শব্দ শুনে সেই শংকিত কম্পনকেই সে অভিশাপ দিচ্ছিল বারবার। এর ঘুম আবার না ভাঙে;—এই সুযোগে তবু মুক্তির উপায় ভাববার অবসর পেয়েছে সে। দু' দু'বার দৃঢ়মুঠোয় ধরল সে তার তলোয়ার,—এক ঘায়েই কেটে ফেলবে গলাটা। কিন্তু তার ঘন কর্কশ লোমরাজি দেখেই সে মুষড়ে পড়ল। বিফলতা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। এর চেয়ে সে মানসিক নির্যাতনকেই বরণ করে নেবে। প্রতীক্ষা করবে ভোর পর্যন্ত।...শিগগিরি ফুটে উঠল ভোরের আলো। যোদ্ধাটি আবারো চিতাবাঘটিকে নজর করে দেখল,—থাবায় রক্ত!

"পেট ভরেই খেয়েছে বটে! জেগে উঠে নিশ্চয়ই আর খাই খাই করবে না।"—কিন্তু এই খাদ্যই হয় তো নরমাংস—একথা একবারও সে ভাবেনি।

সে এক বিরাট চিতাবাঘিনী। বুকের ও উরুদেশের লোমরাজির

শাদা রং যেন জ্বলছে, থাবার চারপাশে ঘোরানো মখমলের মতো কোমল ছোট ছোট দাগ, অপরূপ একটি ব্রেসলেটের মতো। পেশল লেজটিও শাদা, তারই ওপর গোল গোল কালো রেখা! পুরানো সোণার মতো তার দেহাবরণের উপরিভাগ, কিন্তু আরো মসৃণ ও কোমল! তার উপরে গোলাপের মতো চক্রাকার দাগ,—চিতাবাঘজাতির বিশিষ্ট গৌরব-চিহ্ন। এই ভয়ংকর অতিথিটি শান্ত-সুন্দর ভঙ্গীতে ঘুমোচ্ছে,—গদীর উপরে বেড়ালের বাচ্চা যেমন আরাম করে শুয়ে থাকে! দুর্বার নখর সমন্বিত শক্তিদৃপ্ত রক্তাক্ত থাবাটি সে বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে এবং মাথাটি রেখেছে তারই উপরে। দুইদিকে ছড়ানো সূক্ষ্ম সরল গুম্ফরাজি, রূপোর তারের মতো উজ্জ্বল!

এ হেন জীব খাঁচায় বন্দী থাকলে যোদ্ধাটি নিশ্চয়ই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত তার লাবণ্যলীলার, আর তার রাণীর মতো পোশাকের উজ্জ্বল রঙ বৈচিত্র্যের। কিন্তু এখন এই ভয়াবহ দৃশ্যের সামনে ক্রমেই তার চোখের দৃষ্টি নিভে আসছিল। ঘুমন্ত চিতাবাঘটির উপস্থিতিই তাকে যেন অসাড় ও অবশ করে রেখেছে, সাপের বিষাক্ত দৃষ্টির সামনে হতচেতন দোয়েল পাখীর মতোই। অদ্ভুত এই বিপদের মুখে দমে গেল যোদ্ধাটির সমস্ত সাহস, কিন্তু তবুও একথা নিঃসন্দেহ যে উদ্যত কামানের মুখেও সে তক্ষুণি এগিয়ে যেতে ভয় খেত না। একটা হতাশাদৃপ্ত ভাবনা চেতিয়ে উঠতেই তার মাথার ঘিলু পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠল। চরম সীমান্তে পড়ে মানুষ যেমন দুর্দ্ধর্ষ হয়ে ওঠে, ভাগ্যকে উপেক্ষা করে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুমুখে,—এই যোদ্ধাটির সম্মুখেও যেন তেমনি এক মারাত্মক অভিযান। স্থির হয়ে দাঁড়াল সে, শেষাংশ পর্যন্তই তার অংশ সে নিখুঁতভাবেই গ্রহণ করবে।

নিজের মনেই সে বলছিল—"দুদিন আগেও তো আরবদস্যুরা আমাকে খুন করে ফেলছিল!"

নিজেকে মৃত্যুমুখী মনে করেই সে নতুন সাহসে এবং অধীর ঔৎসুক্যে শত্রুর ঘুম ভাঙার ক্ষণটির জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

সূর্য উঠলে চিতাবাঘটি হঠাৎ চোখ মেলল; থাবা দুটো সবেগে বাড়িয়ে দিল সামনে, গা ছেড়ে আলস্য ভাঙবার ভঙ্গীতে হাই তুলে সে দেখাল বিপদ-সংকেতের মতো তার তীক্ষ্ণ দন্তপংক্তি, খাঁজকাটা উখার মতো কর্কশ জিভটা। আশপাশে গড়াগড়ি দিচ্ছিল সে, চটুলা প্রণয়িণীর মতো! দেখতে দেখতে যোদ্ধাটি ভাবছিল—

"বাঃ, দিব্যি একটি মহিলার মতোই তো!" বাঘিনী তার মুখ ও থাবার রক্ত চেটে নিল, মনোরম ভঙ্গীতে মাথাটি ঘষতে লাগল বারবার। "হ্যাঁ, একটুখানি সৌন্দর্যচর্চা করে নাও!"—যোদ্ধাটির বুকে এবার সাহসের সাথে সাথে ফিরে এসেছে প্রফুল্লতা। "তারপর হবে আমাদের সুপ্রভাতের পালা!"—অমনি সে হাতে তুলে নিল ছোট্ট ভোজালিটা।

এবং ঠিক তখনি চিতাবাঘটি মাথা ঘুরিয়ে যোদ্ধাটির দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে, কিন্তু এক পাও সামনে এগোল না। জ্বলন্ত ঐ ধাতব দৃষ্টির তীব্রতা লক্ষ্য করে কেঁপে উঠল যোদ্ধা প্রভেন্সালের সর্বাঙ্গ। জানোয়ারটা এগিয়ে আসছে তার দিকেই! কিন্তু শান্ত-সতর্ক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল,—জন্তুটিকে যেন মন্ত্রবলেই অবশ করে ফেলবে। যোদ্ধাটি তাকে কাছে এগোতে দিল, তারপর আদরের ভঙ্গীতে তার গায়ের উপর হাতখানি বুলিয়ে নিল মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত, চুলকে দিল তার হলদে রঙের সুন্দর পিঠটি। জানোয়ারটা উপরে লেজ তুলে দিল গভীর আরামে, নরম হয়ে এল চোখ দুটি। যোদ্ধাটি বারবার নিজের গরজেই আদর দেখাতে লাগল। বাঘিনী ঘড় ঘড় শব্দ করে উঠল বেড়ালের মতো। কিন্তু সে এমন এক জোরালো গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি যে গুহার দেয়ালে দেয়ালে তার প্রতিধ্বনি জাগল,—গির্জার অর্গান বাজনার মতো। তার এই আদরে

ভালোই কাজ হয়েছে দেখে সে দ্বিগুণ আগ্রহে লেগে গেল এবং শেষ পর্যন্ত এই ব্যাঘ্রসুন্দরী একেবারেই তৃপ্ত ও শান্ত হয়ে পড়ল।

যোদ্ধাটি নিশ্চিত ভাবেই এবার বুঝল যে তার চঞ্চল সংগিণীর হিংস্র স্বভাবকে সে বশে আনতে পেরেছে। আগের রাতেই নিষ্ঠুরভাবে পরিতৃপ্ত হয়েছে তার ক্ষুধা। তাই এখন সে গুহা ছেড়ে চলল বাইরে, কিন্তু পাহাড়ে উঠবার পথেই বাঘিনী ছুটে এল লাফাতে লাফাতে,—চড়ুই যেমন ডালে ডালে লাফ দিয়ে ফেরে! বাঘিনী এসে সৈন্যটির পায়ের উপরে ঘষতে লাগল তার দেহ. পিঠটা বাঁকিয়ে দিল বেড়ালের মতোই, এবং অনেকটা মোলায়েম চোখে অতিথির দিকে তাকিয়ে থেকে তুলল সে এক বন্য চীৎকার। তাকে জীব-বিজ্ঞানীরা তুলনা করেছেন করাত-কাটা শব্দের সংগে!

"বাঃ কী সুন্দর রূপ, চোখ যে আর ফেরানো যায় না!"—যোদ্ধাটির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বাঘিনীর কাণ ধরে খেলা করতে লাগল সে, বারবার জড়িয়ে ধরল তার দেহ, নখ দিয়ে জোরে জোরে আঁচড়ে দিল তার মাথাটা। দৃঢ়তর সাহসে তলোয়ারের আগাটা দিয়ে সে তার তালুতে আস্তে আস্তে খোঁচা দিতে লাগল, আর খুঁজতে লাগল অস্ত্রটা আমূল বসিয়ে দেবার মতো উপযুক্ত স্থান। কিন্তু তালুর হাড় লোহার মতো শক্ত! তাই সে মুষড়ে পড়ল।

মরুসুলতানা এবার মাথাটি তুলে গলা বাড়িয়ে দিল নীরবে,—দাসের সেবা অনুমোদন করেছে সে। হঠাৎ যোদ্ধাটি স্থির করল যে এক ঘায়েই একে সাবাড় করতে হলে গলায় ছুরি বসানো দরকার। কিন্তু ভোজালিটা তুলতেই চিতাবাঘটি অপরূপ এক লীলাভঙ্গীতে লুটিয়ে পড়ল তারই পায়ের কাছে; মাঝে মাঝে যোদ্ধাটির দিকে চোখ তুলে তাকাতে লাগল। স্বভাব হিংস্রতা সত্ত্বেও সে দৃষ্টিতে মেশানো রয়েছে কেমন কোমলতা!

যোদ্ধা বেচারা তালগাছে ঠেস দিয়ে খেজুর খাচ্ছিল আর কোনো মুক্তি-দাতার খোঁজে চারদিকে ফিরছিল তার সন্ধানী দৃষ্টি। ভয়ংকর সংগিনীর এমন নম্রতাও সন্দেহজনক, তাই সেদিকেও নজর ছিল। যোদ্ধাটি একটি একটি ক'রে খেজুর আঁঠি ছুঁড়ে ফেলছিল,—আর বাঘিনীও তা লক্ষ্য করছিল অদ্ভুত এক সন্দেহের দৃষ্টিতে। যোদ্ধাটিকে বিচার করে দেখছিল সে কড়া নজরেই। সহৃদয়ই মনে হ'ল তার বিচার। কারণ যোদ্ধাটির সামান্য খাবারটুকু সারা হ'লেই বাঘিনী এসে তার জুতো চেটে দিল, কর্কশ জিভটা দিয়ে তুলে নিল ভাঁজে ভাঁজে জমানো ময়লা।

"কিন্তু, এবার যখন খিদে পাবে?"—

তার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়েই বয়ে গেল এক শিহরণ। তবু সে উৎসুক চোখে এই বাঘিনীর দেহ-সৌষ্ঠব পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। স্পষ্টতই, নিজ জাতির মধ্যে বিশিষ্ট সুন্দরী সে। দুই হাত উঁচু, লম্বা তিন হাত,—লেজ বাদেই! লেজটিও একটি মুগুরের মতোই সুগোল,--লম্বা তিন হাত। সিংহীর মাথার মতো প্রকাণ্ড মাথাটির সৌন্দর্য অসাধারণ। সর্বাঙ্গ জুড়ে উদ্ধত হয়ে আছে ব্যাঘ্রীর নির্মম হিংস্রতা,—তবু শঠ নারীর সংগে একটা সাদৃশ্যও সেখানে বর্তমান! এই সংগীহীন সম্রাজ্ঞীকে দেখাচ্ছিল তখন ভীষণ সুন্দর,—সুরা-তৃপ্ত নিরোর মতো। আগেই সে ক্ষুধা মিটিয়ে নিয়েছে প্রচুর রক্তে, এবার খেলা করবে একটু!

যোদ্ধাটি বাইরে যেতে চাচ্ছিল, ব্যাঘ্রিনীও কোনোরকম বাধা দিল না, তৃপ্ত চোখে অনুসরণ করল শুধু, যোদ্ধাটির প্রতিটি পদক্ষেপেই তার সজাগ সন্দেহ। প্রভেন্সাল বাইরে ঘুরতে গিয়েই জলধারার সামনে দেখতে পেল তার ঘোড়ার মৃতদেহটা! কতদূর থেকে সেটাকে টেনে এনেছে ব্যাঘ্রিনী! প্রায় দুই তৃতীয়াংশই নিঃশেষিত। এবারে নিশ্চিন্ত হ'ল

যোদ্ধাটি। এবার সে বেশ বুঝতে পারছে, গত রাতে কোথায় ছিল এই ব্যাঘ্রিনী, কেনই বা রেখেছে তার ঘুমন্ত দেহের মর্যাদা।

প্রথম সাফল্যেই যোদ্ধাটি আশাভরে তাকাল ভবিষ্যতের দিকে। এক অদ্ভুত কল্পনা পেয়ে বসল তাকে। এই ব্যাঘ্রসংগিনীকে নিয়েই এখানে সে ঘর বাঁধবে? দিনরাতের সাধ্য-সাধনায় শান্ত করে রাখবে তাকে, নিজেকে মিলিয়ে নেবে তার আদরের মধ্যে! গুহায় ফিরেই সে খুশি হয়ে উঠল, সংগিনী লেজ নাড়ছে! একটুও ভয় হ'ল না তার, পাশে বসে খেলা করতে লাগল, থাবা দুটো ধরল দু'হাতে, কাণ টানল বারবার, সংগিনীকে ধরে নিজের পিঠের উপর তুলল এবং জোরে জোরে আঁচড়াতে লাগল তার তপ্ত-কোমল জায়গাগুলি। নিজেকে সে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে সংগিনীর হাতে। যোদ্ধাটি তার গায়ের লোমরাজি মসৃণ করতে গেলে সাবধানে সে গুটিয়ে রাখে তীক্ষ্ণ নখরগুলি। বাঁকা দামাস্কাস্ ছোরার মতই সে নখর!

যোদ্ধাটির একহাত তলোয়ারের উপর ন্যস্ত,—অতিবিশ্বস্ত এই ব্যাঘ্রিনীর বুকে অস্ত্রটি বসিয়ে দেবার কথা তখনো কিন্তু ভাবছে সে। কিন্তু মুমূর্ষু অবস্থায়ও সে যে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে টুকরো টুকরো করে! তা' ছাড়া, তার বুকের মধ্যেও জেগে উঠেছে এক সতর্কবাণী: শান্ত পশুকে খোঁচাতে যেয়ো না। যোদ্ধাটির মনে হ'ল,—এই অকূল মরু-সাগরে সেই তার বন্ধু, তার প্রাণের সংগিনী! হঠাৎ মনে পড়ল তার একদিনকার প্রণয়িনী একটি মেয়েকে। তার ভয়ানক ঈর্ষা ছিল, তাই ঠাট্টা করে তাকে ডাকা হ'ত 'ডার্লিং' বা 'আদুরী'। সেই মেয়েটির সন্দেহ-শংকিত প্রণয়ের ঈর্ষা মাঝে মাঝে এতটা উদগ্র হয়ে উঠত যে যোদ্ধাটির ভয় হ'ত—কোনদিন তার বুকেই সে ছোরা বসিয়ে দেয় বা। এই কথাটা মনে পড়তেই ঠিক করল সে, তরুণী এই ব্যাঘ্রসংগিনীকেও ডাকবে সে একই নামে। এর

শান্ত সতর্কতা ও অপূর্ব লাবণ্য দেখে ক্রমে ক্রমে সে বরং মুগ্ধই হয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যার মধ্যেই সে তার এই অদ্ভুত অবস্থায় এতটা অভ্যস্ত হয়ে উঠল যে এইবার ভয়ের বদলে বরং ভালোই লাগছে তার। সংগিনী এখন 'ডার্লিং' ডাকটি শুনলেই মুখ তুলে তাকায়।

সূর্যাস্তের সময় ডার্লিং কয়েকবার চিৎকার করে উঠল,—করুণ-ভীষণ সে চিৎকার। হাসিমুখেই ভাবল যোদ্ধাটি,—"বেশ শিক্ষাদীক্ষাই পেয়েছে বলতে হবে,—সান্ধ্য-প্রার্থনা আবৃত্তি করছে!" অবশ্যি সহচরীর এই শান্তভাবই তার মধ্যে এনে দিয়েছে এমন রঙ্গরস।

"বহুত আচ্ছা ডার্লিং, তুমি এবার ঘুমোও আগে!"—ঘুমুলেই চলে যাবে সে অন্য আশ্রয়ে, পা দুটিতে অস্থির প্রতীক্ষা!

এবার এই সুবর্ণ সুযোগেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল সে নীল নদের দিকে,—কিন্তু বালুপথে মাইলখানেক যেতে না যেতেই শুনতে পেল, ব্যাঘ্রিনী এক এক লাফে চলে আসছে তার দিকে, মাঝে মাঝে চিৎকার করছে করাত-কাটা শব্দের মতো,—তার লাফ-দিয়ে চলার শব্দ হচ্ছে ধপাস ধপাস।

"আচ্ছা?"—আপনমনেই বলছিল সে—"আমার প্রেমেই পড়ে গেছে দেখছি! আর কারো সংগে বোধহয় দেখা হয়নি আজো। বহুত আচ্ছা, আমিই এর প্রথম প্রণয়ী,—তবে তো গর্বই বোধ হচ্ছে আমার!" হঠাৎ সে পড়ে গেল চোরাবালুর মধ্যে। ভয়ানক বিপদ, এ থেকে কোনো পথিকই ত্রাণ পায় না কখনো; ক্রমে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে সে। মৃত্যুভয়ে সে চিৎকার করে উঠল। ব্যাঘ্রিনী এসেই তার জামার কলার কামড়ে ধরল ও প্রবল শক্তিতে পেছনে লাফিয়ে পড়ে তাকে টেনে তুলল। ঠিক ম্যাজিকর মতোই!

"আঃ, আমার ডার্লিং, আমার আদুরী!" যোদ্ধাটি উল্লসিতকণ্ঠে

ডাকতে ডাকতে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে—"আজ থেকে তুমি আমার জীবন-মরণের বন্ধু। এখন আর চাতুরী নয়, কেমন?" আবার ফিরে এল সে গুহায়।

এবার মরুদেশই ভরে উঠল যেন অভ্র লোকজনে। এবারে তার কাছেই আছে এমন একটি প্রাণী যার সংগে সে আদর আহ্লাদের কথা বলতে পারে। সাথীর হিংস্র স্বভাবও বেশ নরম হয়ে এসেছে। সত্যিই রহস্যময় এই অপূর্ব বন্ধুত্ব!

যোদ্ধাটি ঠিক করল, প্রহরীর মতো সজাগ থাকবে। কিন্তু শতচেষ্টা সত্ত্বেও কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে দেখে ডার্লিং অনুপস্থিত। পাহাড়ে উঠে সে দূরে দেখতে পেল তাকে, লাফিয়ে লাফিয়ে সে এগিয়ে আসছিল তার দিকেই। ব্যাঘ্রিনীদের মেরুদণ্ডের গঠন-গ্রন্থি এত নমনীয় যে তাদের পক্ষে দৌড়ানো একেবারেই অসম্ভব, তাই লাফিয়ে চলে।

কাছে এল ডার্লিং, চোয়ালে রক্ত! যোদ্ধাটির আদর গ্রহণ করল সে আরামের ঘড় ঘড় শব্দে; চোখ দুটি আবেশে বুজে এল। যোদ্ধাটি অপলক চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে এবং কোনো আদরের জনের মতোই তার কাছে বলতে লাগল,—

"আঃ সুন্দরী আমার! বেশ একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার মতোই তুমি, কেমন, না? আদর ভালোবাসো তুমি, খুবই ভালোবাসো? কিন্তু তোমার তো একটু লজ্জা-সরম থাকা উচিত, আরবের একটা মানুষকে খেয়ে এলে তো? ও, তুমিও তো ওদের মতো প্রাণী? তবে কোনো ফরাসীয়কে খেয়ে বসো না যেন! তা' হ'লে কিন্তু একটুও ভালো-বাসব না।"

ঠিক বাচ্চা কুকুরের মতোই সে প্রভুর সংগে খেলা করতে লাগল, তার হাতের আদর ও অত্যাচার পরম তৃপ্তিতে উপভোগ করতে লাগল।

বাঘিনী মাঝে মাঝে অনুনয়ের ভঙ্গীতে তাকে ঠেলা দিতে থাকে আবারো একটু আদর করার জন্যে !

কয়েকদিন কাটল এ ভাবেই। ভালোবাসবার মতো একটি সংগিনী পেয়ে তার কাছে নতুন করে দেখা দিল মরুদেশের অসীম সৌন্দর্য রাজ্য। এখন আছে তার পর্যাপ্ত খাবার, পাশেই আছে রমনীর মতো রমণীয় একটি প্রাণী—তাই মনের মধ্যেও জমে উঠছে কত নতুন নতুন কল্পনা! কী বিচিত্র, কী অদ্ভুত তার এই তরুণ জীবন, কী নতুন অথচ কেমন বিসদৃশ! নিস্তব্ধতা তার কাছে খুলে ধরেছে তার গোপন ভাণ্ডার, শান্ত সমারোহে মুগ্ধ করে রেখেছে তাকে। নবোদিত ও অস্তগামী সূর্যে খুঁজে পেয়েছে সে মানুষের অজানা এক বিচিত্র বিস্ময়!

মাথার উপরে কোনো বিরল পথিক পাখীর এক টুকরো ডানা ঝাপটানো শুনলেই তার প্রাণে জেগে ওঠে অপূর্ব শিহরণ। আকাশে দেখে সে পরিবর্তন চঞ্চল কত রঙ-বেরঙের মেঘদল, একটির পর একটি একাকার হয়ে মিলিয়ে যায় আকাশের গভীর নীলিমায়। স্তব্ধ গভীর রাতে বিভোর হয়ে দেখে সে চাঁদের খেলা, বালু-সমুদ্রের বুকে সাইমুনের দোলায় বালুর তরংগলীলা! প্রাচ্য জীবনে বেঁচে উঠেছে সে; কী বিচিত্র এই দেশের ঐশ্বর্য-গৌরব। কখনো বালু প্রান্তরে জাগে ঝঞ্ঝার বিপুল সৌন্দর্য,—ভয়ংকর এক রক্তাভ বাষ্প-কুজ্ঝটিকায় ঘোরপাক খেতে থাকে অনন্ত বালু-সমুদ্র। মুগ্ধ চোখে সে দেখতে থাকে! নেমে আসে সুন্দর রাত্রি, রাত্রির শিয়রে বর্ষিত হতে থাকে তারাদের করুণ শান্তি আশীর্বাদ। অন্তরীক্ষে শোনে অব্যক্ত কল্প-সংগীত। নিস্তব্ধতা ভরে তোলে তাকে সুন্দর স্বপ্ন-প্রলাপে। কত স্মৃতির জোয়ারে গা ঢেলে দিয়ে কাটিয়ে দেয় সে সমস্ত প্রহর।

ব্যাঘ্র সংগিনী আজকাল তার একান্তই প্রিয় হয়ে উঠেছে।

একটি স্নেহ-পাত্রীর সত্যিই তার দরকার ছিল। তার সম্পূর্ণ বশে এসেছে সে, তাই যোদ্ধাটি এখন আর একটুও ভয় পায় না। মরুদেশে অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে যথেষ্টই খাবার পায় ব্যাঘ্রিনী, তাই আজকাল সে মোটেই হিংস্র নয়।

যোদ্ধাটি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয় দিনের প্রায় সময়,—কিন্তু তখনো থাকে সে জালের উপরকার ঘুমন্ত মাকড়সার মতোই সতর্ক! এই দিগন্ত রেখাবন্দী রাজ্যে যদি কেউ এসে দেখা দেয় মুক্তির ইঙ্গিতের মতো,—তখন সে সুযোগ যেন নষ্ট না হয়! তাই সার্টটা দিয়ে একটা নিশান তৈরী করেছে সে, একটা পাতাছাঁটা খেজুর গাছের মাথায় উড়িয়ে দিয়েছে সেটাকে। একটা লাঠি দিয়ে নিশানটাকে টান করে রেখেছে,—এই মরু-পথে কোনো পথিক চলে যাবার সময়টিতে বাতাসে যাতে নড়ে ওঠে! তবু কত সময়ে কতবার সে ভেঙে পড়েছে হতাশায়, নানা রকম খেলায় ভুলে রয়েছে সাথীটিকে নিয়ে। সংগিনীর কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন ভঙ্গিমা ও দৃষ্টি-বৈচিত্র্য ঠিক ঠিক বোঝে সে, চেনে তার স্বর্ণময় রাজপোশাকের বিচিত্র কারুকাজ। ডার্লিং এখন আর আগের মতো গর্জন করে ওঠে না,—শাদা-কালো চক্রাকার দাগগুলি গুনবার জন্য তার ভয়ানক লেজটা উল্টে ধরে টানলেও না! সেই দাগগুলি সূর্যালোকে জ্বলতে থাকে বহুমূল্য মণির মতো। তার তুষার-শুভ্র বুকের ও তার সুন্দর মাথাটার কোমল রেখা-গুলি দেখে দেখে সে খুশিতে মেতে ওঠে। বিশেষ করে সে যখন খেলতে খেলতে আহ্লাদে নেচে ওঠে,—তার সেই চঞ্চলতা, তার সর্বাঙ্গের সেই যৌবনলীলা দেখে দেখে যোদ্ধাটার প্রাণ ভরে ওঠে নব নব বিস্ময়ে! তার লাফ দেওয়া, পাহাড়ে ওঠা, গড়িয়ে পড়া, তার গা ঘিষে বসা, গড়াগড়ি দেওয়া ও ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গী কেমন মনোরম! যত দ্রুতই সে লাফিয়ে চলুক না,—তার পায়ের তলে গ্রানাইট শিলা

যতই পিছল হক না—একটীবার ডার্লিং ডাক শুনতে পেলেই সে থমকে দাঁড়ায়।

একদিন জ্বলন্ত রোদে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল একটা প্রকাণ্ড পাখী। প্রভেন্সাল পাখীটাকে নজর করে দেখবার জন্যে সংগিনীর কাছ থেকে দূরে চলে এল,—কিছুক্ষণ পরেই বিরহিনী সুলতানার কণ্ঠে গর্জে উঠল করুণ এক আর্তনাদ।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ঈর্ষা হচ্ছে ওর!"—সত্যিই ব্যাঘ্রিনীর দৃষ্টি নির্মম কঠিন। —"নিশ্চয়ই ওর প্রাণ ঠিক নারীর মতোই।"

উন্মুক্ত আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল ঈগলরাজ। ব্যাঘ্রী-সংগিনীর সুগোল পৃষ্ঠদেশ, সুন্দর তনু রেখা আর দেহশ্রী দেখে যোদ্ধাটী আবার মুগ্ধ হয়ে পড়ে। প্রিয়তমা নারীর মতোই সুন্দরী এই সংগিনী। শুভ্রোজ্জ্বল লোম-রাজি মোলায়েম রঙ-বৈচিত্র্যে ভাঁজে ভাঁজে এসে মিশে গেছে উরুদেশের আবছা শাদার মধ্যে। ধূসর দাগের উপরকার এই উজ্জ্বল স্বর্ণ-কারুকাজ সূর্যালোকে রঙিয়ে উঠেছে কী সুন্দর! তা বর্ণনা করা অসম্ভব। যোদ্ধাটী ও ব্যাঘ্রিনী দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো। যোদ্ধাটী তার তালুর উপরে নখের আঁচড় কাটে, আর বারবার শিউরে ওঠে এই ব্যাঘ্রী-সুন্দরী, চোখ ঝলসে ওঠে নতুন দীপ্তিতে,—তারপরেই চোখ বুজে থাকে আবার।

"ওর বুকে নিশ্চয়ই নারীর প্রাণ আছে!"—বিশ্রামরত ক্লান্ত এই ব্যাঘ্ররাণীকে দেখে যোদ্ধাটী ভাবে। সোনালি বালুর মতো,—এই জ্বলন্ত নিঃসংগ মরুর মতোই সুন্দর এই শার্দুল-সংগিনী!

* * * *

"আচ্ছা?"—সেই মহিলাটী কাহিনীটা এই অবধি পড়ে বললেন,—"তা, বিচিত্র দুটী প্রাণীর এমন মিলনের পরিণতিটা হ'ল কী রকম?"

"সমস্ত প্রেমোচ্ছ্বাসই শেষ হয় যেমন,—ভুল বুঝবার জন্মে।"...

"এবং জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়েও!"—মহিলাটী যোগ করে দিলেন,—"তা' কাহিনীর শেষটা কি রকম?"—

সেই প্রোঢ় ভদ্রলোকটী আর এক বোতল শ্যাম্পেন নিঃশেষ করে আমাকে বলেছিলেন,—

"জানি না, কী করে তাকে আঘাত দিলাম; সত্যিই বুঝে উঠতে পারছিনা!—কিন্তু আমার উপরে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ক্ষিপ্তের মতো,—দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছিল আমার উরুটা। সে অবশ্যি, মারাত্মক কিছুই নয়।—তবু এই তো সে আক্রমণ সুরু করেছে—ভেবেই ভোজালিটা আমূল বসিয়ে দিলাম তার গলায়। ভয়ানক একটা আর্তনাদ করে সে গড়াগড়ি যেতে লাগল, হিম হ'য়ে গেল আমার শরীরের রক্ত! সম্মুখ মৃত্যুর সংগে যুদ্ধ করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে অপলক চোখে। ক্রোধের লেশমাত্রও নেই চোখে! তখন কেউ যদি তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারত তা হ'লে আমার জীবনের সর্বস্বও তাকে দিয়ে দিতাম! আমি যেন সত্যি সত্যিই নরহত্যা করে ফেলেছি। দূর থেকে ফরাসী সৈন্যেরা উড্ডীন পতাকাটা লক্ষ্য করে আমাকে মুক্তি দিতে এসে দেখল,—আমি অঝোরে কাঁদছি শুধু!"

ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে সে আবার বলতে লাগল—"দেখুন, এরপরে যুদ্ধ করেছি জার্মণীতে, স্পেনে, রাশিয়ায়, ফ্রান্সে; আমার এই দেহ কংকাল বয়ে নিয়েছি আমি দুনিয়ার সর্বত্র;—কিন্তু আমার চোখে মরুভূমির তুলনা নেই আর কোথাও! ওঃ, কী অদ্ভুত, কী সুন্দর, কী আশ্চর্য!"

"কি রকম?" জানতে চেয়েছিলাম।

"তা বর্ণনা করা অসম্ভব। তা ছাড়া, আমার সেই ব্যাঘ্রসংগিনী ও সেই কয়টি খেঁজুর-সংগীর জন্যে এখন আর দুঃখও হয় না। দুঃখ অবশ্যি হওয়া উচিত! কিন্তু, একটা কথা লক্ষ্য করবেন,—সবই আছে মরুদেশে, আবার কিছুই নেই!"

"ঠিক বুঝলাম না।"

আবেগভরে তিনি বলে উঠলেন—

"সে হচ্ছে সৃষ্টিছাড়া ভগবান!"

অনিন্দ্য প্রাসাদ

—ব্যালজাক

ডাক্তার বলছিলেন, "আমার মনের রাজ্য জুড়ে রয়েছে কয়েকটা ভয়ানক কাহিনী, কিন্তু সব কথা বলারও একটা বিশিষ্ট স্থান ও সময় থাকা দরকার।"

"কিন্তু এখন তো মোটে দুটো, রেজিনার গল্পটা শুনে আমরা খুবই উৎসুক হয়ে পড়েছি।" গৃহস্বামিনী বললেন।

"বলুন, বলুন আপনি।" চারিদিক থেকেই মিলিত অভ্যর্থনা।

ডাক্তারবাবু সম্মতিভরে মাথা নোয়ালেন। নিঃশব্দ চারিদিক।

—ভেন্দোম থেকে শ'খানেক হাত দূরে, লয়েন নদীর তীরে ধূসর রঙের একটা বাড়ী, খুব উঁচু, চারপাশ থেকে একবারেই বিচ্ছিন্ন। এমন কি একটা দোকান বা ঘরও দেখা যায় না কাছাকাছি। বাড়ীটার সামনেই

একটা বাগান নেমে এসেছে নদী পর্যন্ত, ঝাড়-জংগলগুলি পথটির দুপাশে সুন্দর করে ছাঁটা থাকত একদিন, আজ নির্বিবাদে তারা জড়াজড়ি করে উঠেছে উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গীতে। কয়েকটা উইলো গাছ জল থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছে পাঁচিলের মতো,—আড়াল করে রেখেছে বাড়ীটার আধখানা। বুনো লতাগুলি সমস্ত তীরদেশ ছেয়ে ফেলেছে তাদের শ্যামল সুন্দর প্রাচুর্যে। ফলের গাছগুলি অযত্নে পড়ে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন বন্ধ্যা জঞ্জাল! পথটি একদিন ছিল কাঁকর-বিছানো, আজ আগাছা জমে আছে তার উপর, বা আরও সত্যি করে বলতে গেলে, পথের কোনো চিহ্নই নেই কোনোদিকে।

একমাত্র পাহাড়ের চূড়া থেকেই দেখা যায়—পাহাড়ের গায়ে ভেন্দোমের এই বাড়ীটা। মনে হয় বাড়ীটা ছিল বুঝি কোন তরুপ্রিয় পল্লীবাসীর। ভিতরে একটা কুঞ্জ বা কুঞ্জের ধ্বংশাবশেষ। মনে পড়ে, পল্লীর শান্তিময় নীড়ে একদিনকার এক নিরালা জীবন। স্মৃতিস্তম্ভের স্মৃতিলিপি দেখে ঘনিয়ে আসে সেদিনের পরিবেশ। এই সব আড়ালে একটা ব্যথা যেন নিবিড় হয়ে জমে আছে।

বাড়ীর ছাদটা ভয়ানকভাবে ভাঙা, বাইরের জানলাগুলি সব সময়ই বন্ধ; ঝুল বারান্দায় চড়ুইয়ের বাসা, দোরটা যেন চিরদিনের জন্যেই রুদ্ধ। কয়েক ধাপ পর্যন্ত সিঁড়ি ঢেকে আছে আগাছা জংগলে। কত দিনরাত্রি, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে ক্ষয়ে গেছে কাঠ, উঠে গেছে রঙ। চারিদিকের নিথর নীরবতা মাঝে মাঝে ভেঙে যায় পাখী বা বন বেড়ালের ডাকে। ইঁদুর ও টিকটিকিরা মিলে ঘুরে বেড়ায় চারিদিকের এই অবাধ রাজত্বে, মারামারি করে খায় নিজেদের মৃতমাংস। এক অদৃশ্য বিরাট হাত সমস্ত কিছুর উপরেই যেন টেনে নামিয়েছে বিরাট রহস্যের যবনিকা।

ঔৎসুক্য বশে রাস্তা থেকে যদি তাকাও তো দেখবে : সামনেই রয়েছে প্রকাণ্ড এক সিংহদ্বার; ছেলেপিলেরা বহু গর্ত খুঁড়েছে তার গায়ে। এই ছেঁদা দিয়ে চোখে পড়বে, ওপারে এক ধ্বংসের ছবি। হা করে আছে দেয়ালের অসংখ্য ফাটল, ধ্ব'সে পড়েছে ভাঙা ভাঙা সিঁড়ি! উর্দ্ধদেশ থেকে এখানে যেন নেমে এসেছে দেবতার নির্মম অভিশাপ। ভগবানই বুঝি অপমানিত হয়েছেন এখানে! নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে। সরীসৃপেরা বুকে ভর করে ঘোরাফেরা করছে ধ্বংসস্তূপের উপর। এই শূন্য পরিত্যক্ত গৃহ যেন বিরাট এক হেঁয়ালি, —চির-নিরুত্তর!

আগের দিনে এই প্রাসাদ ছিল ছোটখাট একটা রাজ্যবিশেষ। চিকিৎসা ব্যাপারে এই ভেন্দোমে থাকার সময় বাড়ীটা আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখত এক বিচিত্র নেশার আনন্দে। ধ্বংসের মাঝে কত সুন্দর এর রূপ! কালের নিষ্ঠুর হাতে দিন দিন যতই ভেঙে আসছে এর দেহ, ভাঙা বুকের নিগূঢ় নিভৃতে এ যেন নিয়ে ফিরছে কোন গুঢ়তর রহস্য। কতবার আমি চারিদিকের জংগলের মধ্য দিয়ে ঘুরেছি, সাহসভরে পথ করে নিয়েছি এই অদ্ভুত বাগানের মধ্যে। এই ভূমি সর্বসাধারণের নয়, কোনো ব্যক্তিবিশেষেরও নয় যেন। এই বিশৃংখল সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বুনে চলেছি কত স্বপ্ন, ডুবে গেছি নেশার মতো এক বিষণ্ণ বেদনার মাঝে। নিয়তির নিষ্ঠুর হাতে এখানে যেন ঘুরে ফিরছে মানুষের মতো জীবন-ধারা। এ যেন সাধুশূন্য গুহাবাসের নির্জন স্তব্ধতা, মৃতশূন্য কবরভূমির নিঝুম শান্তি,—স্মৃতিস্তম্ভের অসংখ্য লিপিতেও অস্ফুটে গুঞ্জন করছে শুধু অতীতের ভাষা! কিন্তু এইখানেই দেখেছি আমি বিষণ্ণ-নির্জন এক পল্লী-জীবন। প্রায়ই এসে চোখের জল ফেলেছি এখানে, হাসিনি একটিবারও। একদিন বসে

আছি হঠাৎ মাথার উপরে শুনলাম একটানা একটা গম্ভীর ধ্বনি,—বুনো ঘুঘুর ধাবন্ত ডানার শব্দ। কিন্তু ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। চারদিকে স্যাঁতস্যেঁতে ধ্বংসস্তূপ, সাবধানে পা ফেলতে হয়,—তার ওপর গিরগিটি, ইঁদুর ও ব্যাঙেদের ভিড়। আদিম অন্ধ প্রকৃতির অবাধ উল্লাস!

একদিন সন্ধ্যাবেলা ভয়ে কেঁপে উঠলাম। হাওয়ার বেগে ঘুরে গেল 'ওয়েদার ককটা', তারি কড়্‌কড়্‌ শব্দটা ঘরের মধ্যে বেজে উঠল আর্তনাদের মতো। হোটেলে ফিরে এলাম ভাবতে ভাবতে। গৃহ-স্বামিনী খাবার পরে এসে দাঁড়ালেন কিছুটা রহস্যের মতোই এবং বললেন "মঁশিয়ে রেগ্‌নাল্ট এসেছেন।"

"কে মঁশিয়ে রেগনাল্ট?"

"বাঃরে! আপনি চেনেন না তাঁকে?" বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ দেখলাম দোরে এক ভদ্রলোক; তার জামাটা ছেঁড়া ও পুরানো হ'লেও তার উপরে আঁটা রয়েছে একটা মুক্তো, কাণে সোণার কুণ্ডল। জানতে চাইলাম কে তিনি।

"আমিই মঁশিয়ে রেগনাল্ট। ভেন্দোমের একজন এটর্ণি।"

"কিন্তু যতদূর মনে হচ্ছে আমার পক্ষে তো এখন কোনো উইল করা সম্ভব নয়।"

"আরে, দাঁড়ান মশাই!"—আমাকে থামিয়ে দেবার ভঙ্গীতেই তিনি যেন হাত তুললেন—"খবর পেলাম, আপনি প্রায়ই বেড়াতে যান। লা গ্রান্দ প্রাসাদের বাগানে?"

"হ্যাঁ, তা যাই।"

"দাঁড়ান একটু!"—তিনি আবার সেই ভঙ্গী করলেন।—"কিন্তু

সে তো অন্যায়, বিগতা কাউন্টেস দ্য মেরেটের উইলরক্ষাকারী হিসেবে তাঁরই নাম নিয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি, এই অভ্যাসটি পরিত্যাগ করুন। আমি মশাই গোঁয়ার তুর্কী নই, সামান্য ব্যাপারকে গুরুতর করে তুলতে চাই না। তা ছাড়া, ভেন্দোমের সর্বশ্রেষ্ঠ এই প্রাসাদটিকে কেন যে আমি বাধ্য হয়ে এমন ভগ্ন-জীর্ণ অবস্থায় রক্ষা করে আসছি,— তা আপনার না জানাই স্বাভাবিক। সে যাই হক, শিক্ষিত লোক আপনি, আপনি যেমন খুশি চলাফেরা করতে পারেন,—কিন্তু উইলের বন্ধনে বাঁধা বলেই আমি আপনাকে আবারো স্মরণ করিয়ে দেব ওখানে পদার্পণ না করতে। দেখুন আমি নিজেও বড় একটা ওমুখো হই না। ওঃ; তাঁর সেই উইলের সময় সমস্ত শহরেই সে কী বিরাট হৈ-চৈ !"

ভদ্রলোক নাক ঝাড়তে থামলেন একবার। তাঁর কথা শুনেই বুঝলাম যে মাদাম মেরেটের সম্পত্তি রক্ষা ব্যাপারের সংগে তার স্বার্থ-কেন্দ্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তা যা হক, আমার কল্পনার মাঝখানে পড়ল চকিত যবনিকা। তা হ'লে তো এবারে জানতে হবে মূল ব্যাপারটা কী ?

বললাম—"দেখুন, এই অদ্ভুত অবস্থার মূল কারণটা জানতে চাইলে কি অপরাধ হবে আমার ?"

এই কথায় ভদ্রলোক যেন একেবারেই বিকশিত হয়ে উঠলেন—একটা আনন্দ ছেয়ে গেল তার সারা মুখে। নস্যির কৌটোটা থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি 'না' জানালে নিজেই নিলেন বড় এক টিপ।

"মশাই, একদিন সন্ধ্যেবেলা শুতে যাচ্ছি। (তখনো বিয়ে হয়নি আমার) এমন সময় শুনলাম, মাদাম মেরেট আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁর বাড়ীতে। তাঁর পরিচারিকাটি, বেশ মেয়েটি মশাই, এখন সে থাকে একটা হোটেলে,—সে নিজেই কাউন্টেসের গাড় নিয়ে হাজির। 'আচ্ছা'

দাঁড়ান একটু। একটা কথা বলা উচিত ছিল আগেই। আমার এই ভেন্দোমে আসার দু মাস আগেই কিন্তু মঁশিয়ে কাউণ্ট মেরেট প্যারিসে গিয়ে মারা যান। তার শেষ জীবনটা বড় করুণ, সবরকম বদখেয়ালেই খোয়ালেন জীবনটা। বুঝলেন না?"

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পরেই মাদাম মেরেটও লা গ্রান্দ প্রাসাদ ছেড়ে দিলেন। কেউ কেউ বলে তিনি নাকি চেয়ার টেবিল আলনা,—এককথায় সব জিনিসপত্রই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। আচ্ছা, মেরেট গেছেন কখনো? যাননি? আঃ, সে কি চমৎকার জায়গা।"

মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়ে সুরু করলেন আবার—"শেষের মাস-তিনেক কাউণ্ট আর কাউণ্টেস বাস করতে লাগলেন বড় অদ্ভুত ধরণে,—কোনো অতিথিকেই বাড়ীতে আসতে দিতেন না। মাদাম শুতেন নীচ-তলায় আর মঁশিয়ে দোতলায়। মাদাম মেরেট কখনো বাড়ী থেকে বেরুতেন না, একমাত্র রোববার ছাড়া! তারপর, এই লা গ্রান্দ ছেড়ে যখন তিনি মেরেট এলেন তখন তাঁর মধ্যে এসে গেছে বিরাট এক বিপর্যয়। সেই প্রিয় নারী, প্রিয় বললাম, কারণ তিনিই আমাকে দিয়েছেন এই হীরকটি—খুব অসুখে পড়লেন। কিন্তু তাঁর মানসিক অবস্থা এমন যে ডাক্তার ডাকা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। অনেকে ভাবল, মাথাই খারাপ হয়েছে তাঁর। তারপর শুনুন, মাদাম মেরেট কি জন্যে ডেকেছেন ভেবে ভারী উৎসুক হয়ে রইলাম! সেদিন রাতেই সমস্ত শহরে জানাজানি হয়ে গেল—মেরেট যাচ্ছি আমি।

পথে পরিচারিকাটির কাছ থেকে এটুকু জানতে পেলাম,—সেদিন রাতেই বোধহয় তিনি মারা যাচ্ছেন! রাত এগারোটায় পৌছলাম গিয়ে প্রাসাদে। মস্ত বড় সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রশস্ত কয়েকটা অন্ধকার ঘর পেরিয়ে এলাম মাদাম মেরেটের শোবার ঘরে।

তারপর শুনুন, মেয়েদের মধ্যে চলিত কাহিনী থেকে বোঝা যায় (তা সব কাহিনীই তো আর সত্যি নয়!) মাদাম মেরেট ছিলেন যৎকিঞ্চিৎ ভ্রষ্টা! হ্যাঁ, তারপর মস্ত বড় বিছানার মধ্যে তাকে তো খুঁজেই পাচ্ছি না। সুন্দর কারুকাজকরা সেই প্রাচীন দিনের জমকালো বিছানা। পাশেই পাতা রয়েছে একটা আরাম কেদারা—তাঁর বিশিষ্ট এক সখীর জন্যে, পাশেই দুটো ছোট কেদারা। মশাই, সেই ঘরটা দেখলে মনে হবে আপনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন! সমস্ত কিছুই যেন মৃত্যুর হিম-নিশ্বাসে ভরা!"—এই পর্যন্ত বলেই ভদ্রলোক অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাতটা তুললেন।

"শেষ পর্যন্ত দেখলাম তাঁকে প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে, মুখখানি মরার মতো ফ্যাকাশে, হাতদুটি অস্থিচর্মসার, চুলগুলি শাদা। বহুকষ্টে তিনি বিছানায় বসে আছেন, কালো চোখদুটি মুমূর্ষুর মতো নিষ্প্রভ, পলকহীন! সরু হাত দুটি যেন কোমল চামড়া ঢাকা দুখানা হাড়, জেগে আছে প্রতিটি শিরা-উপশিরা! একদিন তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন। এখন তাঁকে দেখে চমকে উঠলাম। ডাক্তার মানুষ আমি, অনেক মুমূর্ষু দেখেছি, কিন্তু এমন কঙ্কালসার চেহারা কক্ষণো আর চোখে পড়েনি। ক্ষয়ে ক্ষয়ে এখন যেন পড়ে আছে তার একটা ছায়া মাত্র! মুমূর্ষুর চারপাশে কান্নাও শুনেছি অনেক,—কিন্তু এই নির্জন নিস্তব্ধ ঘরে এই মহিলার মৃত্যুর মতো এমন মর্মান্তিক চিত্র কখনোই চোখে পড়েনি আর। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই, তাঁর বুকঢাকা চাদরে পর্যন্ত ওঠানামা নেই! স্তব্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছি শুধু। শেষে তাঁর বড় বড় চোখদুটি নড়ে উঠল, একখানা হাত তুলতেই আবার পড়ে গেল বালিশের উপর। মৃদুনিশ্বাসের মতো বেরোল একটি অস্ফুট কথা—"আপনার পথ চেয়েই বসে আছি আমি।" হঠাৎ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর গাল দুটি, কথা কইতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল তাঁর।

"মাদাম !"—আমি কথা বলতে যাচ্ছিলাম। নিষেধ করল সে।

আমি বসলাম। মাদাম বহু কষ্টে বালিশের নীচে হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং মোড়ান একটা কাগজ বের করলেন। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমল কপালে।—"আপনার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি আমার উইল। ও, ভগবান, ওঃ !" একটা ক্রুশ হাতে নিয়ে ওষ্ঠে ছোঁয়ালেন তিনি এবং সাথে সাথেই সবশেষ।

বাড়ী ফিরে দেখলাম, উইলের বিশ্বস্তভার দেওয়া হয়েছে আমারই উপর। ভেন্দোমের হাঁসপাতালের নামে দান করা হয়েছে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি। একমাত্র লা গ্রান্দ প্রাসাদ প্রসংগেই তাঁর নির্দেশ : "কাউন্টেসের মৃত্যুর পরেও পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বাড়ীটা থাকবে ঠিক আগের মতোই। কোনো রকম সংস্কার বা বাড়ীর মধ্যে কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ। প্রয়োজন হ'লে দারোয়ান রাখতে হবে। এই সব সর্ত যথাযথ পালন করা হ'লে পঞ্চাশ বছর পরে এই সম্পত্তি হবে আমারই বংশধরের। কারণ আইনজীবী নিজেই আইনমতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। অন্যথায় সম্পত্তি যাবে মাদাম মেরেটেরই উত্তরাধিকারীদের হাতে,—তাও নির্ভর করছে অবশ্যি কতগুলি সর্ত রক্ষা করার উপর এবং সেই সর্তগুলিও পঞ্চাশ বছরের আগে খুলে দেখা নিষিদ্ধ। তা, কে আর খুলে দেখতে যাচ্ছে ?"—খুশিমুখেই থামলেন তিনি।

আমি বললাম—"এমন নিখুঁত করেই মুমূর্ষু নারীর বর্ণনা করেছেন যে আমার চোখের সামনে এখনও দেখছি তাঁর রুগ্ন দেহ। কিন্তু আপনি বোধহয় অনুমান করেছেন উইলের মধ্যে কি লেখা আছে ?"

"দেখুন, আমাকে যিনি এই হীরকটি উপহার দিয়েছেন আমি তাঁর কোনো রকম সমালোচনা করব না।"

এবারে তিনি রওনা হলেন, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলছিলেন—

"আর পঁয়ত্রিশটা বছর! অনেকেই বাঁচছে তো! কিন্তু দাঁড়ান একটু—" বলেই শয়তানের মতো একটা আঙুল উঁচিয়ে বললেন আবার—"লক্ষ্য করবেন, সে পর্যন্ত বেঁচে থাকলে—সে পর্যন্ত,—তা এখন তো আমার বয়স ষাট্ মাত্র!"

দোর বন্ধ করে ভাবতে ভাবতে বসে পড়লাম আরাম কেদারাটায়। এমন সময় কার সাবধানী হাতে দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে এলেন হোটেল কর্ত্রী মাদাম লেপাস,—খুবই হাসিখুশি তিনি।

"আচ্ছা দেখুন, মঁশিয়ে রেগনাল্ট আপনাকে লা গ্রান্দের কথাই বলছিলেন?"

"হ্যাঁ"

"কি বললেন তিনি?"

দু' এক কথায় বললাম সব। শুনতে শুনতে আগ্রহে তিনি ঝুঁকে পড়ছিলেন, আমার মুখের দিকে তার তীক্ষ্ণ নজর ঠিক গোয়েন্দার মতো, —উৎসুক শ্রোতার মতো।

"মাদাম লেপাস, মনে হচ্ছে আপনি আরো কিছু জানেন,—নইলে এত আগ্রহ ভরে শুনতে আসবেন কেন?"

"সত্যি বলছি, না, আর কিছু জানিনে আমি।"

"মিছা শপথ করবেন না, গোপন কিছুর আস্বাদে ডাগর হয়ে উঠেছে আপনার চোখ। আচ্ছা, কী ধরণের লোক ছিলেন তিনি?"

"মঁশিয়ে কাউণ্ট মেরেট?—খুব লম্বা চওড়া চেহারা, খুব রাগী,— আমরা সব মেয়েরাই তাঁকে ভালোবাসতাম খুব। মাদাম মেরেটও ছিলেন তখনকার দিনে নামকরা ধনী ও সুন্দরী। বিশহাজার ফ্রাংক ছিল তার মাসিক আয়। নারীদের মধ্যে ছিলেন তিনি মণিস্বরূপ। এমন সুন্দর স্বামী-স্ত্রী দেখেনি কেউ।"

"সুখী ছিলেন তারা?"

"হুঁ—তাই তো—যতদূর মনে হয়—বুঝতেই পারছেন, আমরা চুনো-পুঁটির দল রুইকাতলার দলে মিশতেই পারতাম না। মাদাম মেরেটকে অবশ্যি মাঝে মাঝে স্বামীর দাবানি সহ্য করতে হ'ত। কিন্তু ভদ্রলোক বদরাগী হ'লেও আমরা সবাই ভালোই বাসতাম তাঁকে।"

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন ছাড়াছাড়ির মূলে কোনো একটা ঘটনা আছে বলেই তো মনে হয়।"

"আমি তো বলিনি আছে। তেমন কিছু আছে বলে জানা নেই আমার।"

"ঠিক বলছেন না, নিশ্চিতই জানেন আপনি।"

"তা—তা—দেখুন, তা হ'লে আপনাকে বলছি সব কাহিনী। এ পর্যন্ত বলবার মতো বিশ্বস্ত লোকই পাইনি আমি। আপনি ভদ্রলোক, আমার এই হোটেলে আছেন বহুদিন—আপনাকেই বলতে পারি পনেরো হাজার ফ্রাংকের কাহিনী—"

শুনতে লাগলাম :

সম্রাট স্পেনীয় যুদ্ধ বন্দীদের এখানে পাঠালেন, সরকারী খরচেই একটি বিশিষ্ট বন্দীর তত্ত্বাবধানের ভার পড়ল আমার উপর। নামজাদা কোনো রাজপুত্রই হবে সে। কী সুন্দর ছিল সেই যুবক! আঃ, যদি দেখতেন একবার! মাথাভরা কালো চুল, গায়ের রং কিছুটা তামাটে, তাই দেখতে আরো সুন্দর। আর কাউকেই অমন দামী পোশাক পরতে দেখিনি। যুবরাজ রাজকন্যারাও তো থাকেন আমার এখানে। খুবই কম খেত সে—এমন নম্র দরদী ছিল তার আচরণ যে তাকে কিছুতেই ভোলা যেত না! ওঃ, আমি খুবই ভালোবাসতাম তাকে। সে অবশ্যি

তিন চারটের বেশী কথা আমার সংগে বলেনি। কেমন একটু অদ্ভুত মানুষ!

গির্জায় গিয়ে সে বসত মাদাম মেরেটের কাছাকাছি। বেড়াতে যেত সে পাহাড়-চূড়ায় দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মাঝে। এই ছিল তার বন্দী-জীবনের সান্ত্বনা—এখানে এসে নাকি তার স্বদেশের কথা মনে পড়ত। স্পেন যে পাহাড়ের দেশ।

একদিন রাত করেই বেরোল সে এবং ফিরল না দুপুর রাতেও। একটু ভাবনায়ই পড়লাম, যে রকম খেয়ালী মানুষ! দোরের চাবি সে নিয়ে গেছে, তাই আর রাত জেগে রইলাম না। সে থাকত আমারই একটা বাড়ীতে রু দ্য মর্টারে। পরের দিন শুনলাম, একটি সহিস ছেলে নদীতে তার ঘোড়াকে স্নান করানোর সময় একজন স্পেনীয় যোদ্ধাকে ওপার থেকে সাঁতার কেটে আসতে দেখেছে। যুবকটী বাড়ী এলে বললাম যে অমন রাতে নদীতে সাঁতরানো ভালো নয়।

তারপর শেষে,—একদিন ভোরে তার আর দেখা নেই, ফিরেই আসেনি সে! তার জিনিষ পত্র হাতড়াতে হাতড়াতে পেলাম এক টুকরো লেখা ও সংগে চার হাজার ফ্রাংক, পঞ্চাশটা গিনি ও ছোট্ট একটা বাক্সে দশ হাজার দামের একটা মুক্তো। কাগজে লেখা রয়েছে, সে যদি না ফেরে তবে সেই টাকাটা রইল তার আত্মার মুক্তি কামনায়।

খুব খোঁজাখুঁজি হ'ল। শেষ পর্যন্ত তার পোশাকটা পাওয়া গেল একটা পাথরের উপর—লা গ্রান্দির বাড়ী থেকে সোজা নদীর ওপারে। তখন কী আর করা যায়, পুড়িয়ে ফেলা হ'ল তার পোশাক এবং তারই ইচ্ছানুসারে প্রচার করা হ'ল যে সে পলাতক।

সবারই ধারণা হ'ল ডুবেই মরেছে সে। আমার অবশ্যি ধারণা হ'ল ঠিক উল্টো—মাদাম মেরেটের সংগে এ ঘটনার যোগাযোগ আছে

কোথাও। আমি জানি, মাদাম প্রাণের মতো ভালবাসতেন একটা ক্রুশ এবং মরবার সময় পর্যন্ত হাতে হাতে রেখেছেন সেটাকে। এদিকে স্পেনীয় বন্দীটিরও ছিল একটা ক্রুশ, কিছুদিন পর সেটাকে আর তার কাছে দেখা যায়নি! আচ্ছা এবারে বলুন, এই পনেরো হাজার ফ্রাংক কি ন্যায়ত আমারই নয়?

কয়েক মিনিট কথা বলে মাদাম লেপাস চলে গেলেন। আমার মনের মধ্যে এক উৎসুক আশংকা, এক শংকিত স্তব্ধতা! মাঝরাতে গির্জায় গেলে যেমন হয়। হঠাৎ এবারে চোখের সামনে স্পষ্ট জেগে উঠল,—সেই লা গ্রান্দ প্রাসাদ, ঝাড়-জংগলে ঢাকা, দরজা-জানলা বন্ধ, শূন্য প্রকোষ্ঠ—সমস্ত কিছু।

না, এই রহস্যের তলদেশ খুঁজে দেখব আমি,—একে একে তিনটি লোকের মৃত্যু হ'ল কি জন্যে?—স্বামী, স্ত্রী আর ঐ বন্দী যুবকটির!

সমস্ত ভেন্দোমের মধ্যে রোজেলিনকেই মনে হ'ল সবচেয়ে রহস্যময়ী, এর ভিতরেই আছে কোনো গোপন সন্ধান! অপূর্ব সুন্দরী সে, কুমারী! ঠিক করলাম যদি দরকার হয় এই রোজেলিনের সংগেই ভাব করে নেব সাধারণ প্রেমের নারী নয় সে, সে যেন একটা ভয়ানক রোমান্সের শেষ অধ্যায়!

একদিন জানতে চাইলাম মাদাম মেরেটের কথা এবং সমস্ত কাহিনীই গোপন থাকবে প্রতিশ্রুতি দিলে সেও রাজী হ'ল। এটর্ণি ও মাদাম লেপাসের কাহিনী এবার স্পষ্ট রূপ নিয়ে ফুটে উঠল রোজালিনের মুখে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই:

লা গ্রান্দি প্রাসাদের নীচতলার একটা ঘর, দেয়ালের গায়ে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড আলমারী। মাদাম মেরেট শুতেন নীচের এই ঘরে, আর মঁশিয়ে মেরেট উপর তলায়। কিছুদিন থেকেই স্ত্রীর শরীর অসুস্থ, তাই

তিনি আলাদা শুতেন। মঁশিয়ে মেরেট হঠাৎ একদিন ক্লাব থেকে ফিরলেন বেশ একটু রাতেই, ক্লাবের আলাপ-আলোচনায় এবং খেলার নেশায় দেরী হয়ে গেছে। এদিকে তাঁর স্ত্রী ভেবেছেন যে রোজকার মতো স্বামী উপরেই ঘুমিয়ে আছেন।

মঁশিয়ে মেরেট প্রথম প্রথম রোজালিনের কাছে খোঁজ নিতেন, তাঁর স্ত্রী ঘুমিয়েছে কিনা; আজকাল তিনি সোজা নিজের ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু সেদিন হঠাৎ স্ত্রীর ঘরে এলেন তাঁকে দেখতে। বিলিয়ার্ড খেলায় চল্লিশ ফ্রাংক হেরেছেন, সে ব্যাপারে স্ত্রীর কাছ থেকে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় স্ত্রীকে দেখেছেন খুবই ফিটফাট, নিশ্চয়ই তাঁর শরীর ভালোই যাচ্ছে, মনটাও রয়েছে হাসিখুশি। কিন্তু স্বামীরা সব কিছুই বোঝেন একটু দেরীতে! যাক, রোজেলিনকে না ডেকে তিনি নিজেই এলেন নীচের ঘরের দিকে, তাঁর পায়ের পরিচিত শব্দ বেজে উঠল সিঁড়িতে সিঁড়িতে!

ভদ্রলোক স্ত্রীর ঘরের দোরটা খুলেছেন, অমনি ওদিকেও দেয়ালের আলমারীটার দোরটা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ভেতরে এসে দেখলেন—স্ত্রী একা। স্বামী ভাবলেন, রোজেলিনই বোধহয়। কিন্তু হঠাৎ একটা সন্দেহ লক্ষ লক্ষ সংকেত ধ্বনির মতো বেজে উঠল তার অন্তরের মধ্যে! সতর্ক হলেন তিনি। স্ত্রীর চোখে মুখে লক্ষ্য করলেন অবর্ণনীয় একটা উদ্বিগ্নতা, শংকার সংকেত!

"খুব দেরীতে এলে তো আজ!"—স্ত্রী বলছিলেন। তার কণ্ঠ স্বভাবতই মিষ্টি। কিন্তু এখন শোনাল কেমন ভাঙা ভাঙা, জড়ানো।

মঁশিয়ে মেরেট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন,—কারণ তখনি অন্য এক দোর দিয়ে ঢুকল এসে রোজেলিন। এবার? তিনি বুকের উপরে হাত দুখানি ভাঁজ করে পাইচারি করতে লাগলেন।

"কোনো খারাপ খবর পেয়েছ কি, না, শরীর খারাপ?"—ভীরুভাবেই তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু স্বামী একটা কথারও উত্তর দিলেন না।

স্বামীর মুখ দেখেই মাদাম মেরেট শংকার ইঙ্গিত পেলেন, এখন তার সংগে একাই থাকা দরকার। রোজেলিনকে এ ঘর থেকে ছুটি দিলেন তিনি। স্বামী এসে দাঁড়ালেন স্ত্রীর মুখোমুখি এবং কঠিন সুরে প্রশ্ন করলেন—"তোমার ঐ আলমারীতে কেউ আছে?" মাদাম মেরেট তার দিকে শান্ত দৃষ্টি মেলে সরল সুরেই উত্তর দিলেন, "না, ভুল করছ তুমি।"

'না'—কথাটা যেন মঁশিয়ে মেরেটের বুকের মধ্যে গিয়ে ঘা মারল। না, বিশ্বাস করেন না তিনি! কিন্তু স্ত্রীকেও তো এমন শান্ত-সুন্দর, এমন পবিত্র দেখায়নি কোনোদিন! মঁশিয়ে মেরেট উঠে আলমারীটা খুলতে গেলেন।

মাদাম মেরেট এসে তাঁকে হাত ধরে থামিয়ে দিলেন এবং করুণভাবে মুখ তুলে অদ্ভুত এক আবেগের সংগে বললেন,—

"মনে রাখবে—কাউকে যদি না দেখতে পাও, তোমার আমার মাঝে এখানেই শেষ!"

স্ত্রীর এই মর্যাদাময় রূপ দেখে ভদ্রলোকের মনে বোধহয় শ্রদ্ধাই জেগে উঠল,—"না জোসেফাইন, খুলব না আমি, কারণ, তা হ'লে যে দিক থেকেই হ'ক আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে। শোনো, আমি জানি, বিশ্বাস করি—তুমি পবিত্র, সাধ্বী, প্রাণের বিনিময়েও পাপ করবে না তুমি! (মাদাম মেরেট স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন বিস্মিতের মতো!) শোনো, এই তোমার পবিত্র ক্রুশ, স্পর্শ করে শপথ করো—ওখানে কেউ নেই। আমি বিশ্বাস করব তোমার কথা, দোর খুলতে যাব না আর।"

মাদাম ক্রুশ স্পর্শ করে বললেন, "শপথ করছি আমি।"

স্বামী বললেন, "আবার বলো,—বলো, 'ভগবানের নামে শপথ করছি আমি,—ঐ আলমারীতে কোনো লোক নেই।' "

—মাদাম মেরেটও নির্বিকারে আউড়ে গেলেন।

"আচ্ছা বেশ।"—মঁশিয়ে মেরেটের স্বর কঠিন। কিছুকাল পরে বললেন—"বাঃ, চমৎকার ক্রুশ দেখছি একটা, একেবারেই নতুন দেখছি!" "হ্যাঁ, ওটা দিয়েছে তুভিদেয়ার, গত বছর স্পেনীয় বন্দীরা ভেন্দোমে এলে সে একজন স্পেনীয় বন্দীর কাছ থেকে কিনে রেখেছিল ওটা।"

"বেশ তো!" ক্রুশটা রেখে 'বেল' বাজালেন মঁশিয়ে মেরেট, এবং বাইরে এসে রোজেলিনকে চাপা গলায় বললেন:

"গয়েন ফ্লুটকে ভালোবাসো তুমি? তার সংগে বিয়ে দিয়ে দেব, আরো দেব টাকা। কিন্তু সবই গোপন রাখতে হবে। যাও, শিগগির যাও তাকে ডাকতে, তা না হলে—" ভ্রূকুটি করলেন তিনি।

এতক্ষণ দূর থেকে তিনি স্ত্রীর দিকে নজর রাখছিলেন, এবার কাছে এসে স্বাভাবিক ভাবেই সুরু করলেন আলাপ আলোচনা,—খেলায় হারবার কথা, নানা কথা।

গয়েন ফ্লুট এসে উপস্থিত। লোকটা রাজমিস্ত্রী। তাকে দেখেই তো মাদাম মেরেটের চক্ষুস্থির!

এদিকে কিছুদিন থেকেই নীচের ঘরটার গা-আলমারীটা বুজিয়ে দেবার কথা ছিল। এই নতুন পরিস্থিতিতেই মঁশিয়ে মেরেট কাজটা শেষ করবেন ঠিক করলেন। গয়েন ফ্লুটকে কাজে লাগালেন।

মাদাম ডাকলেন—"রোজেলি, আমার চুলটা একটু আঁচড়ে দাও।" স্বামী তীক্ষ্ণ নজর রেখে পাইচারি করছিলেন সেই ঘরেই। কিন্তু মিস্ত্রীর কাজে টুকটাক শব্দ হচ্ছিল এবং সেই সুযোগে মাদাম মেরেট

রোজেলিনকে বললেন,—"তোমাকে হাজার ফ্রাংক দেব, বুজিয়ে দেবার কালে একটুখানি ফাঁক রাখতে বলো, একটুখানি।"

গয়েন ফ্লট দোরটা বুঁজিয়ে দিচ্ছে। স্বামী স্ত্রী চুপচাপ। আধাআধি তৈরী হয়েছে দেয়াল। মঁশিয়ে যখন তার দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই ফাঁকে মিস্ত্রীও এক ঘায়ে আলমারীর গাঁথুনিতে একটু ফাঁক রেখে দিল। মাদাম মেরেট বুঝল, ইতিমধ্যেই রোজেলিন বলে দিয়েছে মিস্ত্রীকে। মঁশিয়ে মেরেট ছাড়া তিন জনেই এবার দেখতে পেল সেই বন্দী যুবকটিকে। স্বামী সেদিকে ফিরবার আগেই মাদাম মেরেট ইঙ্গিতে জানালেন—"আশা আছে।"

চারটে রাতে কাজ শেষ হয়ে গেল। মঁশিয়ে মেরেট তার স্ত্রীর ঘরেই ঘুমোবেন আজ।

পরদিন ভোরে জেগেই মঁশিয়ে মেরেট আলস্যভরে বললেন—"ও, তাই তো, আমার পাশপোর্টটা তো গিয়ে আনার কথা!"

টুপিটা প'রে দোরের কাছে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ক্রুশটা নিয়ে চললেন ডুভিদেয়ারের কাছে।

স্বামী বেরিয়ে যেতেই মাদাম মেরেট রোজেলিনকে ডাকলেন—"শিগগির, শিগগির এস, কুড়ুলি দিয়ে এক্ষুনি দেয়াল ভাঙব, আবার তৈরী করে রাখবে।"

রোজেলিন নিয়ে এল কুড়ুলি। মাদামের অবস্থা তখন হিংস্র এক উন্মাদের মতো, তিনি ঘায়ের ওপর ঘা মারতে লাগলেন দেয়ালে। কয়েকটা ইঁট খুলে গেল, আর একটা জোর ঘা লাগাবার জন্য মাথা তুলতেই,—ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে মঁশিয়ে দ্য মেরেট! এবং সংগে সংগেই মাদাম মেরেট অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

"মাদামকে শুইয়ে দাও বিছানায়।"—নির্মম কঠিন সেই স্বর। আগে

থেকে বুঝেই তিনি এই ফন্দী খাটিয়েছেন। ভিদেয়ারকে আগেই তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেও এসে হাজির হ'ল। মাদাম মেরেট তখন মোটামুটি সামলে উঠেছেন। মঁশিয়ে মেরেট তখন ভুভিদেয়ারকে জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, তুমি কি কোনো স্পেনীয়ের কাছ থেকে এই ক্রুশটা কিনেছিলে?"

"না, হুজুর!"

"চমৎকার!"—স্ত্রীর দিকে তাঁর দৃষ্টি ঠিক বাঘের মতো। বিশ্বস্ত চাকরকে বললেন—"জিন, আমার খাবারটা এই ঘরেই দিয়ে যাবে তুমি; মাদাম অসুস্থ,—এ ঘর ছেড়ে যেতে পারছি না।"

এই সাংঘাতিক লোকটি বিশটি দিনের মধ্যে একটি বারও স্ত্রীর ঘর ছেড়ে নড়লেন না। প্রথম কয়েকদিন আলমারীর ওখানে একটু শব্দ শুনতে পেলেই মাদাম মেরেট এগিয়ে যেতেন সেই অভাগা মুমূর্ষুর দিকে। কিন্তু প্রত্যেক বারেই স্বামী এসে পথ আগলে দাঁড়ান এবং বলেন,—"তুমিই তো পবিত্র ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করেছ, ওখানে কেউ নেই!"

—কাহিনীটা শুনে মেয়েরা গা ঘিষে বসল, কেউ কেউ শেষের দিকে আঁৎকে উঠল! আস্তে আস্তে যেন একটা ভয়াবহ যবনিকা সরে গেল সবার উপর দিয়ে!

ভিক্তর হুগো (১৮০২—১৮৮৫)

হুগো ফরাসী রোমান্টিক দলের লেখকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—গদ্যে এবং কবিতায়। কল্পনার ঐশ্বর্যে এঁর রচনা আশ্চর্যভাবে সমৃদ্ধ, উচ্ছাসময় ভাষায় গৌরবান্বিত এবং দরিদ্রের উপরে নিবিড় দরদে স্নিগ্ধ।

হুগোর বাবা ছিলেন সেনাপতি ; বাবামার অবিরত মনোমালিন্যের অস্থির আবহাওয়ায় এঁর শৈশব কাটে, তাই নিয়মিত শিক্ষা লাভ ঘটে নি। কিন্তু শৈশব থেকেই হুগো কবি-প্রতিভার পরিচয় দেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই সবজাতীয় কবিতা লেখেন এবং কবি হওয়াই জীবনের একমাত্র আদর্শ হয়ে ওঠে। বাইশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতার বই এবং চার মাসেই বিক্রী হয় পনের শ সংখ্যা। রাজসভা থেকে বৃত্তি লাভ করেন। তখনকার একমাত্র রোমান্টিক বিদ্রোহীকবি নাদিয়ের-এর প্রভাবে হুগোর কাব্য-জগতে আসে বিরাট পরিবর্ত্তন এবং তিনি পুরাতন পন্থী বা ক্লাসিকযুগ থেকে নেমে আসেন নতুন রোমান্টিক যুগে। কালক্রমে ইনিই হয়ে দাঁড়ান রোমান্টিক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী কবি। লেখকের 'ক্রমওয়েল' নামক গ্রন্থের বিখ্যাত প্রস্তাবনায় তিনি বলেছেন,—"শিল্প হ'ল বিবর্ত্তনশীল শক্তি ; পুরানোপন্থীদের হাতে তাই হয়ে পড়ে রক্ষণশীল অর্থাৎ ধ্বংসোন্মুখ।" "শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য নয়,—জীবন।" হুগো হয়ে ওঠেন যুগস্রষ্টা।

তাঁর মেয়ে আত্মহত্যা করার পরে হুগো কাব্যরাজ্য ছেড়ে নেমে আসেন রাজনীতি ক্ষেত্রে, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন না। "ইনসারেক্‌শন"-এর ইনি সভ্য ছিলেন এবং বিদ্রোহের সময় মজুরের বেশে চলে আসেন ব্রুসেলস্‌-এ। ১৮৭০
প্রতিষ্ঠা হলে হুগো আবার বিজয় গৌরবে ফিরে আসেন প্যারী। তারপরে আ
বয়সেও ইনি অবিরত কবিতা লিখতেন।

ঐতিহাসিক দিক থেকে পরবর্তী সমস্ত সাহিত্যিক দলের উপরেই হুগোর প্রভাব বর্তমান। "লা মিজারেবল্‌স" লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ক্লদ গুয়ে' ও 'জেনি' বিখ্যাত দুটি গল্প।

জেনি

—হুগো

এক

ছোট্ট একটি কুটির, জীর্ণ হ'লেও সুখশান্তিতে ভরা। গভীর রাত। উনুনে কয়লা জ্বলছে, ছাতের কালো কালো বর্গার গায়ে লেগেছে তারই লাল ছোপ। ঘরের আবছা আলোয় অস্পষ্ট দেখা যায় ঘরের সব জিনিষপত্তর। জেলের জালগুলি ঝুলানো রয়েছে দেয়ালে। এক কোণে একটা বিদ্‌ঘুটে শেলফে বাসনকোসনের শব্দ হচ্ছে টুং টাং। মস্ত বড় একটা বিছানায় মশারি টাঙানো, তার পাশেই কয়েকটা পুরানো বেঞ্চির উপরে মাদুর পাতা। আরামে জড়াজড়ি করে সেখানে ঘুমিয়ে আছে পাঁচটি ছেলেমেয়ে,—কুলায় পাখীর ছানার মতো। বড় বিছানার পাশে জানলায় মাথা রেখে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এদেরই মা। একা সে। বাইরে কালো সমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়ছে ক্ষুব্ধ ফেনিল গর্জনে, গোঙানি দিয়ে উঠছে, ক্রুদ্ধ প্রলাপ বকছে অবিরাম। তার স্বামী এই সমুদ্রেই।

ছেলেবেলা থেকেই জেলে সে; তার জীবনটাকে বলা যায় বিরাট জলরাশির সংগে দৈনন্দিন যুদ্ধ। প্রত্যেকদিনই যোগাড় করতে হবে খাবার,—ধরতে হবে মাছ। শীত গ্রীষ্ম ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে—কথনো কামাই নেই। সমুদ্রের বুকে নৌকোয় চারটি পাল খাটিয়ে সে খেটে যায় একেলা,—আর ওদিকে তার স্ত্রী কুটিরে রাত জেগে জেগে তালি লাগায় পুরানো পালে, রিপু করে জাল, তুলে রাখে বর্শিগুলি, সংগে সংগে নজর রাখে রান্নার দিকেও। শিশু পাঁচটি ঘুমুলেই সে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা

জানায় ভগবানের কাছে,—ঝড়জল আর অন্ধকারের মধ্যে তার স্বামী যেন জয়ী হয়ে ফিরে আসে। কঠিন এই জেলে-জীবন!

অনেক দূরে ছোট্ট একটি জায়গায় মাছ পড়ার কথা,—খুব ছোট্ট একটা জায়গায়।—দিশেহারা এই বিপুল জলরাশির বুকে অস্থির অস্পষ্ট একটি বিন্দু! অথচ শীতের অন্ধকারে দুর্যোগ রাতে একেই খুঁজে পেতে হবে, পালের জোরে আর জলের মর্জি বুঝে। চারদিকেই গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটে চলেছে ঢেউয়ের পর ঢেউ, দুলে দুলে চলেছে কম্পমান অন্ধকারে—মকরতমণিময় বিরাট সাপের মতো! টান-হওয়া পাল আর দড়ি গোঙানি দিয়ে উঠছে বারবার। এখানে এই তুহিন জলরাশির বুকে বসে ভাবে সে তার জেনির কথা; আর কুটির ঘরের জানলায় অশ্রুচোখ মেলে জেনি ভাবে তার স্বামীকে!

নানা কথা ভেবে ভেবে জানায় সে আকুল প্রার্থনা। সমুদ্রচিলের বিদ্রূপ-ভরা কর্কশ চীৎকারে সে ব্যথিত হয়ে ওঠে, তীর-শৈলের অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গাঘাতের গর্জনে কেঁপে ওঠে সমস্ত বুক! ঠিক তখনো তার মনের মধ্যে কত চিন্তাভাবনা—দারিদ্র্যের ক্লান্তক্লিষ্ট ভাবনা। শীতে গ্রীষ্মে কখনোই জুতো ওঠে না খোকাখুকুদের পায়ে, পাঁউরুটি তারা চোখেও দেখেনি জীবনে,—শুধু ময়দা আর ময়দা! হে ভগবান! হাওয়ায় হাওয়ায় ঐ যে শোসাচ্ছে হাপরটানার মতো ঝাপটা, সমুদ্রও প্রতিধ্বনি করে উঠছে হাতুড়ির হিংস্র আঘাতের মতো। কাঁপতে থাকে সে, কাঁপতে থাকে তার সমস্ত দেহ। হায়রে হতভাগীরা,—স্বামী যাদের দূর সমুদ্রে! "আমাদের বাবা মা ভাই বোন—সবাই রয়েছে ক্ষ্যাপা সাগরের মুখে!"—কথাটা শুনতেও কেমন ভয় হয়। জেনি, বেচারা জেনি! স্বামী তার একা, এই দুর্যোগ রাতে কেউ নেই তার পাশে! ছেলেরা এখনো খুবই ছোট! হায়রে হতভাগী মা! এখন সে বলছে—"ওরা

বড় হ'লে আজ স্বামীকে সাহায্য করতে পারত!" কী যে পাগলা কথা! তারপর, একদিন যখন সেই ছেলেরাই ঝড়ের সাগরে নামবে তাদের বাবার সংগে,—এই মা-ই আবার ছলছল চোখে বলতে থাকবে—

"আজো যদি ওরা সেই ছেলেমানুষটিই থাকত!"

দুই

একটা জামা গায়ে জড়িয়ে বাতি নিয়ে বেরোল জেনি। নিজের মনেই বলছিল সে,—"এখনি তো তার ফিরে আসবার সময়। তবু গিয়ে দেখি একবার, সমুদ্র শান্ত হয়েছে কিনা, মাস্তুলের চূড়ায় দেখা যায় কিনা জ্বলন্ত আলোর ইশারা?" বাইরে এল সে। কিছুই চোখে পড়ছে না, দিগন্তে দেখা যায় শুধু ঝলমলে একটি আলো-রেখা। বৃষ্টি হচ্ছিল,—মেঘলা রাতের আঁধারঘেরা হিমবর্ষা। কোনো ঘরের জানলায়ই নেই এক টুকরো আলো।

চারদিক খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা হুমড়ি-খাওয়া কুটির। আলো নেই, নেই আগুনের চিহ্ন! বাতাসে বাড়ি খাচ্ছে দোরের কবাট, পোকায় খাওয়া বেড়া চালের ভারে ভেঙে পড়ে পড়ে, পচা ছাউনি নড়ছে বারবার!

"এই গরীব বিধবাটির তো খোঁজ নেওয়া উচিত একবার। অসুখে পড়েছে সে, আমার স্বামী দেখে এসেছে সেদিন। আজ কেমন আছে খোঁজ নিতে হয়।"

দোরে ধাক্কা দিয়ে সে কাণ খাড়া করে থাকে! কোনো সাড়া শব্দ নেই। সমুদ্রের হিম হাওয়ায় কাঁপছে জেনির গা।

"অসুখেই পড়েছে। হায়রে, অভাগা শিশুদের কী হবে! দুটি শিশু! এরা কী গরীব, ঘরে কোনো পুরুষও নেই।"

আবারো শব্দ করে ডাকল সে—

"শুনছ, পড়শীদি?"

নিস্তব্ধ নীরব সব।

"ভগবান, কী ঘুমই ঘুমুচ্ছে! জাগানোই যে এক মহা সমস্যা।"

হঠাৎ নিজে নিজেই খুলে গেল দোরটা। ভেতরে এল সে। হাতের লণ্ঠনে আলো হয়ে উঠল ঘরের নিঃশব্দ অন্ধকার। ছাত দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে চালুনির মতো। ঘরের কোণে ভয়ানক কী যেন একটা! হ্যাঁ, গা ছড়িয়ে প'ড়ে আছে একটি মেয়েলোক। খালি পা, চোখ দৃষ্টি-হীন! ফ্যাকাশে দুটি হিম হাত ঝুলে পড়েছে বিছানার খড়ের উপর। মরে গেছে সে! একদিন সে ছিল সুখী মা, শরীরের বাঁধ ছিল অটুট। আজ জীবনযুদ্ধের শেষে পড়ে আছে শুধু তার করুণ কংকাল!

বিছানার কাছে দুটি শিশু,—একটি ছেলে, একটি মেয়ে! দোলনায় ঘুমিয়ে আছে তারা, স্বপ্নে হাসছে, খেলা করছে! আর সময় নেই বুঝে মা ওদের পায়ের উপরে বিছিয়ে দিয়েছে নিজের গায়ের জামাটা। ওরা যেন গরমে থাকে, নিজে তো সে হিম হয়ে এসেছে, মরণের মুখে এগিয়ে এসেছে।

জীর্ণ পুরানো দোলনায় ঘুমুচ্ছে ওরা, কী গভীর ঘুম। আলগোছে নিশ্বাস পড়ছে কেমন সুন্দর, কী শান্ত ছোট ছোট মুখ দুখানি! বাপ-মাহারা এই শিশু দুটির ঘুম কিছুতেই আর ভাঙবে না যেন! বাইরে নেমেছে প্রবল বর্ষা, সমুদ্রে আওয়াজ উঠছে সর্বনাশা ইঙ্গিতের মতো। ভাঙা ছাত দিয়ে বয়ে আসছে ঝাপ্‌টার পর ঝাপ্‌টা। সেই ফাঁক দিয়ে এক

ফোটা জল পড়ল মৃতা মার চোখের উপর, গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল এক ফোঁটা অশ্রুর মতো!

তিন

সেই ঘরের মধ্যে কী করছে জেনি? কোন ধন সে লুকিয়ে নিচ্ছে জামার নীচে! এমন করে কাঁপছে কেন তার বুক? এমন অস্থির পায়ে কেন সে ছুটে যাচ্ছে নিজের ঘরে, পেছনেও তাকাতে সাহস হচ্ছে না? মশারির আড়ালে নিজের বিছানার মধ্যে কী সে লুকিয়ে রাখল? কী চুরি করেছে?

ঘরে ফিরে এসেছে সে, পাহাড়ের চূড়ায় দেখা দিয়েছে আলো। ঘরে ঢুকেই সে বসে পড়ল বিছানার পাশে মোড়াটায়। মুখখানা ফ্যাকাশে, অনুশোচনায় পীড়িত যেন! বালিশের উপর ঝুঁকে পড়েছে মাথাটি, মাঝেমাঝে ভাঙা ভাঙা স্বরে আপনমনেই কী বলছিল সে। আর ওদিকে,—বাইরে গোঙানি দিয়ে উঠছে হিংস্র সমুদ্র।

"হতভাগ্য স্বামী আমার! হায় ভগবান,—কী বলবে সে এসে? আগেই পোয়াচ্ছি কত বিপদ। এ কি করলাম আমি? নিজের পাঁচটি সন্তানের দায়িত্ব রয়েছে ঘাড়ের উপর। এদের বাবার খাটুনির উপর খাটুনি! তার উপরে চাপিয়েছি নতুন দায়িত্ব! দুর্দশার ভরা যেন হালকাই ছিল এতদিন! কিন্তু আমার স্বামী কি সে রকম? না না, অন্যায় করেছি আমিই, নিশ্চয়ই সে এসে আমাকে বকবে, মারবে আমাকে। কিন্তু সে কি তাই? না, না। দোরটা নড়ে উঠছে, সে এল বুঝি? হায়রে, তার আসাতেও ভয় হচ্ছে আমার?"

গভীর ভাবনায় ডুবে রইল সে; শীতে কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ। বাইরে বিচিত্র আওয়াজ! চীৎকার করে ছুটে যাচ্ছে সমুদ্রচিল, তার সাথে সাথে সমুদ্রের গর্জন।

এবারে খুলে গেল দোরটা, ঘরের ভেতর ভোরের ফর্সা আলো। জেলে এসে দাঁড়িয়েছে দোরে, জাল দিয়ে জল ঝরছে টপটপ করে। খুশির হাসি হেসে ডাক দিল সে—

"এই যে ফিরে এল তোমার নেয়ে?"

"তুমি!"—জেনিও খুশি হ'য়ে ওঠে, নতুন প্রণয়িণীর মতো স্বামীকে জড়িয়ে ধরে মুখখানি লুকিয়ে রাখে স্বামীর চওড়া বুকে।

"হ্যাঁ বৌ, আমি।"—আলোতে স্পষ্ট ফুটে উঠে তার সুখ-তৃপ্ত মুখখানা। জেনির এতোদিনের প্রিয় মুখ!

"আজ হ'ল না কিছুই।"

"সাগরের অবস্থা ছিল কী রকম?"

"ভয়ানক।"

"মাছ?"

"তা, খাবার কথা ভেব না তুমি! তোমাকে তো আবার পেয়েছি আমার এই বুকে। এতেই খুশি আমি! আজ কিছুই পাইনি জেনি, জালটাই ছিঁড়েছি কেবল। বাতাসে ছিল আজ শয়তানের কারসাজি। ঝড়ের মুখে একবার ভাবলাম, এই বুঝি নৌকো উল্টাল, ছিঁড়ল দড়ি! তা,—তুমি করছিলে কি এতক্ষণ!"

অন্ধকারের মধ্যেও যেন শিউরে উঠছে জেনির দেহ! "আমি?"—বিব্রতের মতোই বলে সে—"কি আর করব? রোজকার মতোই …সেলাই করছিলাম। সাগরের গর্জন শুনছিলাম, আর যা ভয় হচ্ছিল!"

"হ্যাঁ, শীতকালটা ভালো নয়। তা, এখন আর ভেব না তুমি।"

এবারে অবস্থাটা এমন হ'ল, মারাত্মক একটা কিছুই যেন করতে যাচ্ছে সে। কাঁপতে কাঁপতে বলল সে—

"জানো, আমাদের পড়শীটি মরে গেছে। রাতেই মরেছে বোধ হয়, তোমার দেখে আসার পরেই, ছোট ছোট দুটি শিশু রেখে গেছে। ছেলেটি সবে পা বাড়াতে স্থুরু করেছে, মেয়েটি দুএকটা কথা বলতে পারে শুধু! হতভাগিনী মা কী দুর্দিনেই পড়েছিল যে!"

জেলেটির মুখ স্থির গম্ভীর!

টুপিটা এককোণে ছুড়ে ফেলে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল সে—

"হায় ভগবান, নিজেদেরই রয়েছে পাঁচটি, এবার হ'ল সাতটি! এই দুর্দিনে নিজেদেরই দুবেলা খাবার জোটে না। এখন উপায়? তা আমি তো কোনো অপরাধ করিনি। ভগবানই তো দেখছেন সব, করছেন সব। আমার মতো লোকের পক্ষে এমন সব দুর্বোধ ব্যাপার তলিয়ে দেখা ভার। এই শিশুদের কাছ থেকে কেন তিনি কেড়ে নিলেন তার মাকে? এসব ব্যাপার বুঝে ওঠা সত্যি খুব শক্ত। সবজান্তা পণ্ডিত হতে হবে, তবে তো! আহা, কী কচি শিশু দুটি! শোনো বৌ, ওদের গিয়ে নিয়ে এস এক্ষুণি। জেগে থাকলে মরা মাকে দেখে ভয় পেতে পারে। আমাদের ক'টির সংগেই বড় হবে তারা। আমাদের ক'টির কাছে হবে তারা নতুন দুটি ভাই বোন। ভগবান যখন ব্যবস্থা করেছেন এদের ভারও নিতে হবে,—তিনি নিজেই মাছ দেবেন বেশী ক'রে। আমার কথা? খালি জল খেতে পেলেও খুশি আমি, এবার দ্বিগুণ খাটব আমি, শিগগিরি নিয়ে এস ওদের। বাঃ রে, একি হ'ল তোমার? এজন্যে বিরক্ত হ'লে তুমি? আমার কথা শুনতে কোনোদিনও তো দ্বিধা করো না তুমি?"

জেনি মশারিটা তুলে ধরে বলল—

"ওই যে ওরা !"

ক্লদ গুয়ে

—হুগো

ক্লদ গুয়ে গরীব এক মজুর ; বছর আটেক আগে সে স্ত্রীপুত্র নিয়ে থাকত প্যারীতে। শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পায়নি, এমন কি পড়তেও পারে না। তবুও সে স্বভাবতঃই চতুর ও বুদ্ধিমান, সব বিষয়েই গভীরভাবে মাথা খাটাতে পারে।

সেবার শীত এল, সাথে সাথে এল দুঃখের সহচর—খাবার অভাব, কাজের অভাব, জ্বালানী কাঠের অভাব। ক্লদ গুয়ে, তার স্ত্রী ও ছেলে অন্নাভাবে মরবার মুখে এগিয়ে এল, জমে এল নিদারুণ শীতে। তাই সে চুরি করল। জানি না কি সে চুরি করেছে,—তা চুরিই যখন করতে হয়েছে কোন জিনিষ চুরি করেছে, জানার বিশেষ কি আর তাৎপর্য ? চুরির প্রসাদে তার স্ত্রীর ও ছেলের জুটল তিনদিনের খাবার, ক্লদ গুয়ের জুটল পুরো পাঁচ বছর জেল। ক্লেইরভোতে চালান হ'ল সে। সেখানকার গির্জাবাসটি হয়ে উঠেছে তখন জেলখানা, কোঠাগুলি হয়েছে অন্ধকূপ, আর বেদীপীঠ বধ্যভূমি ! এবং একেই বলে নাকি সংস্কার ও সংস্কৃতি !

ক্লদ গুয়ে খাঁটি লোক, খাঁটি মজুর। বিরুদ্ধ পরিবেশের চাপে পড়েই সে চোর হয়েছে। তার মুখের চেহারায় এমন বিশেষ কিছু আছে যা তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। উন্নত ললাট, তার উপরে চিন্তারেখা,

কালো চুলের মাঝে মাঝে ধূসর ছোপ, বসে-যাওয়া চোখ দুটি সহৃদতায় উজ্জ্বল! নিম্ন অঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে দৃঢ়তা ও সম্ভ্রান্ত সংযম। খুব কম কথা বলে সে এবং সেই কম কথা ক'টির মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে মর্যাদা-বোধ। সবার কাছ থেকেই সে যেন সম্মান ও সমীহভাব দাবী করে। বিশিষ্ট এক চরিত্র,—কিন্তু সমাজের হাতে পড়ে তাই কি রকম হয়ে দাঁড়াল তা বিশেষভাবেই লক্ষণীয়।

কয়েদখানায় ছিল এক ইন্‌স্‌পেক্টর বা জেলপরিদর্শক! কক্ষণো সে ভুলে যেত না যে সেই হচ্ছে জেলের হর্তাকর্তা! একহাতে কয়েদীদের দিত সে কাজকরার যন্ত্রপাতি আর হাতে শৃঙ্খল! একটি গুণ্ডা বা দস্যু-বিশেষ! যুক্তিবুদ্ধির বালাই নেই, একটি অপদার্থ জীববিশেষ! কতকগুলি জবরদস্ত ধারণা ছিল তার, এবং কোনো আবেদন নিবেদনের জোরে তা থেকে তাকে একচুলও নড়ান যেত না। শক্তিমানের চেয়ে বরং গোঁয়ার কথাটাই তার পক্ষে প্রযোজ্য! এই লোকটি সব সময়েই সবাইকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। নিজে সে সৎপিতা বা সৎস্বামী হ'তে পারে,—মানুষ হিসেবে সে যে খারাপ তা নিশ্চিত! ভালো কিছু আমলই পায় না তার কাছে। অস্থিমজ্জায় ক্রোধ পুষে বেঁচে আছে সে কাষ্ঠমূর্তির মতো। তার এপিঠ যেমন আগুনে পোড়া, ওপিঠ ঠাণ্ডা হিম! লোকটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যই হ'ল একগুঁয়েমি এবং এই একগুঁয়েমির জন্যে নিজেকে সে গর্বিত মনে করে। নিজেকে ভাবে সে স্বয়ং নেপোলিয়ান! একেই বলে দৃষ্টিবিভ্রম! বাতির একটা ফুলকিকেই নক্ষত্র মনে করা। কোনো বিষয়ে—সেটা যতই অন্যায় হ'ক না—একবার সংকল্প করলে তা সে করবেই করবে। সত্যিই, জীবনে তো এই রকমই ঘটে থাকে। যে কোনো দুর্ঘটনার পেছনে থাকে অক্ষমের অহংকার অথবা অক্ষমের জবরদস্তি।

জেল-কারখানার পরিদর্শকটিও ছিল এই জাতীয় জীব। সমাজ এই চকমকি পাথরটিকে ঠেলে তুলে বসিয়েছে সবার মাথার উপরে এবং সেও সেই উঁচুতে বসে চায় আরাম করে ফুলকি ছড়াতে। কিন্তু এই ফুলকিই তেমন ক্ষেত্রে পড়লে একটা অগ্নিকাণ্ড না হয়ে যায় না।

পরিদর্শকটির বিশেষ নজর ছিল ক্লদের উপর। গায়ে নম্বর এঁটে তাকে কারখানায় ঢুকানো হ'ল এবং লোকটি বুদ্ধিমান দেখে ব্যবহারটা সুরু করল সে ভালোভাবেই। একদিন ক্লদকে বিষণ্ণ দেখে (ক্লদ ভাবছিল তার স্ত্রীর কথা) একটু মজা করার জন্যেই সে তাকে অদ্ভুত সান্ত্বনার সুরে জানাল যে তার বৌ বিবাগী হয়ে গেছে অর্থাৎ ভ্রষ্টা হয়েছে, ছেলেটিরও পাত্তা নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই ক্লদ কয়েদখানার মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল এবং তার শান্ত আচরণের ও দৃঢ় সংকল্পের জোরে সহকর্মীদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। সবাই ক্লদকে সম্মান করত, তার কাছে এসে উপদেশ চাইত এবং সব বিষয়েই তাকে অনুকরণ করত! ক্লদের চোখের দিকে তাকালেই কিন্তু আসল মানুষটিকে চেনা যেত। চোখই তো আত্মার আরসী। এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি তো অল্পবুদ্ধিকে চালাবেই,—চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে আনে। তিনমাসের মধ্যে এই ক্লদই হয়ে দাঁড়াল কারখানার কর্তার মতো। মাঝে মাঝে তার নিজেরই সন্দেহ হ'ত, খেয়াল থাকত না,—সে কি জেলের কর্তা, না বন্দী! সে যেন পারিষদ পরিবৃত এক বন্দী নৃপতি!

কিন্তু এহেন জনপ্রিয়তাই ঘৃণা ডেকে আনে। বন্দীরা খুব ভালোবাসলেও জেলরক্ষীরা একে প্রসন্ন চোখে দেখত না। পুরো দুজনের খাবারেও ক্লদের পেট ভরে না,—জেলপরির্শকও তা নিয়ে বিদ্রূপ করে। তা তো করবেই,—নিজের ক্ষুধাটাও একজাতীয় কিনা! কিন্তু

ভরাপেটের কাছে যা আমোদ, খালি পেটের পক্ষে তাই নির্যাতন। নিজের রোজগারের টাকা দিয়ে আগে সে দু সের করে রুটি খেত; কিন্তু এখন বন্দী হয়ে রোজ হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও পায় শুধু একখানা রুটি ও দু চামচে মাংস। দিনরাত সে খালিপেটে ক্ষুধার জ্বালায় মরে।

খাবারটুকু এইমাত্র শেষ করে সে আবার খাটতে যাচ্ছিল,—কাজের মধ্যে ক্ষুধা ভুলে থাকা যায় যদি। এমন সময় একটি ক্ষীণদেহ যুবক তার খাবার থালাটা হাতে নিয়ে কাছে এগিয়ে এল,—কিন্তু স্পষ্টতই সে সাহস করে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিল।

"কি চাও?"—ক্লদ রুক্ষভাবেই জানতে চায়।

"অনুগ্রহ করে যদি একটা কথা শোনেন—" ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয় যুবকটি।

"কি?"

"আসুন, আমার খাবারটা দুজনে ভাগাভাগি করে নিই,—এতটা দরকার নেই আমার।"

ক্লদ যেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক পলক, কিন্তু বেশী ভণিতা না করে খাবারটা আধাআধি ভাগ করে নেয়।

যুবকটি বলল—"আপনার অনুমতি হ'লে রোজই আমার খাবারটা ভাগাভাগি করে নিতে পারি।"

"তোমার নাম?"

"আলবিন।"

"কি অপরাধে এখানে এসেছ?"

"চুরি করেছিলাম।"

"আমারই দলে!"

সেই থেকে প্রতিদিনই ছত্রিশ বছর বয়স্ক এই লোকটি ও বিশ বছরের এই ছেলেটি মিলে খাবার ভাগাভাগি করে খায়। তাদের সম্বন্ধটা ভাইভাইয়ের চেয়ে বরং পিতাপুত্রের মতোই। এক খাটুনিই খাটে দুজনে, শোয় একই কুঠুরীতে। সবকিছুতেই দুজনের মধ্যে একটা বাঁধন গড়ে উঠল। খুবই খুশি হ'ল তারা, এ ওর কাছে যেন সম্পূর্ণ এক জগতের মতোই। কয়েদখানার পরিদর্শকটিকে সবাই ঘৃণার চোখে দেখত, সবাই মিলে ক্লদ গুয়েকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনুরোধ করত। জেলে কোনো বিদ্রোহ হ'লে দশজন জেলকর্তার চেয়ে বরং ক্লদগুয়ের একটি কথায় কাজ হ'ত বেশী। জেলপরিদর্শক ক্লদ গুয়ের এই প্রতিপত্তি নিজের কাজে লাগালেও তাকে হিংসা করত, ঘৃণা করত। 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতির উৎকট উদাহরণ ছিল সে। উদাহরণটিও ভয়ানক যেহেতু তা গুপ্ত উদাহরণ। তবে আলবিনকে নিয়ে ক্লদ এতটা মগ্ন থাকত যে পরিদর্শকটির কথা সে খেয়ালেও আনত না।

একদিন জেলের কয়েদীরা তাদের নিজ নিজ কাজে চলছিল, আলবিনও ছিল ক্লদের সংগে। জেলপরিদর্শক হঠাৎ আলবিনকে ডেকে পাঠাল।

"কেন?"—জিজ্ঞেস করে ক্লদ।

"জানি না তো!"—বলতে বলতে চলে আলবিন।

সারাদিন ক্লদ বৃথা তার সংগীকে খুঁজে ফিরল কিন্তু রাতেও দেখা না পেয়ে তার স্বভাব-নীরবতা ভেঙে এক জেলরক্ষীকে জিজ্ঞেস করল—

"আলবিনের কি অসুখ করেছে?"

"না!"—জানাল লোকটা।

"সারাদিনেও তো তাকে একটিবার দেখতে পেলাম না।"

"অন্য ঘরে বদলি হয়েছে সে!"

চকিতে ক্লদ যেন কেঁপে ওঠে, তারপর ধীরে ধীরে বলতে সুরু করে—"কার আদেশে ?"

"মঁশিয়ে ছ্য—" এবং এটিই হ'ল জেলপরিদর্শকের নাম।

পরের দিন রাতে মঁশিয়ে ছ্য বরাবরের মতোই জেল ঘুরে যাচ্ছিল। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই ক্লদ দাঁড়িয়ে পড়ল, টুপিটা তুলল এবং গলার বোতামটা এঁটে নিল। বন্দীজীবনের ভদ্রতা এ্যাব।

জেলপরিদর্শক পাশ দিয়ে যেতেই সে বলল—"স্যর, আলবিনকে কি সত্যই অন্য জায়গায় বদলি করা হয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"—জেলপরিদর্শকের সংক্ষিপ্ত জবাব।

"দেখুন, তাকে ছাড়া আমি তো আর থাকতে পারছি না। আপনি জানেন, আমি যা খাবার পাই তা খুবই কম, তাই আলবিনেরটা দুজনে ভাগাভাগি করে নিই। ঠিক আগের মতো আমার পাশেই কি তার থাকবার ব্যবস্থা হতে পারে না ?"

"না, অসম্ভব, আদেশের নড়চড় হয় না।"

"এরকম আদেশ কার ?"

"আমার !"

ক্লদ বলতে থাকে,—"আপনার হাতেই আমার জীবনমরণ !"

"তা,—আদেশ কখনো বাতিল হতে পারে না।"

"স্যর, আমি কি আপনার কোনো অন্যায় করেছি ?"

"না, তা' নয়।"

"তা হ'লে,—" ক্লদ এবার জোরেই বলে—"তা হ'লে আলবিনকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন কেন ?"

"নিয়েছি বলেই !"—চলে যায় জেলপরিদর্শক !

ক্লদের মাথা নীচু হয়ে যায়,—খাঁচা থেকে সিংহের খাবার কেড়ে নিলে যেমনটা হয়। এত ব্যথার মধ্যেও সে কিন্তু তার ক্ষিদের কথাটা ভোলেনি, ক্ষিদেয় তার দশা হয়েছে তখন আধমরার মতো। অনেক বন্দীই সাগ্রহে তাকে খাবার ভাগ দিতে চাইল,—কিন্তু ক্লদ কিছুই স্পর্শ করল না। নীরবে সে তার দৈনিক কাজ শেষ করল। বারবার সে মঁশিয়ে দ্যকে ধরা-গলায় জিজ্ঞেস করছিল—"আলবিন?" ব্যথা আর ক্রোধে রুদ্ধ সেই স্বর,—মিনতি ও ভয় দেখানোর মিশ্র ভাষা।

কিন্তু মঁশিয়ে দ্য—শুধু ঘাড়টা কুঁচকে তুলে চলে গেল সোজা! তবে সে যদি ক্লদের মুখের দিকে তাকাত সেখানে দেখতে পেত বিরাট এক পরিবর্তন, শুনতে পেত ক্লদের সংহত ভাষা,—

"স্যর, আমার কথা শুনুন। আমার সংগীকে আমার কাছেই পাঠিয়ে দিন, তাই ভালো হবে আপনাকে বলে রাখছি! আমার এই কথা খেয়াল করে দেখবেন।"

সে জেলের উঠানে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একজন আসামী তার দিকে হাসিমুখে এগিয়ে এলে ক্লদ তাকে বলল—

"একটা লোকের বিচার করছি আমি।"

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৫শে আগষ্ট। মশিঁয়ে দ্য-র নিয়মিত জেল-পরিদর্শনের সময় ক্লদ তার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যেই সশব্দে একটা গ্লাস পথের উপর ভেঙ্গে ফেলল।

"আমি স্যর!"—ক্লদ ব'লে ওঠে,—"আমার বন্ধুকে ফিরিয়ে দিন আমার কাছে।"

"অসম্ভব!"—সেই এক উত্তর।

জেলপরিদর্শকের মুখোমুখি তাকিয়ে ক্লদ কঠিনভাবে জিজ্ঞেস করে—

"একবার ভেবে দেখুন এখনো। আজ ২৫শে আগষ্ট……৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিচ্ছি আপনাকে!"

একজন জেলরক্ষী মন্তব্য করল—

"ক্লদ কিন্তু মঁশিয়ে দ্য-কে ভয় দেখাচ্ছে। এখনি একে আটকে রাখা উচিত।"

"না, না, হাজতবাসে চলবে না এর!"—জেলপরিদর্শকের হাসি তাচ্ছিল্যভরে বাঁকিয়ে ওঠে। "এই ধরণের লোকদের একটু দেখেশুনে ভালোভাবেই সামলানো দরকার।"

পরের দিন। আঙিনায় বসে গম্ভীরভাবে ভাবছিল ক্লদ; পার্ণট নামে এক বন্দী তাকে এসে জিজ্ঞেস করল—

"তুমি কিন্তু সত্যিই খুব মুষড়ে পড়েছ, এত দুশ্চিন্তা করছ কেন?"

"মঁশিয়ে দ্য-কে সাংঘাতিক এক বিপদ শাসিয়ে ফিরছে!"—ক্লদ ধীরে ধীরে উত্তর দেয়।

আলবিনকে কাছে না পেয়ে সে যে কী ভয়ানক মর্মাহত হয়েছে সে কথা ক্লদ প্রতিদিনই মঁশিয়ে দ্য-কে বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে বলত; কিন্তু লাভের বেলায় হ'ল শুধু চব্বিশ ঘণ্টা হাজত ভোগ।

৪ঠা নভেম্বর। ক্লদ তার কুঠুরী হাতড়ে দুএকটা জিনিস পেল পুরানো জীবনের দুএকটি স্মৃতি। একজোড়া কাঁচি ও একটা বই।

প্রাচীন সেই গির্জাবাসের অর্থাৎ বর্তমান জেলখানার মধ্য দিয়ে হাঁটছিল সে। এখানকার দেওয়ালের নতুন চুনকাম যেন প্রাচীন পবিত্রতার উপরে নিদারুণ লাঞ্ছনা। মোটা মোটা লোহার বেড়াজালের মধ্য দিয়ে একান্ত আগ্রহে বাইরে চেয়ে ছিল বন্দীরা! ক্লদ তাদের বলল —"ঠিক এই কাঁচি জোড়ার জোরেই এই খাঁচা থেকে বেরিয়ে যাব আজ!"—হাতের কাঁচিটা দেখায় সে।

ফেরারীরা অবিশ্বাসের হাসি হাসে, ক্লদও যোগ দেয়। সারাদিন সে উৎসাহ ভরে কাজ করে গেল; একটি লোককে একটা টুপি বানিয়ে দেবে বলে সে অগ্রিম মজুরী নিয়েছিল,—কাজটা শেষ করতেই হবে।

দুপুরের মুখে এক অছিলায় সে নীচে নেমে এল মিস্ত্রীদের আস্তানায়; দারোয়ান ছিল তখন অনুপস্থিত। ক্লদকে দেখে সবাই খুশি হয়ে উঠল, সর্বত্রই সে ভালোবাসা পেয়ে থাকে!

"আমাকে কেউ একটা কুড়ুলি ধার দিতে পার?"—

"কি হবে?"

ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে কোনো রকম অনুরোধের ধার না ধেরে সোজা সে বলল,—

"আজ রাতেই খুন করব মঁশিয়ে ড্য-কে।"

সংগে সংগেই ক্লদের সামনে এনে হাজির করা হ'ল খানবিশেক কুড়ুলি। সবার ছোটটা সে জামার নীচে লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সাতাশ জন আসামী ছিল সেখানে, কিন্তু কেউই এর বিন্দু-বিসর্গ বেফাঁস করে দিল না,—এমন কি নিজেদের মধ্যেও এ প্রসঙ্গে কোনো রকম আলোচনা চালানো বন্ধ করে দিল। তারা শুধু প্রতীক্ষা করতে লাগল,—কী ভয়ংকর ব্যাপার ঘটবে!

বাইরে যেতেই ক্লদ দেখল, ষোল বছরের একটি ছেলে বসে বসে ঝিমোচ্ছে ও হাই তুলছে! ক্লদ তাকে অবসর সময়ে পড়াশুনো করতে উপদেশ দিল। ফেইলট নামে এক বন্দী এসে জানতে চাইল, কি সে লুকিয়ে নিচ্ছে।

ক্লদ খোলাখুলি বলে দিল—"মঁশিয়ে ড্য-কে আজ রাতে খুন করব; তাই একটা কুড়ুলি নিচ্ছি। তা, বাইরে থেকে কি দেখা যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, একটুখানি !"—বলে ফেইলট।

সাতটার সময় বন্দীরা সবাই এসে একত্র হয়,—বিভিন্ন কয়েদখানার বন্দী। ঠিক এই সময়ে জেলরক্ষীরাও অনুপস্থিত থাকে,—জেলপরিদর্শক ফিরে আসা পর্যন্ত।

ক্লদের কারখানায় সে এক আশ্চর্য দৃশ্য ! জেল-জীবনে তা একেবারেই অভাবনীয় ব্যাপার। ক্লদ দাঁড়িয়ে উঠে চৌরাশি জন বন্দী ভাইদের উদ্দেশ করে বলল,—

"তোমরা সবাই জানো, আলবিন ও আমি ছিলাম ঠিক দুটি ভাইয়ের মতো। আমাকে তার খাবার ভাগ করে দেবার জন্যে প্রথমে তাকে ভালো লাগে, তারপরে তাকে ভালো বাসতে সুরু করি। এখন আমার মজুরী সবটা খরচ করেও পেট ভরে খেতে পাইনে। আমরা দুজনে একত্র থাকলে মঁশিয়ে দ্য-র কিছুই ক্ষতি হয় না। নিরীহ মানুষকে অযথা কষ্ট দিয়েই মজা পায় সে, তাই আমাদের আলাদা করে রেখেছে ; আসলে লোকই সে খারাপ। বারবার আলবিনকে আমার কাছে পাঠাবার জন্যে তাকে অনুরোধ করেছি, কিন্তু সবই বৃথা ! ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত তাকে মেয়াদ দিলে,—উল্টো সে আমাকেই পুরেছে হাজতে। এবং এই অবসরে আমিই হয়েছি তার বিচারক এবং তার মৃত্যুদণ্ডের দিন ধার্য করেছি ৪ঠা নভেম্বর। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই এখানে আসছে সে এবং আমি তাকে খুন করব। কিন্তু এ বিষয়ে তোমাদের কিছু বলবার আছে ?"

চারদিকেই মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা। ক্লদ এবার তার চৌরাশি জন সংগীকে মনের কথা বুঝিয়ে বলতে লাগল—লোকটা সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে, তাই একান্ত বাধ্য হয়ে—নিতান্ত ঠেকেই তার চরম বিচারের ভার সে নিজের হাতে নিয়েছে। মঁশিয়ে দ্য-কে খুন করলে নিজের প্রাণও

বলি দিতে হবে, তা ঠিকই। কিন্তু কারণ যখন সৎ, তার ফলাফলের জন্যে সম্পূর্ণই প্রস্তুত সে। এই ছ'মাস ধরে অনেক চিন্তার পরে সে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছেচে। তবে তার সংগীরা কেউ যদি মনে করে যে ক্লদ প্রতিহিংসা বশেই এই কাজ করছে—তবে সে কথা তাকে খুলে বলা এবং হত্যাকাণ্ড বন্ধ রাখার যুক্তিগুলিও বুঝিয়ে বলা দরকার।

স্তব্ধতার মাঝে একজন বলে উঠল—"মঁশিয়ে দ্য-কে খুন করার আগে তাকে একবার শেষ বিবেচনার সুযোগ দেওয়া উচিত।"

"আচ্ছা বেশ!"—ক্লদ রাজি হয়,—"তাকে একটা সন্দেহের সুযোগও দেওয়া হবে।"

ক্লদ তার জিনিষ-পত্তরগুলি সংগীদের ভাগ করে দিল, নিজের কাছে রাখল শুধু এক জোড়া কাঁচি। একে একে সবাইকে সে আলিঙন করল, কেউ কেউ চোখের জল সামলে রাখতে পারল না। জীবনের শেষ ভাগে সে শান্তভাবে কথা বলতে লাগল,—এমন কি ছেলে বয়সে নাক দিয়ে ফুঁ দিয়ে কেমন করে বাতি নেভাত, হাসতে হাসতে তাও দেখাল! এক তরুণ বন্দী ক্লদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল, আগত দুর্ঘটনার কথা ভেবে শিউরে উঠল সে!

"ভয় পাচ্ছ কেন?"—ক্লদ ধীরে ধীরে বলে,—"এক পলকের ব্যাপার, —ব্যস্!"

কারখানাটা মস্ত বড়। দুপাশে দুটো দরজা, মাঝখানটা দিয়ে পথ। মঁশিয়ে দ্য—এই পথে যেতে যেতে দুপাশের কাজ দেখে। ক্লদ কিন্তু তখনো কাজ করে যাচ্ছিল। ধার্মিক লোকে যেমন মরণের মুখেও প্রার্থনা করতে ভোলে না।

ঘণ্টা বাজল,—ন'টা বাজতে পনের মিনিট। ক্লদ উঠে এসে প্রবেশ দ্বারের পাশে দাঁড়াল। ধীর স্থির সে! নিস্তব্ধতার মাঝে ঢং ঢং করে

বাজল একে একে ন'টা। খুলে গেল দোর, বরাবরের মতোই জেল পরিদর্শক একা হাসিমুখেই ঢুকল এসে। তাড়াতাড়ি যেতে যেতে সে কারো দিকে চেয়ে মাথা হেলিয়ে দিচ্ছিল, কারো দিকে চেয়ে অস্ফুটে কি বলছিল। ঠিক তখনি সে ক্লদের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

"এখানে কি হচ্ছে? নিজের জায়গায় নেই কেন?"—কথার ভঙ্গীতে এমন তাচ্ছিল্য, যেন কুকুর বেড়ালের সংগেই কথা হচ্ছে!

ক্লদ কিন্তু সসম্মানেই উত্তর দেয়, "স্যর, আপনার সংগে কথা বলতে চাই!"

"কোন বিষয়ে?

"আলবিনের কথা।"

"সেই এক কথা?"

"হ্যাঁ, সেই কথাই!"

"আচ্ছা আহম্মক তো?"—মঁশিয়ে দ্য যেতে যেতে জবাব দেয়—"বিশঘণ্টা হাজতবাসেও উপযুক্ত শিক্ষা হয়নি দেখছি!"

ক্লদ তার পিছু পিছু হেঁটে বলে—

"আমার সংগীকে ফিরিয়ে দিন।"

"অসম্ভব।"

"স্যর"—ক্লদের স্বর এমন করুণ যে পাপিষ্ঠের প্রাণও তা শুনে গলে যায়, পাষাণও টলে! "মিনতি করে বলছি, আলবিনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তা হ'লে দেখবেন, কত বেশী কাজ করতে পারব। আপনার একটু ইচ্ছে হ'লেই হতে পারে, সবই তো আপনার হাতে। অথচ তা করলে আপনার একটুও অসুবিধে হবার কথা নয়। একটি মাত্র বন্ধু যে কী,—আপনি তা বুঝবেন না। আলবিন আমার একমাত্র

বন্ধু, আমার সব। পাঁচিল-ঘেরা এই কারাগারের মধ্যে সেই আমার সর্বস্ব। আপনি তো যেমন খুশি চলাফেরা করতে পারেন, কিন্তু আমার আছে একমাত্র আলবিন। আপনাকে আবার অনুরোধ করছি—আলবিনকে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে। আপনি ভালো করেই জানেন, তার খাবারটা আমরা ভাগাভাগি করে নিই। আমি ও আলবিন আলাদা ঘরে থাকলে আপনার কী লাভ? তার চেয়ে আপনি একটু অনুমতি দিলেই তো সব ঠিক হয়। অনুগ্রহ করুন আমাকে, ভগবানের নাম করে আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করছি,—আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন।"

ক্লদ অভিভূতের মতোই উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

"অসম্ভব!—খিটখিটে সুরেই জবাব দিল জেল-পরিদর্শক,—"আমার কথার নড়চড় হওয়া অসম্ভব। যাও, চলে যাও এবার, আর বাজে বকো না। আচ্ছা জঞ্জাল!"—এই বলেই সে ভেতরের দিকে ঢুকছিল। চারদিকে চৌরাশি জন বন্দী চোরের অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য!

ক্লদ মঁশিয়ে ত্য-র পিছু পিছু হেঁটে এসে তার গা স্পর্শ করে ধীরে ধীরে বলল,—

"অন্ততঃপক্ষে এটুকু আমাকে জানতে দিন, কেন, কেন আমার সংগে এমন করছেন, কেন আমাকে আলাদা করে রাখছেন?

"আগেই তো বলা হয়েছে,—রাখছি আমার খুশি!"—এই বলে যেই দোর দিয়ে ঢুকতে যাবে, অমনি ক্লদও কুড়ুলিটা তুলল। সংগে সংগেই মঁশিয়ে ত্য ধরাশায়ী! কুড়ুলির বিদ্যুৎ চকিত তিনটা আঘাতে তার তালুদেশ দু'ফাঁক হ'ল, আর এক আঘাতে সমস্ত মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ক্রোধে উন্মাদের মতো ক্লদ আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল শুধু। মঁশিয়ে ত্য—কিন্তু অনেক আগেই ভবলীলা সাঙ্গ করেছে।

কুড়ুলিটা একপাশে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ক্লদ চেঁচিয়ে উঠল,—"এবার আর একটি বাকী।"

মানে, নিজে। কাঁচিটা নিয়ে সে নিজের বুকে বসিয়ে দিল। কাঁচির ফলাটা ছিল ছোট, কিন্তু ক্লদের বুকখানা ছিল বিশাল। বারবার বৃথাই সে শেষ ঘা হানতে চেষ্টা করছিল। শেষে রক্তাক্ত দেহে সে রাস্তার উপরে অচেতন হয়ে পড়ে গেল।

দুজনের মধ্যে আসামী কে ?

ক্লদের জ্ঞান হ'লে দেখল সে বিছানায় শুয়ে আছে। তার জন্যে সুন্দর সযত্ন ব্যবস্থা,—ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, পাশেই ধাত্রী। আহতের শেষ জবানী লিখে নেবার জন্যে একটি লোক বসে আছে, বিশেষ আগ্রহ ভরে সে জানতে চাইছে কেমন আছে ক্লদ। ক্লদের দেহ থেকে অজস্র রক্ত ঝরছে ; তবু কাঁচিটাই তাকে অসুবিধেয় ফেলেছে, কোনো ক্ষতই মারাত্মক হয়নি! মঁশিয়ে ড্য-র দশাই হয়েছে সবচেয়ে মারাত্মক! তদন্তকারী এবার সুরু করল,—

"তুমিই কি জেলখানার পরিদর্শককে খুন করেছ ?"

"হ্যাঁ!"

"কেন ?"

"করেছি বলেই।"

ক্লদের ঘা সাংঘাতিক হয়ে উঠল, জ্বরবিকারের ঘোরে সে মৃত্যুমুখে এগিয়ে এল। কেটে গেল নভেম্বর, ডিসেম্বর জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী— চিকিৎসায় ও সেবায়! ক্লদকে নিয়মিতই দেখে যাচ্ছে ডাক্তার, দেখে যাচ্ছে তদন্তকারী। ডাক্তার আসছে সারিয়ে তুলবার জন্যে, অন্যজন আসছে ফাঁসি কাঠে ঝুলাবার প্রমাণ জোগাড় করতে।

১৮৩২-এর ১৬ই মার্চ সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে ক্লদ এসে বিচারালয়ে হাজির

হ'ল,—তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তলব করা হবে। তাকে দেখে বিচারালয়ের সকলেই সচেতন হয়ে উঠল। ক্লদের মুখখানা ছিল কামানো, মাথা ছিল খালি,—গায়ে কয়েদীর বেশ! বিচার-গৃহ সামরিক রক্ষীদের দ্বারা বিশেষভাবে সুরক্ষিত ছিল, আসামীদের উপর ছিল তাদের কড়া নজর।

এদিকে ভয়ানক মুশকিল, সাক্ষ্য দেবে না কেউ। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হ'ল, ভয় দেখান হ'ল, কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হ'ল না, —বন্দীদের দিয়ে একটা কথাও আদায় করা গেল না।

শেষ পর্যন্ত ক্লদ নিজেই তাদের অনুরোধ করলে একে একে সমস্ত ঘটনা তারা বিশ্বস্তভাবে বর্ণনা করে গেল। কেউ ভুল করলে অথবা আসামীর উপরে অনুরক্তির জন্যে বর্ণনায় কোনো ত্রুটি হ'লে ক্লদ নিজেই শুধরে দিচ্ছিল। শুনতে শুনতে এক এক জায়গায় শ্রোতাদের চোখে জল আসছিল।

এবারে ডাক পড়ল আসামী আলবিনের। দুঃসহ শোকে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ক্লদের দুই বাহুর মধ্যে সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিচারকের দিকে চেয়ে ক্লদ বলল—

"এই একটি আসামী, একটি চোর; এ নিজের খাবার ভাগ করে দেয় ক্ষুধার্তকে!"—ক্লদ মাথা নত করে আলবিনের হাতখানি বুকে চেপে ধরল।

সমস্ত সাক্ষীর জবানী পরীক্ষা করা হ'লে শান্তি-পরিষদ বিচারালয়ের কাছে তাদের সিদ্ধান্ত নিবেদন করলেন,—

"মহামান্য জুরিগণ, এ হেন সাংঘাতিক আসামীকে যদি চরম শাস্তি না দেওয়া হয় তা হ'লে সমস্ত সমাজেরই সর্বনাশ হবে। এটি এ হেন আসামী যে—"

লম্বা এক বক্তৃতার পরে রুদের পক্ষ উঠে দাঁড়াল, চলল বাদপ্রতিবাদ,—ফৌজদারী মোকদ্দমায় যা হয়ে থাকে।

রুদও সাক্ষ্য দিল। তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। এই মজুরটির মধ্যেই জেগে আছে ঘাতকের চেয়ে বড় কেউ,—অপূর্ব এক বাগ্মী! মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তার ঘাতকরূপ নয়,—তার অপূর্ব বাগ্মীরূপ! সুন্দর করে স্পষ্টভাবে সে বুঝিয়ে বলতে লাগল, সংকল্পদীপ্ত পুরুষের মতো গর্বিত ভঙ্গীতে। তার বাকশক্তির গুণে সমস্ত বিচারালয় বারবার মুগ্ধ হয়ে পড়ছিল। এই নিরক্ষর লোকটির বিচারশক্তি কী নিগূঢ়, কী সূক্ষ্ম! শক্ত বিষয়গুলিও ঠিক ঠিক-ধ'রে বিচারকের সংগে তার মতানৈক্যের কথা সে বুঝিয়ে দিচ্ছিল অতি সহজে। রুদ চটে উঠেছিল একবার মাত্র,—শাস্তিপরিষদ যখন প্রকাশ করল যে জেল-পরিদর্শককে খুন করার পেছনে কোনোরকম উত্তেজনার কারণ ছিল না।

"কী,"—রুদ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল,—"উত্তেজনার কোনো কারণ ছিল না? আচ্ছা? একটা মাতাল যা দিল, আমি তাকে খুন করলাম—আপনাদের মতে এক্ষেত্রে উত্তেজনার কারণ আছে যথেষ্টই, তাই মৃত্যুদণ্ডের বদলে হবে জেল! কিন্তু এই লোকটি এই চার বছরের প্রত্যেকটির দিন আমাকে নির্মমভাবে আঘাত দিয়ে এসেছে, অপমান করেছে নিত্যনিয়ত, খোঁচা দিয়ে ফিরেছে, কথায় কথায় টিটকারী কেটেছে, যা খুশি অপমান করেছে। আর, আপনারা বলছেন উত্তেজনার কোনোই কারণ ছিল না! আমার স্ত্রীর জন্তে আমি চুরি করেছি, তাই সে আমাকে নির্যাতন করতে ছাড়েনি, আমার ছেলের মুখ চেয়ে আমি চুরি করেছি, তা নিয়েও সে আমাকে ঠাট্টা করেছে। ক্ষুধায় কাতর ছিলাম আমি, একবন্ধু আমাকে তার খাবার ভাগ

দিয়েছে, আর সেই বন্ধুকেই মঁশিয়ে দ্য ইচ্ছে করে সরিয়ে দিয়েছে। তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে কত অনুরোধ করেছি, আমাকে উল্টে সে পুরে দিয়েছে হাজতে! কী মর্মান্তিক দুঃখ পাচ্ছি তাকে বুঝিয়ে বলেছি, কিন্তু সে কথা শুনতে তার বিরক্তি লেগেছে। আমি আর কী করতে পারি বলুন, বাধ্য হয়ে তাকে খুন করেছি। অথচ, এহেন লোককে খুন করার জন্যে আপনারা আমার নাম দিয়েছেন দস্যু, নাম দিয়েছেন ডাকাত, মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করেছেন আমার জন্যে। বেশ, আপনাদের যা খুশি।"

কিন্তু উত্তেজনার এই জাতীয় কারণ আইন স্বীকার করতে রাজি নয়; কারণ, আঘাতগুলি তার দেহে তো প্রকাশ্য কোনো দাগ বা প্রমাণ রাখেনি।

জজসাহেব মোকদ্দমার রায় দিলেন সহজ সংক্ষিপ্ত ভাবে এবং অপক্ষপাত বিচারে! তিনি ক্লদের জীবনধারা পর্যালোচনা করে দেখলেন: ক্লদ প্রকাশ্যেই এক সন্দেহজনক চরিত্রের মেয়েলোক নিয়ে জীবন কাটায়, সে চোর এবং জীবনের শেষ অধ্যায়ে সে খুনী! সবই সত্য কথা। বিচারসভা শেষ হবার আগে জজসাহেব জানতে চাইলেন ক্লদের কিছু বলার আছে কি না।

"বিশেষ কিছুই না!" উত্তর দেয় ক্লদ, "আমি খুনী, আমি চোর। কিন্তু আপনাদের জিজ্ঞেস করছি কেন খুন করেছি আমি, কেনই বা চুরি করেছি?"

জুরিরা কিছুক্ষণ আড়ালে চলে গেলেন নিজেদের মধ্যে গোপন আলোচনার জন্যে এবং তারপর এসেই রায় দিলেন। বারো জন পরম স্বদেশহিতৈষী বিচারকের [জেণ্টল ম্যান অব জুরি!] মতে মৃত্যুদণ্ড হ'ল ক্লদ গুয়ের। গুয়ে নাম শুনেই জুরিরা বুঝে নিয়েছে সবকিছু!

কারণ, ওয়ে মানেই ভবঘুরে! এবং রায় দেবার পেছনেও রয়েছে এই চেতনার প্রভাব।

রায় শোনান হ'লে ক্লদ শুধু বলেছিল,—

"বুঝলাম! তবে মহামান্য বিচারকগণ, এখনো আমায় দুটি প্রশ্নের জবাব দেননি। আমি চুরি করলাম কেন, কি জন্যে আমাকে খুনী হতে হ'ল?"

সেদিন রাতে হঠাৎ সে বলে উঠল "ছত্রিশটা বছর এবারে খতম হয়ে গেল।"

নীরবে সে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো আবেদন নিবেদন জানাল না কারও কাছে। ধর্মপ্রাণা একটী ধাত্রী দশটা টাকা দিল ক্লদের হাতে।

বন্দী ভাইরা ক্লদকে খুব ভালবাসত, তারা সবরকমে ক্লদকে সাহায্য করতে চেষ্টা করল, কুঠুরীর উপর জানলা দিয়ে ভেতরে ছুড়ে দিল তার ও পেরেক! ইচ্ছে হ'লে, এর যে কোনোটার সাহায্যেই ক্লদ পালিয়ে যেতে পারত।

১৮৩২-এর ৪ঠা জুলাই। হত্যাকাণ্ডের সাতমাস চার দিন পরে বিচারালয়ের পেয়াদা এসে জানিয়ে গেল, তার জীবনের মেয়াদ আছে আর একটি দিনমাত্র, তার আপীল নামঞ্জুর হয়েছে।

ক্লদ উদাসভাবেই বলল—"তা বেশ। আপনাদের আশীর্বাদে কাল রাতে ভালোই ঘুম হয়েছে আমার এবং আসচে কাল নিশ্চয়ই আরো ভালো ঘুম হবে!"

প্রথমে এলেন ধর্মযাজক, পরেই জহ্লাদ। ক্লদ মাথা নত করে ধর্মযাজকের ধর্মবানী শুনল; আফশোষ করল, ধর্মশিক্ষার কোনো সুযোগই পায় নি সে। অতীত কৃতকর্মের জন্যে নিজেকেই সে ধিকার দিল; জহ্লাদের আচরণের মধ্যে সে যথেষ্ট নম্রতা লক্ষ্য করল। এক

কথায় সে আত্মসমর্পন করল : প্রাণ দিল ধর্মযাজকের হাতে, দেহ দিল জহ্লাদকে! ফাঁসি দেবার আগে ক্লদের চুল কেটে দেওয়া হ'ল। দর্শকদের মধ্যে কে যেন তখন শহরে কলেরার প্রাদুর্ভাবের কথা বলছিল,— যে কোনো মুহূর্তেই সর্বত্র সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা। ক্লদও তাদের কথাবার্তায় যোগ দিয়ে হাসিমুখে বলল,

"আমার কিন্তু এদিক থেকে ভারী সুবিধে, কলেরার ভয় নেই আমার!"

কাঁচির আধেকটা গেছে, বাকীটা সে আলবিনকে দিতে বলল। কাঁচির অন্যখণ্ডটি তার বুকের মধ্যেই বসে আছে। ক্লদ তার খাবারটা আলবিনকে দিতে বলল।

আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকী। সব লোকজন সরে গেছে দূরে। ক্লদ গুয়ে ধীরে ধীরে ফাঁসিমঞ্চে উঠে দাঁড়াল। মলিন দেহ নীরব নিস্পন্দ। চোখের দৃষ্টি ধর্মযাজকটির হাতের ক্রুশটির উপরে নিবদ্ধ! ক্রুশ, প্রভু যিশুর—সেই ত্রাণকর্তার দুঃখকষ্টের প্রতীক ক্রুশ! ধর্মযাজক ও জহ্লাদ এই দুজনকেই তার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হ'ল। একজনকে জানাতে ইচ্ছে করছিল আন্তরিক ধন্যবাদ আর একজনকে ক্ষমা। ফাঁসি হতে যাবার পূর্ব মুহূর্তে সে ধর্মযাজকের হাতে দশটা টাকা দিয়ে বলল—"গরীবদের জন্যে!"

আটটার ঘণ্টা বাজতে না বাজতেই এই উদারপ্রাণ বুদ্ধিমান লোকটির জীবনে নেমে এল মৃত্যুর কালো যবনিকা! দেহ থেকে খণ্ডিত হ'ল তার মাথা! বিশেষ এক জনসমাগমের দিনেই ফাঁসি দেওয়া ধার্য করা হয়েছিল,—সবাই যাতে দেখতে পায়। কারণ, এ রকম ফাঁসি দেওয়া তখন ফ্রান্সের যে কোনো ছোট-খাট শহরের পক্ষে গৌরবজনক ছিল। সেদিনের ফাঁসি দর্শকদের মনে এমন আগুন ধরিয়ে দিল যে তার ফলে

এক ট্যাক্স আদায় কারী তক্ষুনি খুন হচ্ছিল আর কি! প্রকাণ্ড হত্যাকাণ্ডের এহেন মহান প্রভাব!

ক্লদ গুয়ের এই জীবনেতিহাসের মূল উদ্দেশ্য একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করা। তার জীবনের দুটি মুখ্য প্রশ্ন সত্যিই চিন্তা করে দেখবার মতো: তার পতনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধ্যায়। লোকটা কি রকম ছিল এবং তার শাস্তিটাই বা হ'ল কি রকম? এই প্রশ্নটি সমস্ত সমাজকেই যেন আলোড়িত করে তোলে। লোকটি ছিল সত্যিকার গুণী, সত্যিকার ভালো মানুষ। তা হ'লে কী ছিল না তার? এখানেই দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক সমস্যা এবং তার সংগত সমাধান হ'লেই সমাজের ভিত্তি হবে সুদৃঢ় ও সুন্দর!

দারিদ্র্যের চাপে যে পরিবর্তন সুরু হয়েছিল একটি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে,—সমাজ পূরণ করে দিয়েছে তারই বাকী অংশটা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি এই মহানপ্রাণ লোকটি অসৎ সমাজের মধ্যে পড়ে চোর সাব্যস্ত হ'ল, অথচ সেই সমাজই তাকে চালান দিল কয়েদখানার কুৎসিত জীবনের মধ্যে! ফলে, সে হয়ে দাঁড়াল খুনী! সত্যিই কি আমরা তাকে দোষী বলে অভিযুক্ত করতে পারি? আসামী সে, না আমরা? এই প্রশ্নটি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করা দরকার,...তা না হ'লে এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও একপাশে ঠেলে রাখা হবে।

আমাদের সরকারী বিভাগ যদি এ বিষয়ে কোনো মনোযোগ না দেন তবে তাঁরা আছেনই বা কি জন্যে?

প্রসপার মেরেমে (১৮০৩—১৮৭০)

ছোটগল্পের রাজ্যে এত বড় আসন বাল্‌জাক ও হ্যুগোও পাননি। এঁকে বর্তমান ছোটগল্পের রচনা-ভঙ্গীর স্রষ্টা বলা চলে। ইনি ছিলেন নানা গুণে সমন্বিত মানুষ: একাধারে গভর্মেণ্ট অফিসার, ঐতিহাসিক, ভ্রমণকারী, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক! কিন্তু এঁর প্রধান কৃতিত্ব ছোটগল্পের রচনাশৈলী সৃষ্টি করায়। এঁর হাতেই আধুনিক ছোটগল্প সর্বপ্রথমে গীতিকবিতার বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করেছে। লেখকের বিখ্যাত গল্প নীলঘর, দুর্গদখল, তামাঙ্গো, ফ্যালকন...............

নীলঘর

—মেরেমে

রেলষ্টেশনের বাইরে একটি যুবক বিশেষ ত্রস্তভাবে পায়চারি করে ফিরছিল। চোখে নীল চশমা, সর্দি লাগার কোনো লক্ষণ না থাকলেও বারবার সে রুমালটা নাকের কাছে ধরে রাখছিল। বাঁ হাতে ছোট একটা ব্যাগ। পরে জানতে পেরেছি ওর মধ্যে ছিল সিল্কের একটা ড্রেসিং গাউন ও কয়েকটা তুর্কী ট্রাউজার।

মাঝে মাঝে সে ষ্টেশন গেট পর্যন্ত এগিয়ে এসে রাস্তার এদিক ওদিক নজর করে দেখছিল; তারপর ঘড়িটা বের করে দেখে নিয়ে 'টাইম টেবলটা' পড়তে লাগল। ট্রেণ আসার তখনও একঘণ্টা বাকী! তবে, অনেক লোক আছে সব সময়ই যাদের ট্রেণ ফেল করার ভয়। অথচ এটা কিন্তু ডেলি প্যাসেঞ্জার ট্রেণও নয় যে লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ট্রেণ এটা! চাকুরে বা ব্যবসায়ীরা দৈনন্দিন কাজ থেকে ছুটি পেয়ে ট্রেণে চেপে বাড়ী ছোটে, তাদের হাবভাব দেখেই যে কেউ ধরতে পারে···তারা হ'ল গাঁয়ের লোক বা শহরতলীর ছোট-খাট দোকানদার। কিন্তু এই ট্রেণটি সে জাতীয় লোকের জন্যে নয় মোটেই!

তবু ষ্টেশনে কেউ ঢুকলে বা ষ্টেশন গেটে কোনো গাড়ী এসে দাঁড়ালে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে যুবকটির বুক, কাঁপতে থাকে হাঁটু, ব্যাগটা হাত থেকে পড়ে যায় আর কি! চশমাটাও নাক থেকে উল্টে পড়ার দশা।

বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পরে একপাশের আড়াল-দোর দিয়ে ঢুকল একটি মেয়ে। পরণে কালো পোশাক, মুখের উপরে টানা পুরু একটা ওড়না, হাতে ব্রাউন রঙের একটা মরক্কো চামড়ার ব্যাগ। পরে আমি আবিষ্কার করেছি, ওর মধ্যে ছিল একটা ড্রেসিং গাউন ও একজোড়া নীল মখমলের স্যাণ্ডাল। প্রথমেই দুজনেই চমকে ওঠে, কিন্তু এ ওকে চিনতে পেরে কাছাকাছি এগোতে থাকে এদিক ওদিক চোখ রেখে। সামনাসামনি এসে এ ওর হাতে হাত দিয়ে কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, কম্পিত দেহে হাঁপাতে লাগল; অদ্ভুত এক অনুভূতি তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একযুগ মাথায় হাত দিয়ে ভাবলেও তা বর্ণনা করা অসম্ভব।

"লিয়ঁ,"...মেয়েটি বলছিল,···হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি মেয়েটি পরিপূর্ণা তরুণী এবং সত্যিই সুন্দরী! "লিয়ঁ, কী খুশির দিন আজ! তা, তোমাকে কিন্তু ঐ নীল চশমায় কিছুতেই চিনতে পারতাম না।"

লিয়ঁ জানায়···"সত্যি কী খুশির দিন আজ! তোমাকেও কিন্তু ঐ কালো ওড়নাতে চিনতে পারতাম না কিছুতেই!"

"বেশ মজা হ'ল কিন্তু! চলো এবার, শিগগিরই গিয়ে সিট দখল করে বসি। ট্রেণটা যদি আমাদের ফেলেই চলে যেত তা হ'লে··· (ছেলেটীর বাহুতে চাপ দেয় সে) আমাদের কথা কিন্তু কেউ জানে না! ঠিক আজই তো ক্লারা ও তার স্বামীর সঙ্গে তাদের পল্লী-ভবনে যাবার কথা ছিল এবং কাল সন্ধ্যায় সেখান থেকে বিদায় নিতাম, আর এখন?" ···মাথা নীচু করে সে বলে যায়, "সবই ভেবে রেখেছি আমি। চলো টিকেট কেটে নিই······কেউ আর আমাদের ধরতে পারবে না। তবে কেউ যদি নাম জানতে চায়···এর ভেতরেই ভুলে গেলাম যে···"

"মঁশিয়ে ও মাদাম দুরু!"

"না, দুরু না। স্কুলের একটা মুচি ছেলের ঐ নাম ছিল।"

"তবে দিউমণ্ট ?"

"হ্যাঁ, দিউমণ্ট।"

"তা বেশ, কিন্তু কেউ সন্দেহ করবে না তো ?"

ঘণ্টা বাজল, খুলে গেল ওয়েটিং রুমের দরজা। তরুণীটি আগের মতোই ভালো করে গা ঢেকে সঙ্গীকে নিয়ে চট্ করে ট্রেণের একটা কামরায় ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

"এবারে একা আমরা!" খুশিতে বলে ওঠে দুজনে। কিন্তু ঠিক তখনই এক ভদ্রলোক এসে সেই কামরায় ঢুকলেন এবং এক কোণে গিয়ে বসলেন। বয়স তাঁর বছর পঞ্চাশেক। পরণে কালো পোশাক, মুখখানা চ্যাপ্টা ও গম্ভীর। এবার গাড়ীর বাঁশী বেজে উঠল, চলতে লাগল ট্রেণ। তরুণ-তরুণী দুটি তাদের এই অপ্রীতিকর সঙ্গীটির কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে বসল ও চুপি চুপি কথা বলতে লাগল··· বিশেষ সাবধানতার জন্যে ইংরেজী ভাষায়।

"দেখুন,"—অন্য যাত্রীটিও ইংরেজীতে এবং তাদের চেয়ে আরও অনেক সুন্দর ইংরেজী উচ্চারণে বললেন—"আপনারা গোপন আলোচনা করতে চাইলে আমার কাছে বসেই ইংরেজীতে বলবেন না। আমি নিজেই ইংরেজ কিনা! আপনাদের অসুবিধে করার জন্যে দুঃখিত আমি। তবে অন্য কামরায় দেখলাম একটিমাত্র ভদ্রলোক, আমি আবার একটিমাত্র যাত্রীর সঙ্গে বেড়ানো পছন্দ করি না,—এটা আমার নিয়ম। তা ছাড়া ভদ্রলোককেও দেখাচ্ছিল ঠিক একটা গুণ্ডার মতোই এবং হয়ত বা সে এটার লোভেই!"—তাঁর ট্রেভেলিং ব্যাগটা দেখালেন তিনি, "ঘুমুতে না পারলে পড়ব বসে, কী আর করব।"

এবং সত্য সত্যই তিনি ঘুমের সাধনা শুরু করে দিলেন, ব্যাগ খুলে

একটা ট্রাভেলিং ক্যাপ মাথায় পরে কয়েক মিনিট চোখ বুজে রইলেন। হঠাৎ তিনি চমকে জেগে উঠে ব্যাগের মধ্যে প্রথমত খুঁজতে লাগলেন তাঁর নীল চশমাটা, তারপর একটা গ্রীক বই। এবারে গভীর মনোযোগে পড়তে লাগলেন। বইটা তুলতে গিয়ে ব্যাগের মধ্যে থেকে অনেক জিনিষ-পত্র উল্টে পাল্টে বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল এক তাড়া ইংলণ্ডীয় ব্যাংকনোট। ভদ্রলোক তার সামনের সিটে সেগুলি রাখলেন এবং ফিরে ব্যাগে পুরবার আগে যুবকটিকে দেখিয়ে জানতে চাইলেন—নোটগুলি সামনের শহরে ভাঙিয়ে নেওয়া যাবে কিনা।

"খুব সম্ভব"—লিয়ঁ বলে।

তরুণ তরুণী দুটিও এই শহরেই যাচ্ছে। সেখানে আছে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ছোট্ট হোটেল। সেখানে শহরাগত পথিকেরাই ওঠে এসে। হোটেলটা যেন সত্যিকার ভালোই,···বাইরের ভাবটা ঠিক তেমনি। তবে প্যারী থেকে ব্যবধানটাও খুব সুবিধেজনক নয়। লিয়ঁ অনেকবারই এসেছে এখানে,···তখন অবশ্য তার নীল চশমা ছিল না। লিয়ঁর কাছ থেকে বর্ণনা শুনে তার প্রণয়িনী ভেবে রেখেছে জায়গাটা বেশ ভালোই লাগবে।

তা ছাড়া, আজকের দিনে মেয়েটির প্রাণ উছলে পড়ছে অব্যক্ত খুশিতে. তাকে যদি লিয়ঁর সাথে একটা অন্ধ ঘরেও বন্ধ করে রাখা যেত তবুও তার ভালো লাগবার কথা।

ট্রেণ চলেছে। ইংরেজটি তার সঙ্গীদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পড়ে চলেছেন বইটা। এদিকে তরুণ তরুণী দুটি এমন চাপা সুরে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে যে একমাত্র প্রণয়ীজনের পক্ষেই সে ভাষা বোঝা সম্ভব। একটা খবর শুনে নিশ্চয়ই আপনারা চমকে উঠবেন না, এরা দু'জনেই

পলাতক প্রণয়ী! আরো বিশেষ অসুবিধের কথা, এরা বিবাহিত নয় এবং বিয়ের পথেও এদের অনেক বাধা!

গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছল তারা। প্রথমে নামলেন ইংরেজ ভদ্রলোকটি। লিয়ঁ তার প্রণয়িনীর হাত ধরে সাবধানে তাকে গাড়ী থেকে নামাল···ঠিক তখনি পাশের কামরা থেকে একটা লোক প্লাটফর্মে বেরিয়ে এল ঝড়ের মতো। শুষ্ক শীর্ণ তার মুখ, বসে গেছে লাল দুটো চোখ, দাড়ি পাক-খাওয়া···ঠিক যেন একটি খুনী আসামী! তার স্যুটটা পরিষ্কার হ'লেও জোড়াতালি লাগানো; পশমী কোটটা একদিন জমকালো ছিল, আজ পিঠ ও কলারের দিকটার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে; কোটটার গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা,...সম্ভবত নীচের ময়লা জামা ঢেকে রাখবার চেষ্টায়! ইংরেজটীর কাছে এগিয়ে সে খুব বিনীতভাবে বলল···

"কাকাবাবু"!

"একি বিপদ! যাও, সরে যাও!"—ইংরেজ ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ওঠেন, তার চোখ দুটো জ্বলে উঠে রাগে।

"আমাকে মেরে ফেলবেন না!"···লোকটার কণ্ঠস্বরে যুগপৎ মিনতি ও ভয় দেখানো ভাব।

লিয়ঁর কাছে ব্যাগটা রেখে ইংরেজটি তাকে বললেন— "আমার ব্যাগটা দেখবেন একটু?" তারপর সেই অদ্ভুত লোকটাকে বাহু ধরে একপাশে টেনে আনলেন। সেখান থেকে তাদের কথাবার্তা নিশ্চয়ই শুনতে পাওয়া যাবে না ভেবে—তিনি খুব কর্কশ কণ্ঠে কী যেন বলতে লাগলেন, তারপর পকেট থেকে কয়েকটা কাগজ তুলে লোকটার হাতে দিলেন। লোকটা ধন্যবাদ না জানিয়েই চলে গেল সোজা!

সমস্ত শহরে একটি মাত্র হোটেল। কাজেই, আশ্চর্য হবার নেই কিছুই, এই কাহিনীর প্রত্যেকটি লোকই ভিড়ল এসে একই জায়গায়। ফ্রান্সদেশে কোনো তরুণ যদি একটি ফিটফাট তরুণীর হাত ধরে এগিয়ে আসতে পায় তবে তার ভাগ্যেই জুটে যায় হোটেলের সব সেরা ঘরটি! শুধু এতেই কিন্তু বোঝা যায়, ইউরোপের ভেতরে সবচেয়ে ভদ্র ও মার্জিত হ'ল ফরাসীরাই!

লিয়ঁকে সবার সেরা ঘরটা দেওয়া হ'লেও চট্ করে বলে ফেলা হবে ঠিক না যে ঘরটা সত্যিই চমৎকার। মস্তবড় একটা কাঠের খাটিয়া, উপরে খাটানো নেটের মশারি, তার গায়ে বেগুনি রঙে ছাপা একটি গ্রীক রূপকথা। দেয়ালে দেয়ালে রঙীন কাগজে আঁকা নেপ্ল্স্-এর দৃশ্য, এবং আরও অনেক লোকের ছবি। দুঃখের বিষয়, অভদ্র এবং অবিবেচক লোকেরা মেয়েদের ছবিতেও এঁকে দিয়েছে গোঁফ ও পাইপ! এবং দৃশ্যটির জলে ও আকাশের দিকে পেন্সিলে লেখা রয়েছে যাচ্ছেতা সব মন্তব্য—কবিতায় ও গদ্যে! এই পটভূমিকার ঠিক উপরেই ঝুলানো কয়েকটা ছবি: লুই ফিলিপের ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ স্বীকার; সাধু প্রে ও জুলির সাক্ষাৎ; অনুশোচনা; সুখের আশা। এই ঘরটাকে বলা হয় নীলঘর। ডানে বাঁয়ে দুটো আরাম কেদারা, ডেনমার্ক দেশীয় নীল মখমলে ঢাকা। কিন্তু বহু বছর ধরেই এগুলি ময়লা ক্যানভাসে ঢাকা পড়ে রয়েছে।

হোটেলের পরিচারিকা তাদের দেখাশোনা করতে এল। লিয়ঁ প্রেমে পড়লেও সাধারণ বুদ্ধিটুকু খোয়ায়নি, তাই সে রান্নাঘরে গেল খাবার অর্ডার করতে। ভাল খাওয়ার জন্যে তাকে বক্তৃতা করতে হয়েছে—যৎকিঞ্চিৎ অগ্রিম বকশিশও যে না দিতে হয়েছে তাও নয়। তবে একটা কথা জেনে সে একেবারেই বিব্রত হয়ে পড়ল। নীলঘরের

পাশের মস্ত হলঘরটাতেই তৃতীয়-সংখ্যক অশ্বারোহী-বিভাগ তৃতীয়-সংখ্যক পদাতিক-বাহিনীকে বিদায় অভিনন্দন জানাবার আয়োজন করছিল।

হোটেলওয়ালা অবশ্যি ভগবানের নামে শপথ করে বলল, সমস্ত ফরাসী সৈন্যেরাই একটু আমুদে ও মিশুক, তা ছাড়া এই অফিসার দলটি তাদের ভালো আচরণের জন্যে সমস্ত শহরেই সুনাম অর্জন করেছে। তারা এখানে থাকার জন্যে অতিথিদের কণামাত্রও অসুবিধে হবে না,—মাঝরাতের আগেই খেয়ে দেয়ে নাক ডেকে ঘুমানোই তাদের অভ্যাস।

ভাবতে ভাবতে তারা নীলঘরে এসে দেখে পাশের ঘরেই এসে উঠেছেন সেই ইংরেজটি! দোরটা খোলা, টেবিলের উপরে বোতল আর গ্লাস। তার সামনে বসে গভীর মনোযোগে তিনি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন,—যেন দেয়ালের উপরকার মাছিগুলিই গুণছেন বসে বসে।

"কে আছেন পাশের ঘরে, তাতে আমার কি?"—লিয়ঁ ভাবে—"একটু পরেই তো ইংরেজ সাহেব মদে বুঁদ হয়ে থাকবেন,—ওদিকে সৈন্যেরাও চলে যাচ্ছে মাঝরাতের আগেই!"

নীলঘরে ঢুকেই তার প্রথম কাজ হ'ল—দুই ঘরের মাঝের দোরটা ভালো করে তালাবন্ধ আছে কিনা তাই দেখা। ইংরেজটির ঘরের দিকে দুটো দরজা এবং দেয়ালটাও বেশ মোটা। সৈন্যদের দিকের দেয়ালটা খুবই সরু বটে, তবে তালা আঁটা। হ্যাঁ, ঘোড়ার গাড়ীতে থাকার চাইতে ঢের বেশী গোপন ও নিরাপদ তো! ঘোড়ার গাড়ীতেও তো অনেক লোকে নিজেদের মনে করে নিরালা ও নিরাপদ।

তরুণ যুগলের এই সুখের চেয়ে সুন্দর কোনো ছবি কল্পনায়ও আঁকা যায় না। এতোদিনের অধীর প্রতীক্ষার পরে দুটিতে এসে এক হয়েছে এই নিরালায়। উৎসুক ও ঈর্ষাতীক্ষ্ণ লক্ষ লক্ষ লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে এসে আজ তারা প্রাণ খুলে বলতে পারবে বিগত দিনের সুখদুঃখের কথা,—প্রাণ ভরে তুলবে পরিপূর্ণ মিলনের নিবিড়তম আনন্দে।

কিন্তু দুষ্ট গ্রহ পেছনে লাগলে ভরা সুখের নৌকাও ঠেলে ফেলে বিপাকে! নীলঘরে তাদের চলনসই খাবার পরিবেশন করা হ'ল;—সে খাবারও কিন্তু গলিয়ে আনা হয়েছে সৈন্যদের ভোজ থেকে! লিয়ঁ ও তার প্রণয়িনী খেতে খেতে তাদের পাশের ঘরের লোকদের কথাবার্তা শুনে বড় অস্বস্তি বোধ করছিল। যুদ্ধনীতি বা যুদ্ধ-কৌশলের কথা তারা মোটেই আলোচনা করছিল না,—যা করছিল তা ভদ্রভাষায় বর্ণনা করা চলে না।

যত অশ্লীল গল্প আর অট্টহাসি। অথচ বসে বসে তাই শোনা ছাড়া উপায় কি আর! লিয়ঁর প্রণয়িনী যে খুব গম্ভীর ও নীতিবাগীশ মেয়ে তা নয়,—তবে এমন অনেক গোপন বিষয় আছে মেয়েরা যা তাদের প্রণয়ীকে নিয়েও একসাথে শুনতে চায় না। ক্রমেই অবস্থাটা বড় অসুবিধেজনক হয়ে উঠল, এর পরেই সুরু হ'ল অফিসারদের ঐক্যতান! লিয়ঁ হোটেলওয়ালাকে তার অনুরোধ জানাতে বেরিয়ে গেল,—সৈনিক অফিসারদের তিনি একটু বুঝিয়ে বলবেন যে তাদের পাশের ঘরেই রয়েছেন একটি রোগিণী, কাজেই আর একটু কম গণ্ডগোল হ'লেই ভালো হয়।

হোটেলওয়ালা একেবারেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠল,—সৈন্যবিভাগের ভোজে তো বরাবরই এমনটা হয়ে থাকে! সে কী যে বলবে বুঝে

উঠল না। তা ছাড়া, তক্ষুনি আবার একটা চাকর এল অফিসারদের জন্যে শ্যাম্পেন চাইতে। একটি পরিচারিকাও এল,—"ইংরেজ ভদ্রলোকটির জন্যে এক বোতল পোর্ট চাই।"

"আমাদের এখানে পোর্ট নেই বলেছি তাঁকে।"—মেয়েটি যোগ করে দেয়।

"আচ্ছা বোকা তুমি! সব রকমই আছে এখানে। বেশ, এখুনি পোর্ট পাঠাচ্ছি তাঁকে। এই, শিগগিরি নিয়ে এস এক বোতল রাটা-ফিয়ার, এক বোতল পনের নম্বর, আর ব্রাণ্ডি।"

হাতের এক ঘুরানির চোটেই তৈরী হ'য়ে গেল পোর্ট; তাই নিয়ে খাবার হলঘরে ঢুকে অফিসারদের কাছে নিবেদন করল লিয়ঁর অনুরোধ।

শুনেই তো তারা রেগে আগুন! সবার উপরে চাড়া দিয়ে উঠল একটি মোটা গলার খেঁকানি—

"পাশের ঘরে সে কী ধরণের মেয়েলোক?"

"না, না, দেখুন,"—ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে হোটেল-কর্তা—"সুন্দরী সে এবং খুবই লাজুক! তার আঙুলে রয়েছে বিয়ের আংটী! কাজেই, হয়ত সে কোনো "নতুন বৌ!"

সমস্বরে বলে ওঠে অফিসারদল—"তা হ'লে তো এক সংগে খাওয়া দাওয়া করতে হচ্ছে। তাঁকে শুভেচ্ছা জানান দরকার এবং তাঁর স্বামীকেও শেখানো দরকার নতুন সব কর্তব্য!"

এই কথা শেষ হ'তে না হ'তেই সুরু হ'য়ে গেল অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা। নীলঘরে কাঁপতে লাগল দুটিতে,—এক্ষুণি বুঝি সব ভেঙে চুরে তাদের ঘরে ঢুকে পড়বে সবাই। কিন্তু হঠাৎ কে যেন এক ধমকেই থামিয়ে দিলেন সবাইকে। স্পষ্টতই দলপতি তিনি। অফিসারদের অভদ্রতার

জন্য ভৎর্সনা ক'রে তিনি সবাইকে বসতে বললেন ও গলা না চেঁচিয়ে ধীরে ধীরে ভদ্রভাবে কথা বলতে লাগলেন। তারপরে তিনি এত চাপা গলায় কথা বলতে সুরু করলেন যে নীলঘর থেকে আর শোনাই যাচ্ছিল না। তরুণ-যুগলকে অভ্যর্থনা করা হ'ল বেশ সম্ভ্রমভরে—এবং সংযত আনন্দে।

এরপর থেকে অফিসারদের ঘর অনেকটা চুপচাপ! দুজনেই তাঁদের নিয়মানুবর্তিতার প্রশংসা ক'রে অনেকটা সহজভাবে আবার কথা বলতে সুরু করল। কিন্তু এত সব হৈ-চৈ, পথের ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার ফলে আগের আলাপের সেই জমানো সুরু কেটে গেল এবং সেই সুর আবারও জমে উঠতে কিছুটা সময় লাগল। কিন্তু বয়সের গুণে শিগগিরি তারা সমস্ত ক্লান্তি ও অপ্রীতির কথা আবার ভুলে গেল, ডুবে রইল নিবিড় সুখের রঙীন কল্পনায়·········

······শেষ পর্যন্ত অফিসারেরা হলঘর থেকে বেরিয়ে এল, নীলঘরের সামনেটা বাজিয়ে তুলল অস্ত্র ও বুটের সঘন ঐক্যতানে। তারা একে একে ডেকে বলে যাচ্ছিল—"শুভরাত্রি, নতুন বৌ!"

তারপর সব নিঝুম নীরব। না, একটু ভুল বললাম। ইংরেজটি বারান্দায় এসে ডেকে বলছিলেন—"বয়, সেই পোর্টের আর এক বোতল আনো তো!"

ছোট্ট হোটেলটিতে এবার অখণ্ড স্তব্ধতা। সুন্দর মধুরাত, আকাশে পূর্ণ চাঁদ। সেই অনাদি কাল থেকে প্রেমিকেরা নয়ন ভরে দেখছে এই চাঁদ। লিয় ও তার প্রণয়িনী জানালা খুলে দিল। সামনেই ছোট্ট একটি বাগান, দুজনেই প্রাণভরে টেনে নিল সুরভি হাওয়ার নিশ্বাস। বেশীক্ষণ তারা জানালায় দাঁড়াল না। মাথা নীচু করে কে যেন পায়চারি করছে বাগানে। তার মুখে একটা সিগ্রেট, হাত

দুখানা বুকের উপর ভাঁজ করা। লিয়ঁর মনে হ'ল পোর্ট—প্রিয় ইংরেজটির সেই ভাইপো-টী!

দেখুন, বর্ণনা বাহুল্য পছন্দ করি না আমি, তা ছাড়া প্রতিটি ঘণ্টায় হোটেলে কি কি ঘটল তার ফর্দ দিতেও বাধ্য নই। আমি শুধু এটুকুই বলব—নীলঘরের মোমবাতি জ্বলে জ্বলে আধাআধি ফুরিয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ ইংরেজটির ঘরে ভয়ানক একটা শব্দ হ'ল! কেউ যেন পড়ে গেল মেঝের উপর! নিস্তব্ধ হোটেলে সে এক অদ্ভুত শব্দ, আর সংগে সংগেই ঝন ঝন আওয়াজ, তারপরেই কেমন একটা চাপা কান্না এবং গালিগালাজের মতো কথা, অস্পষ্ট কয়েকটা কথা! নীলঘরে দুটিতে তো ভয়ে আধমরা। শব্দ শুনেই তারা চমকে উঠে বসেছে। দুজনকেই ঠেসে ধরেছে একটা প্রবল আতংক। "আমাদের ইংরেজ সাহেব স্বপ্নে প্রলাপ বকছেন!"—লিয়ঁ হাসতে চেষ্টা করে; সে তার সংগীকে ভরসা জোগাতে চায়, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই কেঁপে ওঠে সহসা। একটু পরেই বারান্দার একটা দোর আলগোছে খুলে গেল, লিয়ঁর নিশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে এল! কে যেন হাঁটছে ধীরে ধীরে, কেমন আশংকা ভরে,—চুপি চুপি যেন সরে যাচ্ছে কেউ।

"ওঃ, কী ভয়ানক জায়গা!"—লিয়ঁ বলে ওঠে। "আঃ! কী সুন্দর জায়গা! আমার স্বর্গ!······বলতে বলতে মেয়েটি তার মাথাটা এলিয়ে দেয় লিঁয়র কাঁধের উপর—"এত ঘুম পেয়েছে আমার······"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমনি সে ঘুমিয়ে পড়ল আবার। কিন্তু লিয়ঁর অবস্থা তখন ভয়ানক। তার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরছে নানা কথা, অন্য অবস্থা হ'লে হয়ত সে কোনো কথা আমলেই আনত না। ইংরেজটির ভাইপোকে মনে পড়ল। সে যখন বিনয়বশে টাকা

চাইছিল তখন তার চোখে যেন ঝিলিক মেরে উঠেছিল নির্মম ঘৃণা। অমন এক সাংঘাতিক যুবকের পক্ষে জানালা বেয়ে পাশের ঘরে উঠে আসা মোটেই অসম্ভব নয়।……ওদিকে সে বাগানেই পায়চারি করছিল, সেই থেকেই তো ভদ্রলোক তার ঘরে বসে আছেন শুধু! হয়ত…এবং খুব সম্ভবত…না, একেবারেই নিঃসন্দেহ…তার কাকার ব্যাগে যে মোটা এক তাড়া নোট আছে নিশ্চয়ই জানে সে।… ঘরের সেই শব্দটা, ঠিক যেন টাক মাথার উপরে ভয়ানক এক ঘুষি! …তারপরেই চাপা চীৎকার…জঘন্য গালিগালাজ…তারপরেই পলাতক পায়ের চাপা শব্দ! ভাইপোটিও দেখতে ঠিক একটি খুনীর মতোই! কিন্তু এত সব অফিসার ভর্তি হোটেল ঘর তো কাউকে খুন করার পক্ষে সুবিধের জায়গা নয়। এবং এই ইংরেজটিও তো বিবেচকের মতো নিজের ঘরটায় আগেভাগেই তালা লাগিয়ে নিয়েছেন,—কি ধরণের লোক আশেপাশে ঘুরে ফিরছে নিশ্চয়ই জানেন তিনি। ইংরেজটি নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ করেন, তাই তো ষ্টেশনে ব্যাগটি হাতে নিয়ে তার কাছে এগোন নি…কিন্তু এত সব দুর্ভাবনাই বা ভাবছি কেন খালি, বেশ সুখেই তো আছি এখানে! লিয়ঁ নিজেকেই বোঝাচ্ছিল এসব। কতরকম এলোমেলো ভাবনা ভিড় করে এল স্বপ্নের ছায়ামূর্তির মতো! ভাবতে ভাবতে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল —নীলঘর ও ইংরেজটির ঘরের সংযোগ-দোরের দিকে।

ফ্রান্সে ঘরের দরজা ভালো ক'রে বন্ধ করা যায় না। তাদের কোঠার দরজা ও মেঝের মাঝেও ফাঁক ছিল ইঞ্চিখানেক। সে জায়গাটা স্বচ্ছ মেঝের প্রতিফলনে একটুখানি আলো হ'য়ে ছিল; হঠাৎ সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল কালো কালো কী যেন, তার একটা কিনারা আলোতে ঝলসে উঠছে,—ঠিক যেন একটা ছুরির

ফলা। সেটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল দোরের পাশের নীল স্যাণ্ডালটার কাছে। ওটা কি কোনো পোকা, না সাপ!...না, পোকা নয়, দেখতে পোকার মতো নয়।...দু তিনটে লেজ, তাদের কিনারাগুলি খুব ঝলমলে, সেগুলি এসে ঢুকছে নীলঘরের মধ্যে, ঢালু মেঝেতে এগিয়ে আসছে তাড়াতাড়ি। না, কোনোই সন্দেহ নেই আর...তরল একটা কিছু মেঝের আলোয় স্পষ্টই এবার দেখা যাচ্ছে,—রক্ত, এ যে রক্ত!

লিঁয় তো ভয়ে আধমরা, চোখ তার কপালে উঠে গেছে, আর মেয়েটী এদিকে শান্ত ভাবে ঘুমুচ্ছে, ছন্দের দোলার মতো তার আতপ্ত নিশ্বাস এসে লাগছে ভীত যুবকটির চোখে মুখে।

লিঁয় যে হোটেলে উঠেই খাবার অর্ডার করছে শুধু এতেই কিন্তু বোঝা যায় যে ঘাড়ের উপরে মাথাটি তার ঠিকই বসানো আছে এবং সেই মাথাটি সে ভবিষ্যতের দিকে খাটাতেও পারে। কিন্তু নিজের উপর সে যেন আর আস্থা রাখতে পারছিল না। পাষাণ মূর্তির মতো নিস্পন্দ হয়ে সে মনের সমস্ত শক্তি সংহত করে এনে নির্দিষ্ট একটা সমাধানে আসতে চেষ্টা করছিল,—উপস্থিত এই ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে রেহাই পেতে হবে।

বোধহয় আমার পাঠকেরা—বিশেষ করে পাঠিকারা বীরত্ব ভরে লিঁয়কে ভৎর্সনা করবেন তার দুর্বলতা ও সৎসাহসের অভাবের জন্যে। তাঁদের মতে ইংরেজটির ঘরে গিয়ে খুনীর হাতে তক্ষুণি হাতকড়া লাগানো উচিত ছিল, অন্ততপক্ষে ঘণ্টা বাজিয়ে হোটেলের সবাইকে জাগিয়ে তোলা উচিত ছিল। এসব কথার উত্তরে আমি বলব—প্রথমত ফরাসী হোটেলে ঘণ্টা রাখা হয় আবরণ স্বরূপেই, ঘণ্টাগুলি অকেজো, ঘড়িতে টান দিলেও ঘণ্টা বাজে না। সম্ভ্রম ভরে এবং

বিশেষ জোর দিয়ে আমি এটুকুও বলব যে একজন ইংরেজকে পাশের ঘরে বসে মরতে দেওয়া যদি অন্যায় হয় তবে সেই বৃদ্ধ বিদেশীর খাতিরে পরমা সুন্দরী এক তরুণীকে অগ্রাহ্য করা—সেটাও তো বিশেষ একটা প্রশংসার কাজ নয়,—বিশেষ ক'রে সে যখন আদরে মাথা এলিয়ে দিয়েছে প্রণয়ীর কাঁধের উপরেই। এবং লিয়ঁ যদি চীৎকারের চোটে সারা হোটেল জাগিয়েও তুলত তবুও লাভ হ'ত কী? পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট দারোগাবাহিনীর আবির্ভাব। এই সব লোক আবার এমন জাতের যে লিয়ঁর কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনবার আগেই তারা লিয়ঁকে নিয়েই জেরা লাগিয়ে দিত,—

"আপনার নাম? আপনার পাশপোর্ট? আপনার সংগের মহিলাটি কে? এখানে এই নীলঘরেই বা এসেছেন কেন? আপনাদের দুজনকেই কোর্টে গিয়ে বলতে হবে কোন তারিখে, রাত ক'টায়, কি কি দেখেছেন—সব।"

এখন লিয়ঁর মনেও প্রথমে জেগে উঠেছে এই ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের কথা, কিন্তু জীবনে কোন কোনো সমস্যা সু-সমাধান করা সত্যই শক্ত। একটি বিদেশীকে খুন হতে দেওয়া ভালো,—না প্রণয়িনীর উপরে অসম্মান ডেকে আনা? এহেন অবস্থায় অধিকাংশ লোকে যা করত লিয়ঁ তাই করল। আধ ইঞ্চিও নড়ল না সে। চোখ দুটি নীল স্যাণ্ডাল ও তার পাশের লাল স্রোতের দিকে নিবদ্ধ রেখে স্থির হয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ এমন ভাবে বসে ছিল যেন সে মুগ্ধ হয়ে পড়েছে! তার কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, হৃৎপিণ্ড এত জোরে কাঁপতে লাগল যে বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে আর কি!

ভয়ানক সব দুর্ভাবনা আর অদ্ভুত কত ছায়ামূর্ত্তি এসে তাকে অস্থির করে তুলল। ভেতর থেকে কে যেন বারবার বলে উঠছে—"এক ঘণ্টার

মধ্যেই সব জানাজানি হয়ে যাবে, এবং সবই তো এই তোমার জন্যে!" লিয়ঁও নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিল—"এমন অবস্থায় আমিই বা কি করতে পারি?"

মানুষ শেষ পর্যন্ত অবশ্যি একটু আশার আলো খুঁজে পায়ই।

"পাশের ঘরের ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাবার আগেই হোটেল ছেড়ে পালাই যদি?" ভাবছিল সে—"খুব সম্ভব আমাদের খোঁজ পাবে না কেউ। এখানে কেউই চেনে না আমাদের, আমাকে দেখেছে তারা নীল চশমায় এবং মেয়েটিকেও ওড়না ছাড়া দেখেনি কখনো। আছিও ষ্টেশনের পাশে, এক ঘণ্টার মধ্যেই এই শহর থেকে চলে যাব বহুদূরে।"

পলায়ন-ব্যবস্থার সময় টাইম-টেবলটা খুব ভালো করেই দেখে রেখেছিল, এবারে মনে পড়ল—আটটার সময় প্যারীর ট্রেণ আছে একটা। কিছুকাল পরেই তারা মিশে যাবে রাজধানীর জনারণ্যের মাঝে,—কত আসামীও তো গা ঢাকা দিয়ে থাকে সেখানে। কে খুঁজে পাবে দুটি নিরীহ মানুষকে? কিন্তু আটটার আগেই যদি কেউ এসে ইংরেজটির ঘরে ঢোকে?

সব সমস্যা তো সেখানেই।

তা হ'লে আর কি করতে পারে সে? তার ঝিমিয়ে-পড়া ভাবটা সে গা ঝাড়া দিয়ে ছাড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু একটু নাড়া খেয়েই সংগিনী জেগে উঠে তাকে চুমো খেল ও তার পাথরের মতো ঠাণ্ডা গাল স্পর্শ করে আঁৎকে উঠল।

"একি!"—উদ্বিগ্ন তার কণ্ঠস্বর—"তোমার কপাল যে পাথরের মতো ঠাণ্ডা।"

"ও কিছু নয়!"—তার স্বর কেঁপে যায় "পাশের ঘরে শব্দ শুনছিলাম একটা।"

বিছানা থেকে নেমে নীল স্যাণ্ডালট' সরিয়ে সে একটা আরাম-কেদারা রাখল সেই দোরটার সামনে,—তার প্রণয়িনী সেই ভয়াবহ স্রোতরেখাটা দেখতে না পায়। সেই ধারাটা এখন থেমে গিয়ে মেজের উপরে জমে রয়েছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। এবারে সে দোর খুলে ঝুল-বারান্দার দিকে কান পেতে রইল, এমন কি ইংরেজটির ঘরের দোরটা খুলতেও চেষ্টা করল একবার। কিন্তু তালা-আঁটা সেটা! হোটেলে ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে সবাই। ভোর হয়ে আসছে। কয়েকটা লোক ঘোড়াগুলিকে আস্তাবল থেকে আঙিনায় নিয়ে আসছে। তেতলায় থাকেন এক অফিসার, তিনি ঝং ঝং শব্দ করে নীচে নামছিলেন, তাঁর ঘোড়াগুলিকে ঠিক মতো দেখাশোনা করা হ'চ্ছে কিনা তাই দেখতে যাচ্ছেন।

লিয়ঁ ফিরে এল নীলঘরে, প্রণয়-শংকিত সাবধানে তাদের সত্যিকার অবস্থাটা সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার প্রণয়িনীকে ধীরে ধীরে বোঝাতে লাগল।

হোটেলকর্তা সব গণ্ডগোলের জন্যে ক্ষমা চাইল যত, অফিসারেরা সবাই তো বেশ শান্তিপ্রিয়, তবে কী ক'রে যে সেদিন এমনটা হ'ল কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছে না। লিয়ঁ তাকে আশ্বস্ত করে বলল, কোনো শব্দই শোনেনি সে, ঘুমিয়েছেও চমৎকার!

"আর, আপনার পাশের ঘরের ভদ্রলোকটি"—হোটেলকর্তা বলে চলে—"নিশ্চয়ই আপনার কোনো অসুবিধা করেননি, কারণ বিশেষ কোনো শব্দই করেননি তিনি, মড়ার মতো প'ড়ে প'ড়ে এখনো ঘুমুচ্ছেন বোধহয়।"

লিয়ঁ দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ায়,—পড়ে না যায়। মেয়েটি তার পাশে এসে লিয়ঁর হাতখানা ধরে রাখল,—চোখের উপরে আগেই সে ওড়নাটা টেনে দিয়েছে।

"ইংলণ্ডের একজন লর্ড উনি!"—হোটেলকর্তা নাছোড়বান্দার মতোই বলে চলে,—"সবার সেরাটাই চাই তার সব সময় হ্যাঁ, ভদ্রলোক বটে; তবে সব ইংরেজই অবশ্যি অমন নয়। এখানে আর একটি আছেন,—আচ্ছা লোক একটি! এই ঘর ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া—সবই নাকি তাঁর কাছে মাগ্‌গী।

ইংলণ্ডের ব্যাংকের পাঁচ- উ ও নোটের বদলে আমার কাছ থেকে চায় সে পুরোপুরি দেড়শো ফ্রাংক। তা' হ'লে লাভটা কি আমার? হ্যাঁ,, আপনাকে তো মাদামের সংগে ইংরেজীতে কথা বলতে শুনেছিলাম, আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন, এই নোটটা ভালো হবে তো?"

একটা পাঁচ-পাউণ্ডের নোট সে এগিয়ে দিল, নোটটার এক কোণে লাল দাগ!—লিয় আঁৎকে ওঠে!

"হ্যাঁ ভালোই তো!"—তার গলার স্বর যেন আটকে গেছে।

"তা, আপনাদের হাতে তো এখনও যথেষ্ট সময় আছে।" হোটেলকর্তার কথা থামে না আর—"আটটার আগে ট্রেণ আসে না, আর আসেও প্রায়ই দেরী ক'রে। বসুন না মাদাম, খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।"

ঠিক তখনই মোটাসোটা একটি মেয়ে এসে সেই ঘরে ঢুকল—চা, শিগগিরি, লর্ড সাহেব চা চাচ্ছেন। একটা স্পঞ্জও দরকার। তার লাল পোর্টের বোতলটা প'ড়ে ভেঙে গেছে, সমস্ত ঘরই ভেসে গেছে!"

শুনেই লিয় আস্তে আস্তে বসে পড়ল চেয়ারে, তার সংগিনীও। দুজনের ভেতরই ঠেলে ঠেলে উঠছে উদ্দাম হাসির অদম্য আবেগ, কিন্তু তা প্রকাশ করতে না পেরে তারা কেমন পীড়া অনুভব করছিল। মেয়েটি খুশি ভরে তার সংগীটির হাত ধরে নাড়া দিল। লিয় হোটেল-কর্তাকে ডেকে বলল—"হ্যাঁ, শুনুন, বিকেলের আগে নড়ছিনা আমরা। দুপুরেই একটা উপাদেয় ভোজের ব্যবস্থা করুন দেখি!"

দুর্গ দখল

—মেরেমে

আমার এক সৈনিক বন্ধু কয়েক বছর হয় মারা গেছে গ্রীসে। সে আমাকে একবার তার প্রথম যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেছিল। সেই গল্প আমাকে এমন অভিভূত করে ফেলেছিল যে আজও আমি তা হুবহু মনে করে লিখ্‌তে পারছি:

সৈন্য-বিভাগে যোগ দিয়েছি ৪ঠা সেপ্টেম্বর। তখন সন্ধ্যা। তাঁবুতেই ছিলেন কর্ণেল। প্রথমে তিনি আমাকে রুক্ষভাবেই গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সেনা তি-প্রদত্ত পরিচয়-পত্র পড়ার পরে তাঁর আচরণ বদলে গেল হঠাৎ,—বেশ ভদ্রকণ্ঠেই ডাক দিলেন আমাকে। আমাকে তিনি ক্যাপ্‌টেনের কাছে নিয়ে এলেন। ক্যাপ্‌টেন সবেমাত্র সেনাবাহিনী দেখাশুনা করে ফিরেছেন। ভবিষ্যতে এই ক্যাপ্‌টেনের সংগে পরিচিত হবার সুযোগ পাইনি আর। তিনি ছিলেন লম্বা, কালো আর রুক্ষদর্শন, দেখলেই চোখ ফেরাতে হয় এমন। আগে ছিলেন সাধারণ এক সৈনিক, পরে বহু ক্রুশ ও মেডেল পেয়েছেন যুদ্ধ করে। তাঁর স্বর ছিল ভাঙা এবং ক্ষীণ,—তাঁর প্রকাণ্ড দেহ-ভারের তুলনায় একেবারেই বেখাপ্পা! পরে শুনেছি জেনার যুদ্ধে একটা গুলি দেহ ফুড়ে বেরিয়ে যায় এবং সেই জন্যেই তাঁর স্বর ওরকম হয়েছে!

ফণ্টেনব্লুর কলেজ থেকে সবে এসেছি শুনে তিনি বিকৃত মুখে মন্তব্য করলেন—"আমার দুর্ভাগ্য যে লেফটানেণ্ট মারা গেছেন!" গলা দিয়ে ঠেলে বেরুতে চাইল তীক্ষ্ণ একটা জবাব—কিন্তু হজম করে নিলাম।

চাঁদ উঠেছে শেভারিনো দুর্গের আড়ালে। জায়গাটা বেশী দূরে নয়, একটা কামানের গোলা যতদূর যেতে পারে তার দ্বিগুণ পথ। মস্ত বড় লাল চাঁদ,—উদয়ের সময় দেখায় যেমন! কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল, সেটা অস্বাভাবিক রকম বড়। সেই উজ্জ্বল ফলকের সামনে দুর্গটা দাঁড়িয়ে আছে কয়লার পাহাড়ের মতো। সব মিলে মনে হয় আগ্নেয় গিরির চূড়া দিয়ে যেন অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে! আমার পাশের সৈনিকটি চাঁদের রঙ্ দেখে বলল—"কী টকটকে লাল চাঁদ, দেখেই বোঝা যাচ্ছে দুর্গ দখল করতে অনেক রক্তই দিতে হবে।"

চিরদিনই আমি অন্ধবিশ্বাসী। এমন সময় এমন মন্তব্য শুনে একটু চিন্তিতই হয়ে পড়লাম। বিছানায় এলাম বটে, ঘুমুতে পারলাম না। কিছুক্ষণ ধরে পায়চারি করতে করতে লক্ষ্য করলাম,—শেভারিনো গ্রামের মাথায় দেখা যাচ্ছে আগুনের ঝলক।

রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কিছুটা তাজা হয়ে ফিরে এলাম বিছানায়। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। ক্রমেই নানা দুশ্চিন্তা এসে ঘিরে ধরল। এই প্রান্তরে পড়ে আছি একা; এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে কেউ তো আমার আত্মীয় বা বন্ধু নয়!—আপন মনেই ভাবছিলাম বসে। আহত হ'লে ফেলে রাখবে কোন হাঁসপাতালে,—গেঁয়ো ও বোকা যত হাতুড়ে ডাক্তারদের হাতে। অস্ত্রোপচারের যে সব কাহিনী শুনেছি—বারবার তাই মনে পড়তে লাগল। ঢিপ ঢিপ করে কাঁপতে লাগল বুক,—ভীত ও অভিভূতের মতোই আমি বুকের উপর চেপে ধরলাম আমার রুমাল ও পকেট-বুকটা,—সেটা যেন একটা বর্ম!

ক্লান্তিতে ঝিমুতে ঝিমুতে চোখ বুঁজে এল কখন, কিন্তু ভয়ে ও ভাবনায় চমকে জেগে উঠলাম আবার।

শেষে অবশ্যি নিদারুণ ক্লান্তিতে একেবারে এলিয়ে পড়লাম। দশটা বাজতেও আমি গভীর ঘুমে! সারি বেঁধে আমাদের দাঁড় করে দেওয়া হ'ল, প্রত্যেকের নাম ডাকা হ'লে অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে রাখা হ'ল। সব দেখে শুনে বুঝলাম—অন্তত আরও একটা দিন নির্বিবাদে কাটবে নিশ্চিতই।

কিন্তু রাত তিনটের সময়েই সেনাপতির অনুচর এক আদেশ নিয়ে উপস্থিত হ'ল। যুদ্ধের জন্য এখনি প্রস্তুত হতে হবে! আমাদের গোলন্দাজ সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করে চলে এল যুদ্ধ-প্রান্তরে। আমরাও ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলাম। বিশ মিনিটের মধ্যেই চোখে পড়ল শত্রু-দুর্গ! সামনে, ডানে ও বাঁয়ে আমাদের কাগানবিভাগ। শত্রুর উপর চলল প্রবল গোলাবর্ষণ,—তারাও জবাব দিল সমানে সমান। শিগগিরি দুর্গটা ঢেকে গেল ধুয়োঁর কুণ্ডলীতে। আমাদের সৈন্যবিভাগ রুশীয়দের গুলিগোলা থেকে আত্মরক্ষা করছিল একটা উঁচু ঢিপির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে। তাদের গুলি গোলা আমাদের (লক্ষ্য অবশ্যি আমরা নয়—আমাদের মূল কামানবিভাগ) মাথার উপর দিয়ে হিস হিস ক'রে ছুটে যাচ্ছিল,—কখনও বা ছিটকে ফেলছিল মাটি বা পাথর।

আরো এগোবার আদেশ দেওয়া হ'লে ক্যাপ্টেন তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন আমার দিকে। আমিও গোঁফ জোড়া মুচড়ে নিলাম একবার,—নির্বিকার এক বীরের মতো! সত্যিই আমি ভয় পাইনি, ওরা আমাকে ভীতু মনে করছে নাকি,—তাই শুধু আশংকা হচ্ছিল। আসলে এই ধাবমান গুলি-গোলাই কিন্তু আমার সাহস জাগিয়ে তুলল, আর আমার আত্মসম্মান বোধ আমাকে সজাগ করে দিল যে বিপদটা কাল্পনিক নয়,—চতুর্দিকেই ভয়ংকর অগ্নিলীলা! আমার শান্ত ভাবটা লক্ষ্য করে নিজেই খুশি হলাম। আগে থাকতেই ভাবতে সুরু করে দিলাম—

প্যারার নানা মজলিশে এই দুর্গ-অধিকারের কাহিনী বলতে কত আনন্দ এবং কত গর্বই না হবে!

কর্ণেল আমাদের দলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন আমাকে—"প্রথম এসেই খুব জমকাল যুদ্ধ দেখতে পেলে যা হক!"

যোদ্ধার মতোই হাসলাম আমি এবং ঝাড়া দিয়ে ফেললাম জামার আস্তিনে জমানো ধুলো।

রুশীয় দল ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে যে তাদের গুলিগোলা মাঠে মারা যাচ্ছে; এবারে তারা চালাতে লাগল আগুনে গোলা, সেগুলি আমাদের পরিখায় এসে পড়তে সুরু করল। একটা বিস্ফোরণে উড়ে গেল আমার টুপি এবং মারা গেল পাশের সৈনিকটি।

টুপিটা তুললাম। ক্যাপটেন বলছিলেন—"ভাগ্য ভালো তোমার, আজকের মতো ভালোই কাটবে।"

এটি হ'ল সমর-ক্ষেত্রের অন্ধ বিশ্বাসের কথা। "সুরু শুভ হ'লে শেষও শুভ হবে।" এই উক্তি নাকি যুদ্ধক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

"গুলিগোলার জোরে এভাবে টুপি খুলে দেওয়াকে কিন্তু ঠিক ভদ্রতা বলে না।"—হালকা সুরেই বলছিলাম। এই বাজে একটা ঠাট্টাও কিন্তু ক্ষেত্রগুণে বিশেষ রসালো বলে সমাদৃত হ'ল।

ক্যাপটেন বললেন—'অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে,—আজ রাতেই তুমি একটা দলের নেতৃত্ব করতে পাবে; কারণ আজই আমার শেষ দিন। যতবারই আমি আহত হয়েছি, ততবারই আমার নিম্নতম অফিসার আমার পদ লাভ করেছে।"—তারপর গলা আরও নীচু করে বললেন—"এবং তাদের সবার নামেরই প্রথম অক্ষর পি!"

অবিশ্বাসীর মতোই হাসলাম আমি,—সব লোকেই তখন বোধহয় আমার মতোই হাসত এবং সেজন্যে পরেই আহত হত। কিন্তু

নিজে আমি সৈনিক হ'লেও তখন আমার মনের ভাবনা আর কোনো সৈন্য-সংগীকেই বলার মতো নয়। সব বিষয়ে শান্ত ও সাহসী হওয়াই আমার কর্তব্য।

আধঘণ্টা পরেই রুশীয়দের গোলা-বর্ষণ থেমে গেল। আমাদের আড়াল-আশ্রয় ছেড়ে এবারে এগোতে লাগলাম দুর্গের দিকে।

আমাদের সৈন্যবাহিনীটিতে তিনটী কামান-বিভাগ। দ্বিতীয় দল শত্রুদের আক্রমণ করবে পেছন থেকে,—আর দুটি হ'ল সহকারী বিধ্বংসী দল; আমি ছিলাম তৃতীয় দলে।

এগোবার সংগে সংগেই শত্রু সৈন্যেরা আমাদের প্রবল গোলাবর্ষণে অভ্যর্থনা করল, কিন্তু আমাদের তাতে বিশেষ কিছুই এসে গেল না। গোলার হিস্ হিস্ শব্দ শুনে আমি তো অবাক। "যা হ'ক যুদ্ধটা তাহ'লে যা ভেবেছি তার চেয়ে ঢের ঢের হালকা ব্যাপার!"

"এই চুপচাপ অবস্থাটা মোটেই ভালো 'মনে হচ্ছে না, অশুভ লক্ষণ এটা!"—ক্যাপটেন বললেন।

মনে হ'ল আমাদের সৈন্যদল একটু বেশী অধীর হয়ে উঠেছে। আমাদের উল্লাস ধ্বনির সংগে শত্রুদের নীরবতার তুলনা না করে পারছিলাম না।

শিগগিরি আমরা এসে পৌঁছলাম দুর্গের পাদদেশে। আমাদের কামানের গোলায় ভেঙ্গে পড়েছে দুর্গের কাঠগড়া, ওলটপালট হয়েছে মাটির রক্ষাশ্রয়। "জয় সম্রাটের জয়!"—বলে আমরা ধেয়ে চললাম সেই ধ্বংসস্তুপের মধ্য দিয়ে।

দেখলাম সব। যা দেখলাম তা কোনোদিনও ভুলবার নয়। ধুলোর কুণ্ডলী প্রায় বিশ হাত উপরে উঠে সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে আছে—চন্দ্রাতপের মতো। ভগ্নপ্রাচীরের পেছনে নীলাভ কুয়াশা, তার মধ্য দিয়ে

দেখা যাচ্ছে হিংস্রবেশী পাহারাওয়ালারা বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে আছে পাষাণ মূর্ত্তির মতো। এখনও আমি সেই সৈন্যদের দেখতে পাচ্ছি। বাঁ চোখ দিয়ে আমাদের উপর তারা অগ্নিবর্ষণ করছে,—ডান চোখ সমুদ্যত বন্দুকের আড়ালে। কয়েক হাত দূরেই কামান ও গোলা নিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে।

শংকায় কেঁপে উঠলাম আমি। এবার বুঝি আমার সময় উপস্থিত!

"এবার সুরু হক মরণ-তাণ্ডব! ক্যাপটেন আদেশ দিলেন এবার। এই তার শেষ কথা শুনলাম আমি।

দুর্গ থেকেও ধ্বনিত হয়ে উঠল যুদ্ধ-দামামা। লক্ষ্যমুখে নেবে দাঁড়াল কামানের নল। চোখ বুঁজে রইলাম, কানে এল ভয়াবহ ধ্বংস নিনাদ এবং তারপরেই চীৎকার ও গোঙানি! চোখ খুললাম,—না, এখনো বেঁচে আছি আমি! দুর্গ আবারও ঢেকে গেল ধূঁয়ায়। আমার চার পাশে আহতের স্তূপ। ক্যাপটেন পড়ে আছেন পায়ের কাছে, একটা গোলায় উড়ে গেছে তার মাথাটা। আমার সর্বাঙ্গে তাঁর দেহের রক্ত! সমস্ত দলের মধ্যে আমি ছাড়া বেঁচে আছে মাত্র দুজন সৈনিক।

এই ধ্বংসলীলার পর কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ নীরব। পরমুহূর্তেই কর্ণেল তাঁর তলোয়ারের মাথায় টুপি উঁচিয়ে ধরে বলে উঠলেন—"জয় সম্রাটের জয়।" আমরা জ্যান্ত কজন অমনি তার পিছু পিছু ছুটলাম। এর পরের সব কিছুই আমার কাছে লাগে একটা স্বপ্নের মতো। আমরা ধেয়ে এলাম দুর্গের মধ্যে,—জানি না কেমন করে। ধূঁয়ো-ঘন অন্ধকারে তুমুল হাতাহাতি যুদ্ধ! চারিদিকে এত অন্ধকার যে শত্রুদেরও ঠিক মতো চেনা যাচ্ছে না! হঠাৎ শুনলাম এক বিজয় ধ্বনি! এবং কতকটা স্বচ্ছ অন্ধকারে দেখলাম, রক্ষাশ্রয়গুলি স্তূপাকার হয়ে আছে মৃত ও মুমূর্ষুর দেহে। কামানের উপরে জড় হয়ে আছে অসংখ্য মৃতদেহ।

আর, প্রায় শ দুয়েক নবাগত ফরাসী সৈন্য স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে আদেশের অপেক্ষায়। কেউ গুলি ভরছে, কেউ বা বেয়নেট মুছে রাখছে। তাদের সংগে এগারটি রুশবন্দী।

রক্তাক্ত দেহে প'ড়ে আছেন কর্ণেল,—ভাঙা একটা কামানের উপর! · চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে একদল সৈন্য। আমি তাদের কাছে এলাম।

"সবচেয়ে প্রবীণ ক্যাপটেন কে এখানে?"—একজন সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন মুমূর্ষু কর্ণেল।

সার্জেণ্ট ঘাড় কোঁচকাল নিরুত্তর হতাশার ভঙ্গীতে।

"সবচেয়ে প্রাচীন লেফটানেণ্ট কে?"

"এই সৈনিকটি, গতকাল রাতেই যোগ দিয়েছেন!"—ধীরে ধীরে উত্তর দিল সার্জেণ্ট।

কর্ণেল বাঁকাভাবে হাসলেন একটু। "এদিকে আসুন।"—আমাকে ডাকলেন তিনি—"আপনিই এখন দলের প্রধান নেতা। দুর্গভূমির গিরি-সংকটটা মালগাড়ী দিয়ে সুরক্ষিত করুন। বাইরে শত্রু এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী। তা, জেনারেল সি—অবশ্যি আপনার সাহায্যে আসছেন শিগগিরই।"

"কর্ণেল,"—জিজ্ঞেস করলাম—"আপনার আঘাতটা কি খুবই মারাত্মক হয়েছে?"

"আঃ, রাখুন না ওসব বাজে কথা। . দুর্গ তো দখল হল!"

আলেকজান্দার দুমা (১৮০৩—১৮৭০)

সমসাময়িক মেয়েদের তুলনায় ইনি একটু পুরোনোপন্থী। আবেগময় প্রকাশ ভঙ্গী ও সরল স্বচ্ছন্দতাই এঁর গল্পের সৌন্দর্য। 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' ও 'নাচের মুখোস' এঁর বিখ্যাত দুটি গল্প। একটী সাধ্বী নারীর জীবনে ঈর্ষার নিদারুণ পরিণতি—শেষোক্ত গল্পটিতে চমৎকার ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর একজন বিখ্যাত উপন্যাসিক হিসেবেই ইনি সকলের কাছে পরিচিত।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ

—ডুমা

—এক—

এই কাহিনীর ঘটনাকালে আমাদের সৈন্যবিভাগ অবস্থিত ছিল অষ্ট্রিয়া-সীমান্তে ছোট্ট একটি নোংরা গ্রামে। নাম তার ভেলিনস।

১৮২—খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে সেদিন। কয়েকজন অফিসারকে সংগে নিয়ে প্রাতরাশ সমাপন করছিলাম মাইকেলোভিচের বাড়ীতে; তাঁরই জন্মোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত অতিথি আমরা। খেতে খেতে সৈন্যবিভাগ প্রসংগে নানারকম আলোচনাও করছিলাম।

"দেখুন, একটু খুলে বলবেন কি,"—গৃহস্বামীর কাছেই জানতে চাইল ষ্ট্যাম—"আজ ভোরে কর্ণেল আপনাকে এত আগ্রহ ক'রে কি বলতে যাচ্ছিলেন?"

"ও,—সে এক নতুন অফিসার এসেছেন সেই কথা।"

"নাম?" দুই তিন জন উৎসুক হয়ে উঠল।

"লেফটানেণ্ট জদমিরস্কি,—সুন্দরী মেরিয়ানা রেভেনস্কির ভাবী স্বামী।"

"তা, কখন আসছেন তিনি?"—জানতে চাইলেন মেজর বেলিয়েফ।

"এসে গেছেন তিনি, তিনিও আমাদের সংগে পরিচিত হবার জন্যে বিশেষ উৎসুক। কিন্তু,—হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার,—ক্যাপটেন, আপনার তো তাঁকে চিনবার কথা,"—আমার দিকে ফিরলেন তিনি—"আপনারা দুজনেই তো পিটার্সবার্গ সৈন্যবিভাগে ছিলেন।"

"হ্যাঁ, একত্রই থেকেছি বটে। তখন সে ছিল সাহসী সুদর্শন যুবক, সংগীরা শ্রদ্ধা করত তা'কে, আদর করত প্রত্যেকে,—তবে তা'র মেজাজটা ছিল বড্ডো খিটখিটে!"

ষ্ট্যাম বলছিল—"কুমারী রেভেনস্কি যা বলেছেন,—দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি নাকি বিলক্ষণ দক্ষ। তা, ক্ষেত্রটি এখানে জুটেছে ভালোই। দ্বন্দ্বযুদ্ধ তো এখানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বেশ, চলে আসুন ম'শিয়ে জদমিরস্কি! মেজাজ তার যতই কড়া আর চড়া হ'ক না,—আমার সামনে সাবধান,—নইলে নিজের হাতেই তাঁকে ঢিলে করে ছেড়ে দেব! অভদ্র রূঢ় বিদ্রূপের সুরেই বলছিল ষ্ট্যাম।

"আচ্ছা, রক্ষীবিভাগ ছাড়লেন কেন তিনি?—বোধহয় কোনো একটা ব্যাপার ঘটে থাকবে!"—কর্ণেল নেলেটফ জিজ্ঞেস করলেন।

"যতদূর জানি আমি"—ষ্ট্যামই জবাব দিচ্ছিল—"তার বুড়ী খুড়ীর উত্তরাধিকারীরূপে এখন তিনি বিশ হাজার রুবলের মালিক।"

গৃহস্বামী দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা জানালেন—"আসুন, এবার খেতে খেতে একটু তাস খেলা যাক, পরিবেশনের ভার কোলোকের উপর।"

ষ্ট্যামের যা অবস্থা তাতে কোনো রকমেই তাকে ধনী আখ্যা দেওয়া চলে না, কিন্তু দেখতে না দেখতেই খোয়াল সে ষাট রুবল। কোলোক হঠাৎ বলে উঠল,—

"এই যে ক্যাপটেন জদমিরস্কি!"

"ও, আপনি এসে গেছেন!" মাইকেলোভিচ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে অভ্যর্থনা জানালেন,—"আসুন, আসুন!" মাইকেলোভিচ সবার দিকে তাকিয়ে বললেন—"এই এঁরা হচ্ছেন আপনার নতুন সংগীদল, ক্যাপটেন! সবাই সাহসী যোদ্ধা এবং চমৎকার লোক!"

জদমিরস্কি বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের সৈন্যবিভাগে

যোগ দিয়ে খুশি হচ্ছি, গর্ব অনুভব করছি। অনেক দিন থেকেই আমার এই আগ্রহ ছিল। আপনারা বিনয়বশে যা বলছেন তাই যদি সত্য হয়,—সত্যিই আমি যদি আপনাদের সহৃদয় সংগ পেয়ে থাকি তো এবার ছুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ আমিই।"

"ক্যাপটেন যে, নমস্কার!"—আমার দিকে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন —"তা হলে আবার দেখা হ'ল। আশা করি, পুরানো সংগীকে ভুলে যান নি?"—ষ্ট্যামের দিকে পিঠ রেখে ক্যাপটেন কথা বলছিলেন; ষ্ট্যাম্ তা'র উপর এক কঠিন দৃষ্টি ছুড়ে মারল! এই ষ্ট্যামকে সৈন্যবিভাগে পছন্দ করে না কেউই। নিষ্ঠুর-নীরব স্বভাবের জন্যে কোনো বন্ধু জোটেনি তার। জদমিরস্কিকে সে কোনো দিন দেখেছে বলেও মনে হয় না, তবু তাঁর সংগে এই আকস্মিক শত্রুতার কারণ তিনি বুঝেই উঠতে পারছিলেন না।

একজন অফিসার একটা সিগারেট এগিয়ে দিলে তিনি আর এক-জনেরটা থেকে ধরিয়ে নিয়ে খোসমেজাজে সবাইর সংগে কথা বলতে লাগলেন।

"কিছুদিন এখানে থাকছেন তো?"—মেজর বেলিয়েফ জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, যতদিন পারি!"—সংগে সংগে মুখের হাসিটুকু দিয়ে সবাইকে তিনি যেন অভিবাদন করলেন,—"আমার বহুদিনের বন্ধু রাভেনস্কির বাড়ীর কাছেই বাড়ী নিয়েছি আমি, তাঁর সংগে পরিচয় হয় পিটার্স-বার্গে। আমার বাড়ীতে আছে সুন্দর ঘোড়া, সুদক্ষ পাচক, চলনসই একটা লাইব্রেরী, ছোট্ট একটি বাগান, আর আছে গুলি ছোড়ার মতো চমৎকার জায়গা! এখানকার জীবনটা ঋষির মতোই, রাজার মতোই সুখী আমি। এমনি জীবনই আমি চাই।"

"অ্যাঁ, গুলি ছোড়াও অভ্যাস আছে আপনার?"—বিচিত্র সুরে বলে ষ্ট্যাম, আর তার সাথে যোগ করে এমন একটা বিদ্রূপ হাসির ফোড়ন যে জদমিরস্কি তার দিকে তাকিয়ে থাকেন বিস্ময়ভরে।

"হ্যাঁ, রোজ ভোরে বারোটা করে গুলি ছোড়াই অভ্যাস আমার।"—উত্তর দেন তিনি।

"তা হ'লে এই মজার খেলাটা ভালোই বাসেন দেখছি!"—ষ্ট্যাম নীরস ভাবে বলে—"শিকার না করলে আবার গুলি ছোড়ার বাতিক কেন?—আমার তো এমনটা মাথায় ঢোকে না।"

জদমিরস্কির মলিন চোখমুখ দিয়ে যেন আগুন বেরুতে থাকে।

ক্লান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলেন তিনি—"দেখুন, পিস্তল ছুড়ে তাক নিতে শেখাকে সময়ের অপব্যয় বলার কোনো মানে হয় না। আমাদের এই সৈন্য-জীবনে এমনি ধরণের সাধারণ একটা উদ্ধত উক্তি থেকেই লেগে যায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ; এমনি বাজে কথা ব'লে যারা বড়াই করে তারাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভড়কে যায়, ভয়ে কুকড়ে আসে।"

"একে যুক্তি বলে না, ক্যাপটেন! দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে সর্বত্রই কিছুটা থাকে ভাগ্যের হাতে। আমার প্রথম উক্তি এখনো আমি সমর্থন করছি। ভদ্রলোকে কখনো অতিরিক্ত সাবধান হতে যায় না।"

"মানে?"

"সবাই জানেন, অনেকে এমন আছেন যারা তাস সাফল করার সময়ই কায়দা করে ভালো তাস রেখে দেন নিজের হাতে; অর্থাৎ আমি তো দেখছি,—যে পড়শীর সিন্দুক ভাঙে এবং যে তাকে খুন করে,—এ দুজনের মধ্যে তফাৎ নেই কোনোই।" নিজের উক্তির ঔদ্ধত্য একটুও নরম না করে আরো বলে যায়—"তা, আপনাকেই ইঙ্গিত করে বলছি না, সাধারণ ভাবেই বলছি শুধু!"

"দেখুন এ বাড়াবাড়ি, এ অন্যায়!"—জদমিরস্কি চেঁচিয়ে ওঠেন—"ক্যাপটেন ষ্টেপানোভিচকে অনুরোধ করছি এ'র সংগে একটা বোঝা-পড়া করতে।" আমার দিকে ফিরে বলে সে—"আমার এই অনুরোধ-টুকু রাখবেন আপনি।"

"বেশ ক্যাপটেন,"—চট করে জবাব দেয় ষ্ট্যাম—"নিজেই তো বলেছেন রোজ রোজ তাক করে থাকেন, আমি অবিশ্যি করি যুদ্ধের দিনেই মাত্র! তা বেশ, সমানে সমান হবে। মঁশিয়ে ষ্টেপানিচের সংগে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সব সর্ত স্থির করে নিচ্ছি—এবং সানন্দেই।"

ষ্ট্যাম হঠাৎ উঠে দাঁড়াল এবং গৃহস্বামীর দিকে ফিরে বলল—"নমস্কার মাইকেলোভিচ, কর্ণেলের ওখানে নিমন্ত্রণ আছে আমার!"

সংগে সংগেই তার প্রস্থান।

এতক্ষণ ছিল একটা অস্বস্তিময় স্তব্ধতা। কিন্তু ষ্ট্যাম চলে যেতেই ক্যাপটেন প্রাভদিন সবাইকে সম্বোধন করে বললেন,—

"দেখুন, এ যুদ্ধ হতে পারবে না।"

জদমিরস্কি আলগোছে তাঁর বাহু স্পর্শ করলেন—"ক্যাপটেন, আপনাদের মধ্যে আমি নতুন—অপরিচিত। আমার মর্যাদা আমাকে রক্ষা করতে হবে। বিনা যুদ্ধে এ ব্যাপার চুকিয়ে ফেলা অসম্ভব। এই ভদ্রলোকটির কি ক্ষতি করেছি জানি না, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে আমার উপরে ইনি বিদ্বেষ পোষণ করেন।"

"আসল ব্যাপারটা হচ্ছে—আপনাকে ঈর্ষা করে সে।"—কর্ণেল নেলেটফ বলে দিলেন—"সবাই জানে, কুমারী রেভেনস্কির প্রেমাকাঙ্ক্ষী সে।"

"ও, এই ব্যাপার! আচ্ছা? আপনাদের সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি!"

"এবারে খেতে বসা যাক।"—মাইকেলোভিচ আহ্বান জানালেন—"সহজ হয়ে বসুন আপনারা ; এই, খাবার আনো, খাবার!"

সবাই এবার খুব তাজা হয়ে উঠল ; চাপা পড়ে গেল ষ্ট্যামের কথা। একমাত্র জদমিরস্কিই একটুখানি মলিন। জদমিরস্কিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে খাওয়া সুরু হ'ল। এঁদের কাছে এই সম্মান ও সমাদর পেয়ে সত্যিই তিনি মুগ্ধ হয়ে গেছেন, আবেগভরা কণ্ঠে তিনি সমস্ত অফিসারদের ধন্যবাদ জানালেন।

শেষে সবাইর উঠবার মুখে জদমিরস্কি আমাকে বললেন—"আপনি আমার সমর্থক, কাজেই ষ্ট্যামের সংগে সবকিছু ঠিক করে তাঁর সর্ত জেনে নেবেন, দেখা করবেন ক্যাপটেন প্রাভদিন ও আমার সাথে,—ঘরেই থাকব আমি। এবার চলুন মঁশিয়ে রাভেনস্কির বাড়ী।"

"সময়টা জানতে পারব তো আমরা?" অনেকেই জানতে চাইল। "নিশ্চয়ই আসবেন আপনারা, এবং একজনকে জানাবেন চির-বিদায়!"

রাভেনস্কির বাড়ীর কাছে এসে আমরা তার সংগে করমর্দন করলাম,—ঠিক পুরোনো বন্ধুর মতোই।

—দুই—

ষ্ট্যামের ওখানে পৌছলাম, আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। তার চুক্তি : এক পা দূরে দূরে পোঁতা থাকবে দুটি তলোয়ার, প্রতিদ্বন্দ্বী দুজনেই তলোয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে একহাত বাড়িয়ে রাখবে এবং "তিন" সংকেতের সংগে সংগেই ছুড়বে গুলি। পিস্তলে গুলি থাকবে একটি মাত্র।

অন্য কোনো চুক্তির জন্যে বৃথাই চেষ্টা করলাম আমি। ষ্ট্যাম বলল, "ক্যাপটেন জদমিরস্কি আমার শিকার নয়,—আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার প্রস্তাব মতো যুদ্ধ করবেন তিনি, অন্যথা আমি যুদ্ধ করব না এবং তা হ'লে এটাও বোঝা যাবে যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বুঝলে তবেই তাঁর সাহস বেড়ে ওঠে!"

জদমিরস্কিরও এক কথা,—আমিও রাজি হলাম। জদমিরস্কির ঘরে গিয়ে দেখি কেউ নেই। উৎসুক হয়ে দেখতে লাগলাম চারদিক। ঘরটি সত্যিই সুন্দর। স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে সরল সৌন্দর্য মিলেছে চমৎকার। দৃশ্যতই রুচি আছে ভদ্রলোকটির। বারান্দায় একটা চেয়ার নিয়ে বসে বসে দেখছি বাইরের প্রান্তরটা। ঝড় উঠেছে বাইরে, ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, গর্জে উঠছে বাজ। হঠাৎ খুলে গেল দোরটা; জদমিরস্কি ও প্রাভেদিন এসে উপস্থিত। আমিও এগিয়ে গেলাম।

"দেরী হয়ে গেল ক্যাপটেন, তবে অনিবার্য কারণেই!"—জদমিরস্কি বললেন,—"তা, ষ্ট্যাম কি বলছেন?"

আমি উল্লেখ করলাম প্রতিদ্বন্দ্বীর সর্ত, জদমিরস্কির মুখের উপর ফুটে উঠল ম্লান একটু হাসি, কপালে হাতটা একবার মুছে নিলেন, চোখ দুটি জ্বল জ্বল করতে লাগল জ্বরালো নেশায়।

"আপনি মেনে নিয়েছেন বোধ হয়?" জদমিরস্কি জানতে চাইলেন।

"আপনি নিজেই তো বলেছেন আমাকে।"

"আচ্ছা বেশ, তাই হবে!"

টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন তিনি, দোরের মুখোমুখী। জানালার পাশে চুল্লীর কাছটায় প্রাভেদিন। সবার

অন্তরেই নেমে এসেছে কেমন একটা আশংকার ছায়া। চারিদিকেই বিষণ্ন স্তব্ধতা।

হঠাৎ খুলে গেল দোর। একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল, গায়ের ওভার-কোট দিয়ে জল ঝরছে, মাথায় একটি ঝালর-ঝুলানো ওড়না। চাকরটার পাশ কেটে সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল ও ঝালরটা মুখ থেকে তুলে নিল। এ যে মেরিয়ানা রাভেনস্কি!

প্রাভেদিন ও আমি তো থ খেয়ে গেলাম। জদমিরস্কি চমকে উঠে এগিয়ে এল সামনে—"সর্বনাশ! একি,—তুমি, তুমি এখানে?"

"কেন আমি এখানে"—কাঁদছিল সে—"তুমি, তুমি নিজেই আমাকে জিজ্ঞেস করছ—হয়ত এই রাতই আমাদের জীবনের শেষ রাত। কেন আমি এখানে? তোমাকে বিদায় জানাতে! দুঘণ্টা আগেও তোমার সাথে দেখা হয়েছে কিন্তু একটি কথাও বলোনি তুমি। সবই কি ঠিক হয়ে গেছে জর্জ!"

"কিন্তু এখানে যে এরা সবাই রয়েছেন!"—তাঁর গলা ধরে আসে—"ভেবে দেখেছ মেরিয়ানা, এতে তোমার সুনাম, তোমার সম্মান—"

"তুমিই তো আমার সব! বিশেষ করে এমনি সময় আর কিসের ভয়-ভাবনা আমার!"

সে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে মাথাটি বুকের উপরে চেপে রাখল। প্রাভদিন ও আমি কয়েক পা এগিয়ে গেলাম চলে যাবার জন্যে।

মেরিয়ানা বলল, "আমাকে আজ যখন দেখেছেন, কি আর লুকোব আমি? আর, সম্ভবত আপনারা এ বিষয়ে আমাকে সাহায্যও করতে পারেন।" হঠাৎ সে লুটিয়ে পড়ে জর্জের পা জড়িয়ে ধরল—"মিনতি করছি, তোমার উপর আমার দাবী জানিয়ে বলছি—মঁশিয়ে ট্যামের সংগে

জর্জ, লড়তে যেও না তুমি। তোমার প্রাণ তো আমার, তোমার তো নয়। শুনছ জর্জ, একাজ করতে পারবে না তুমি।”

“মেরিয়ানা, মেরিয়ানা, ভগবানের দোহাই, এমন করো না তুমি। এখন কি ওদের না বলতে পারি? এ যে আমার অপমান, আমার সর্বনাশ! এমন লজ্জাকর কাজ যে আর নেই, লজ্জায় যে মরে যাব আমি,—ষ্ট্যামের গুলি থেকে হয়তো বাঁচতেও পারি।”

“ক্যাপটেন,”—মেয়েটি প্রাভদিনকে বলতে লাগল—“সৈন্য-বিভাগের একজন সম্মানিত লোক বলেই আপনাকে চেনে সবাই। আপনি বুঝে দেখুন, দয়া করে বুঝে দেখুন, ওঁকে বলুন যুদ্ধ না করতে, বুঝিয়ে বলুন যে একে যুদ্ধই বলে না;—একে বলে নৃশংস আত্মহত্যা। আপনি বলুন, বলুন, ক্যাপটেন। আমার কথা না শুনলেও আপনার কথা উনি শুনবেন।”

নরম হয়ে এলেন প্রাভদিন, কাঁপতে লাগল তাঁর ঠোঁট, ছলছলিয়ে উঠল দু-চোখ। দাঁড়িয়ে উঠে তিনি সসম্ভ্রমে মেরিয়ানার হাত ধরলেন ও কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন,—

“আপনার দুঃখ লাঘব করবার জন্যে আমি প্রাণও দিতে পারি, কিন্তু সৈনিকের প্রতিজ্ঞা ভাঙতে দিতে পারি না। প্রতিদ্বন্দ্বীর—মানে আপনার প্রণয়ী বা ষ্ট্যাম দুজনেরই উচিত নিজ নিজ প্রস্তাব মানা,—তা সে যে চুক্তিই হ’ক না! ক্যাপটেন এমন অবস্থায় পড়েছেন যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ অনিবার্য। দ্বন্দ্বযোদ্ধা হিসেবে খ্যাতিও আছে তাঁর; ষ্ট্যামের আহ্বান অস্বীকার করা মানেই তার দাম্ভিকতার সামনে পিছ-পা হওয়া।”

“ওঃ, মেরিয়ানা, আর না!” জর্জ বলছিল—“হায়রে অভাগী মেয়ে! কী চাইছ তুমি নিজেই বুঝছ না। তুমি কি চাও আমি এমন হীন হেয় থাকব যে তুমি নিজেই আমার জন্যে লজ্জিত হবে! তোমাকেই জিজ্ঞেস করি,—অপমানিত অপদস্থ স্বামীকে ভালোবাসতে পারবে তুমি?”

মেরিয়ানা দাঁড়িয়ে উঠে ওভারকোটটা হাতে নিল,—মুখখানি হয়ে গেল মরার মতো শাদা—

"তুমি ঠিকই বলেছ জর্জ, আমি তোমাকে ভালোবাসব না তা নয়, —তুমিই আমাকে ঘৃণা করবে তখন। আমার ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। তোমার হাতখানা দাও জর্জ, হয়তো আমাদের এই শেষ দেখা। জর্জ্জ, ও জর্জ্জ, আজ বাদে কাল, কালই সেই বিষম দিন!"

জর্জ্জের বুকে সে লেগে রইল। জল নেই চোখে, ফোঁপানিতে দুলছে না তার বুক,—কিন্তু একটা গভীর হতাশায় তার দশা হয়েছে ঠিক যেন এক মুমূর্ষুর মতো!

একাই চলে যাচ্ছিল সে। না, জদমিরস্কি তাকে বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দেবেন। জদমিরস্কি ফিরে এলেন মাঝরাতে।

ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন—"আপনারা দুজনেই এখন শুয়ে পড়ুন, আমাকে এক্ষুণি চিঠি লিখতে হবে কয়েকটা। পাঁচটায় যাব আমরা নির্দিষ্ট জায়গায়।"

এত ক্লান্ত লাগছিল যে আবারো বলার প্রতীক্ষা করলাম না। জেগে উঠলাম ভোরের শীতল হাওয়ায়। জানলায় তাকিয়ে দেখি,—উঁকি মারছে উষা, পাশের ঘরে মোড়ামুড়ি দিচ্ছেন প্রাভদিন। জদমিরস্কি এসে মিলিত হলেন। মুখখানা মলিন, কিছুটা শান্ত।

"সব প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ!"

"চলুন তবে।"

গাড়ী চেপে রওনা হলাম আমরা।

—তিন—

"ওই যে মাইকেলোভিচের গাড়ী!"—প্রাভদিন বলে উঠলেন,—"সংগে আর কে যেন,—হ্যাঁ, ঘোড়ার পিঠে নেলেটফ। ওই যে পেছনে আসছে আর সবাই। তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে ভালোই হয়েছে। রাভেনস্কির বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে উপরের দিকে একবার না তাকিয়ে পারলাম না। জানালায় দাঁড়িয়ে আছে হতভাগিণী মেয়েটি, নিশ্চল এক পাষাণমূর্ত্তি! আমাদের দেখেও সে মাথাটি নোয়ায়নি একটুও।

"জল্‌দি"—জদমিরস্কি সহিসকে তাড়া দেন। শুধু এটুকু থেকেই বুঝলাম মেরিয়ানাকে দেখেছেন তিনি। সকলে মিলে পৌঁছল এসে যুদ্ধক্ষেত্রে। প্রান্তরের উপর দেখা গেল দুটি স্মৃতিস্তম্ভ। রাতের আঁধার ক্ষয়ে এল, ফুটে উঠল সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি।

আমাদের পরেই উপস্থিত হলেন মাইকেলোভিচ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চললাম সবাই এগিয়ে। শোনা গেল লাল কাঁকরের উপর যুগপৎ কড়্ কড়্ শব্দ। ঐ বিপক্ষ দল! ষ্ট্যাম আগে, হাতে একটা পিস্তলের বাক্স। সবাইকে অভিবাদন করল সে।

"গুলি ছোড়ার সংকেত জানাবে কে?"

কেউই রাজি হয় না,—কেউই উচ্চারণ করতে চায় না ভয়ঙ্কর 'তিন' সংখ্যাটি, —যার অর্থ এক বন্ধুর মৃত্যু!

জদমিরস্কি বেলিয়েফকে বললেন—"আপনি কি দয়া করে সাহায্য করবেন?„

আপত্তি করতে পারলেন না মেজর।

ষ্ট্যাম বলল—"দুটো পিস্তলই নিয়ে এসেছি আমি।"

"বেশ্!"—উত্তর দেয় জদমিরস্কি।

বেলিয়েফ দুটি তলোয়ার পুঁতে রাখলেন মাটিতে, মাঝখানে তফাৎ শুধু একহাত। দুজনকেই দাঁড়াতে হবে তলোয়ারের ঠিক পিছনে।

ডান হাতটা সম্পূর্ণ টান থাকবে। দুজনের পিস্তলের মুখই দুজনের বুক থেকে মাত্র ছয় ইঞ্চি দূরে! বাক্সটা খোলা হ'লে জদমিরস্কি নিশ্চিন্ত মনে একটা পিস্তল তুলে নিয়ে তলোয়ারের পেছনে দাঁড়ালেন। স্থির নির্ভীক তিনি, বাহাদুরীর লক্ষণ নেই তাঁর চেহারায়, আছে সাহসের স্থৈর্য। কিন্তু ষ্ট্যাম যেন দমে গেছে, নিজের মনেই বলছিল সে—"খুবই সাহসী লোক বটে!"

এবার বেলিয়েফ প্রশ্ন করলেন; "প্রস্তুত আপনারা!"

"প্রস্তুত!"—দুজনেরই প্রত্যুত্তর। দুজনেই পরস্পরের বুকের কাছে এগিয়ে রেখেছে পিস্তলের নল। মৃত্যুর মতো নৈঃশব্দ্য। গাছের ঝোপে ডাকছে পাখীরা। হঠাৎ মেজরের আদেশে কেঁপে উঠল সকলে।

'এক!"

"দুই!"

"তিন!"

জদমিরস্কির পেস্তলের মাথায় ফুটে উঠল একটা ঝলকমাত্র,—শব্দ কৈ? ষ্ট্যাম গুলি ছোড়েনি, তখনও সে উঁচিয়ে রেখেছে তার পিস্তল।

"ছুড়ুন।" জদমিরস্কির স্বর খুবই শান্ত।

"এখন আপনার আদেশে আমার চলবার কথা নয়! গুলি ছুড়বার কর্তা আমিই এবং তা নির্ভর করেছ একটা বিষয়ে আপনার জবাবের উপর।"

"বেশ বলুন!"

আমরাও ঝুঁকে পড়লাম।

"আপনাকে খুন করতে চাই না আমি। আমি নিজে উদাসীন খেয়ালী মানুষ, আমার জীবনের মূল্য কি? আপনি ধনী, তৃপ্ত প্রণয়ী, উজ্জ্বল আপনার ভবিষ্যত, প্রিয় আপনার জীবন!

"কিন্তু ভাগ্য আপনার বাদী তাই আমার হাতই রয়েছে আপনার জীবন। আপনি আজ কথা দিন,—এখন থেকে একটু বিবেচনা করেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়বেন। বলুন, আমিও গুলি ছুড়ব না।"

"আমি প্রথমে আপনার সংগে লড়তে আসিনি।" —গলার স্বর শান্ত —"আপনি নিজেই আমাকে এমন করে খুঁচিয়ে তুলছেন যে লড়তে বাধ্য হয়েছি আমি। বেশ গুলি পুড়ুন, না, আমার আর কিছু বলবার নেই।"

"কিন্তু এই নতুন চুক্তি মানলেও তো আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।" —ষ্ট্যামও ছাড়ছে না—"মেজর, আপনিই বিচারক হ'ন।" বেলিয়েফকে বলল সে—"আপনার কথাই মেনে নেব আমি, হয়তো উনিও না করবেন না।"

"বীরের মতোই ব্যবহার করেছেন ক্যাপটেন জদমিরস্কি। তিনি যদি মারা না গিয়ে থাকেন তো সে অপরাধ তাঁর নয়।"—তারপর অফিসারদের দিকে ফিরে বললেন তিনি—"ক্যাপ্‌টেন জদমিরস্কি কি এই নতুন সর্ত মেনে নিতে পারেন।"

"হ্যাঁ পারেন, নিশ্চয়ই পারেন, এবং তা'র আত্মসম্মান একটুও ক্ষুণ্ণ না করেই।"

জদমরিস্কি স্থির নিশ্চল।

"বেশ, ক্যাপ্‌টেন তা হলে মেনে নিয়েছেন!" —প্রাভদিন এগিয়ে গিয়ে বললেন—"ভবিষ্যতে উনি আরো ধীর বিচারে যুদ্ধে নামবেন।"

"কিন্তু এ তো আপনার কথা, ক্যাপ্টেনের নয়!—ষ্ট্যাম বলছিল।

"আপনি কি আমার কথা মেনে নিচ্ছেন না ক্যাপ্টেন?—প্রাভদিন জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর গলায় অধীর আগ্রহ।

"মেনে নিলাম।" জদমিরস্কির গলা যেন শোনাই যায় না।

"চমৎকার! চমৎকার!" এমন আনন্দময় পরিণামে সমস্ত অফিসারেরাই খুশি হ'ল, দু-তিনজনে টুপিই ছুঁড়ে দিল আকাশে!

ষ্ট্যাম বলল "আমিই খুশি হয়েছি সবচাইতে বেশী। আমার মনমতোই শেষ হয়েছে সব। ক্যাপ্টেন, আপনাকে দেখে বুঝলাম, এক-জেদী লোকের পক্ষে দ্বন্দ্বযুদ্ধে গুলি ছোড়ার মধ্যে কৃতিত্ব নেই কোনোই। সমানে সমান হ'লে ভালো বা মন্দ তাক্ দুই এক কথা। যে দিক থেকেই হ'ক, আপনাকে খুন করতে চাইনি। শুধু দেখতে চেয়েছিলাম, কেমন করে, মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়ান আপনি। সত্যি, আপনি আশ্চর্যরকমের নির্ভীক লোক। অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে। আসলে কিন্তু পিস্তলই ছিল খালি!"

জদমিরস্কি চেঁচিয়ে উঠলেন, তাঁর স্বরে যেন আহত সিংহের গর্জন—

"আমার বংশের নাম ধরেই বলছি, এ আরো অন্যায়, আরো বেশী অপমানকর! আপনারা বলছেন, সব মিটে গেছে! না, না, আবার সুরু হ'ক যুদ্ধ। নিজের হাতেই আমি গুলি ভরে নিচ্ছি।"

"না, ক্যাপ্টেন।" ষ্ট্যাম আস্তে আস্তে বলল—"যে জীবন দান করেছি তা আবার কেড়ে নিতে পারিনা। খুশি হয় অপমান করুন, যুদ্ধ করব না আমি।"

"তা হ'লে আমার সংগেই লড়তে হবে তোমাকে।"—প্রাভদিন উঠে দাঁড়ান, "পাষণ্ডের মতো কাজ করেছ তুমি। আমাদের সংগেও

চাতুরী খেলেছ ? পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার মৃতদেহ যদি ধূলোয় গড়াগড়ি না যায় তো আমার নামই মিথ্যে।"

ঘাবড়ে গেছে ষ্ট্যাম, "আসলে লাভটা কি ?"

নেলেটফ্‌ও লাফিয়ে ওঠে, ""ক্যাপ্‌টেন্‌ যদি খুন নাও করেন, আমি নিজেই দেখব তবে।"

"আমি, আমিও!" বিভিন্ন গলার উত্তেজনা।

"আচ্ছা বেশ! একবারেই তো আর সবার সংগে যুদ্ধ করা যাবে না। একজনই ঠিক হক আগে। তবে তা দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে না, হবে হত্যাকাণ্ড!"

মেজরই এই সভার সভাপতি। ষ্ট্যামের দিকে এগিয়ে তিনি বললেন। "তোমার অন্যায়ের সীমা নেই। ক্যাপটেনকে মৃত্যু-বিভীষিকার সামনে দাঁড় করিয়ে নিজে ছিলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত,—পিস্তল তো খালিই! দ্বিতীয়ত, যাকে দু'বার অপমান করেছ, তাঁর সংগে লড়তে পর্যন্ত রাজি নও তুমি!"

"বেশ ভরুন গুলি। যার খুশি আসুন এগিয়ে।"

"না, লেফটানেণ্ট!"—মেজর ঘৃণাভরে মাথা নাড়ছিলেন,—"কেউই এর মতো লোকের সংগে লড়বে না, কলঙ্কিত করেছ তুমি সৈনিকের বেশ। গভর্মেণ্টের কাছে পৌঁছতে দেব না তোমার অপরাধের কাহিনী, খারাপ স্বাস্থ্যের অছিলায় তোমাকে পদত্যাগ করতে হবে। ডাক্তার দেবেন সার্টিফিকেট। ৩রা মে থেকে ৩রা জুনের মধ্যেই চলে যেতে হবে তোমাকে।"

"বেশ চলেই যাব, তবে আপনার আদেশে নয়, আমার খুশিতে! কোটটা গায়ে দিয়ে তলোয়ারখানা তুলেই ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে বসে ছুটে চলল সে গ্রামের দিকে। আমাদের দিকে তার সেই শেষ দৃষ্টিতে ফুটে উঠল নৃশংস প্রতিশোধের স্পৃহা।

জদমিরস্কিকে ঘিরে বসলাম। বিষণ্ণভাবে বললেন তিনি "কেন, কেন আপনারা আমাকে ঐ পাষণ্ডের চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করালেন? আপনারা না বললে কখনোই মেনে নিতাম না আমি।"

"সত্যিকার দায়িত্ব আমাদেরই।"—মেজর বললেন "সত্যিকার বীরের মতোই কাজ করছেন আপনি, একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি আপনার সম্মান!" তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন—"চলুন এবার খেতে যাওয়া যাক। ঘটনাটা কর্ণেলকে জানাতে হবে।"

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি,—যেন তাঁর বিষণ্ণ চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলতে চান।

গাড়ীতে চেপে বসলাম। রওনা হতেই দেখলাম. পাহাড়ের পথে ষ্ট্যাম গ্রামের দিকে ছুটে চলেছে। জদমিরস্কির দৃষ্টি ছুটে চলল তার দিকে।

"দেখুন, কেমন যেন একটা আশংকা হচ্ছে আমার। বারে বারেই মনে হচ্ছে তার পিস্তলটা ভর্তি থাকলেই ভালো হ'ত,—গুলি ছুড়লেই ভালো হ'ত।"

"সোজা বাড়ী!"—কোচোয়ানকে হুকুম দিলেন। আগের পথ দিয়েই ফিরছিলাম আমরা,—মেরিয়ানার জানলার পাশ দিয়েই। দুজনেই উপরে তাকালাম, কিন্তু মেরিয়ানা নেই!

"ক্যাপ্টেন, আপনি আমার একটা উপকার করবেন?"

"বলুন।"

"মেরিয়ানার কাছে এই করুণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথাটা বলবেন আপনি?"

"বেশ, কখন?"

"এখনি, তাড়াতাড়ি হলেই ভালো হয়। গাড়োয়ান গাড়ী থামাও!"—গাড়ী থেমে গেল। আমি নেমে গেলে গাড়ীটা চলে গেল।

জদমিরস্কি তখন সবেমাত্র ঘরে ঢুকেছেন, আমিও তাঁর দোরে এসে

পৌঁছেচি। আমার মুখ ফ্যাকাশে, ভয়ে বিত্রস্ত। জদমিরস্কি ছুটে এলেন আমার কাছে—"কি ক্যাপটেন? কি হয়েছে?"

আমি তাকে বাইরে টেনে নিয়ে এলাম।

"এক্ষুণি, এই এক্ষুণি চলুন,—প্রাণ থাকতে দেখতে চান যদি! জানালায় দাঁড়িয়ে সে ষ্ট্যামকে দেখেছে প্রবলবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে। ষ্ট্যাম বেঁচে আছে, তার মানে, আপনি নেই আর! অমনি এক আর্তনাদ ক'রে উঠে নীচে পড়ে গেছে সে; সেই থেকে, একবারও আর চোখ মেলেনি।"

"যা আশংকা করেছি!" খালি পায়ে খালি মাথায় তিনি পাগলের মতো রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলেন।

মেরিয়ানার বাড়ীর সিঁড়ি-পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। "ডাক্তার, ডাক্তার, ওর ভালো তো? না?"

"হ্যাঁ, ভালো,—এখন সে সব যন্ত্রনার ওপারে।"

"মরে গেছে?"—তাঁর মুখের সমস্ত রক্তই নিঃশেষে মুছে গেল যেন, দেয়ালটা কোনোমতে আঁকড়ে ধরল, "মরে গেছে!"

"চিরদিনই বলে আসছি, হার্ট ওর খারাপ একটু বেশী কিছু হলেই—"

কিন্তু জদমিরস্কির কানে তখন সকল কথা মিলিয়ে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে ঘরের মধ্য দিয়ে সে পাগলের মতো বলতে বলতে ছুটছিল;—

"মেরিয়ানা, মেরিয়ানা!"

শোবার ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে ছিল মেরিয়ানার বুড়ী ধাত্রী,—সে এসে তার সামনে দাঁড়াল। তাকে সরিয়ে দিয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বিছানার উপর শায়িত একটি দেহ নিস্পন্দ মলিন। মুখখানি এমন শান্ত, যেন সে গভীর ঘুমে! জদমিরস্কি তার বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মেরিয়ানার হাতখানি ধরলেন। তার হিম অবশ হাতের মধ্যে এক গোছা কালো কোঁকড়া চুল।

"ও ভগবান আমার চুল!" জদমিরস্কি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

"হ্যাঁ আপনার!"—বুড়ী বলছিল—"পিটার্সবার্গে আপনার কাছ থেকে চলে আসার সময় সে নিজ হাতেই কেটে রেখেছিল ওই চুল! অনেক দিনই বলেছি আমি, এ থেকে আপনাদের একজনের অমংগল না হয়ে যায় না।"

জদমিরস্কির তারপর কি হ'ল জানতে ইচ্ছে হলে জানতে পাওয়া যাবে ট্রয়েউজা গির্জাবাসের ব্রাদার ভ্যানিলির কাছে।

সেই প্রাদ্রী আপনাদের দেখাবেন—তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ। তাঁর প্রকৃত নাম জানে না তারা, জানে না কেনই বা তিনি পাদ্রীজীবন গ্রহণ করেছিলেন—মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে! তারা শুধু আবছা-ভাবে বলে, তাঁর কোনো প্রণয়িনীর মৃত্যুশোকেই অমন তার দশা হয়েছিল।

নাচের মুখোস

—ছুমা

আগেই বলে রেখেছি, আমি বাড়ীতে নেই। কিন্তু এক বন্ধু ঢুকল এসে জোর করেই। চাকরটা জানাল,—"মিঃ এণ্টনি—।" চাকরটার আড়ালেই দেখতে পেলাম কালো ফ্রককোটের একটা অংশ। ফ্রককোটটাও সম্ভবত আমার ড্রেসিং গাউনটা দেখে ফেলেছে! এবার আর গা ঢাকা দেওয়া যাবে না।

"বেশ ঢুকতে দাও।" জোরে জোরই বললাম আমি; "যাও, জাহান্নামে যাও!" বললাম মনে মনে।

কাজের সময় কোনো ক্ষতি না করেও বিরক্ত করতে পারে একমাত্র কোনো প্রণয়িণী মেয়েই! কারণ অন্তরে অন্তরে তোমার কাজের সংগে সে ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত।

অগত্যা তার কাছে এলাম। কঠিন কোন অধ্যায় লিখবার কেউ এসে বিরক্ত করলে অবস্থাটা হয় যেমন ঠিক তেমন মেজাজেই! কিন্তু তাকে এমন মলিন ও বিপর্যস্ত দেখলাম যে প্রথমেই বলে উঠলাম

"একি, কি হয়েছে তোমার?"

"ওঃ, দম নিতে দাও"।—বলল সে—"আমি তোমাকে সব কথাই বলছি,—হয়ত তা স্বপ্ন, হয়ত আমিই পাগল হয়ে গেছি।"

সে একটা আরাম কেদারায় ধপ্ করে বসে পড়ে দুহাত দিয়ে মাথাটা আকড়ে ধরল।

বিস্ময়ভরে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার চুল থেকে

টপ্ টপ্ করে জল ঝরছিল; জুতো হাঁটু ও ট্রাউজারের নীচটা ছিল কাদায় ভরা। জানালায় এসে দোরেই দেখতে পেলাম তার চাকর ও সহিসকে, কিন্তু কিছুই বুঝে উঠলাম না।

আমার বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করল সে।

"পেরে-লেশেজের কবরভূমি থেকে এলাম এইমাত্রই!" বলল সে।

"দশটায় ছিলে সেখানে?"

হ্যাঁ, আর সাতটার সময় ছিলাম একটা ভয়ানক মুখোস-নাচে।" কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না—মুখোস নাচের সংগে পেরে-লেশেজের কী সম্পর্ক? হাল ছেড়ে দিলাম। অন্যদিক ফিরে পকেট থেকে একটা সিগ্রেট বের করে অসীম ধৈর্যভরে আঙুলের মধ্যে অনবরত ঘোরাতে থাকলাম।

এবারে সে কথা সুরু করতেই আমি জানিয়ে দিলাম, এরকম ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার মতো ধাত আমার নয়। সে আমার হাতখানি একপাশে ঠেলে দিল।

তখন আমি সিগ্রেট ধরাতে ঝুঁকে পড়লাম—কিন্তু সে আমাকে আবারো থামিয়ে দিল।

"এলেক্জান্দার!"—সে বলল—"তোমার হাত দুটি ধরে বলছি, একবার শোনো।"

"কিন্তু মিনিট পনেরো তো সমানে কাটিয়ে দিলে, একটি কথাও তো মুখ দিয়ে বেরোয়নি এখনো।"

"ওঃ, সে এক অদ্ভুত কাহিনী।"

দাঁড়িয়ে পড়ে সিগ্রেটটা রাখলাম পকেটের মধ্যে এবং হাত দুখান বুকের উপর ভাঁজ করে অপেক্ষায় রইলাম—আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে! আমারো এবার বিশ্বাস হচ্ছিল যে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

"মনে আছে তোমার অপেরার সেই বলনাচ;—যেখানে তোমার সংগে দেখা হয়েছিল।"—কিছু পরেই বলল সে।

"সেই যেখানে অন্তত দু'শ লোক জড়ো হয়েছিল।"

হ্যাঁ ঠিক সেইখানেই। তোমাকে ছেড়ে আমি চলে গেলাম নতুন একটা মজার ব্যাপারে। তুমি বারণ করছিলে, কিন্তু নিয়তিই ঠেলে পাঠাল আমাকে। তোমার তো দূরদৃষ্টি আছে—তুমি কেন আমাকে ঠেকিয়ে রাখলে না?···

বিষণ্ণ ও বিরক্ত মনেই অপেরা ছেড়ে চলে আসছিলাম।

হলঘর হৈ হল্লায় মুখরিত—বক্সে, মেঝেতে সর্বত্রই হৈ হল্লা। সমস্ত ঘরে ঘুরতে লাগলাম,—অন্তত বিশটি মুখোস ডাক দিল আমাকে, তাদের নিজেদের নামও জানিয়ে দিল সংগে সংগে।

এরাই এই মুখোস নাচের উদ্যোক্তা,—এরা সবাই এরিষ্টোক্রেট ও ধনী বণিক। কিন্তু এই নৃত্য-বাসরে সে-কথা তাদের মনে থাকে না। সবাই অবশ্যি শিক্ষিত ও মার্জিত পরিবারের তরুণ-তরুণী। এখানে তারা বংশমর্যাদা বা শিক্ষার কথা ভুলে গিয়ে প্রাণ খুলে আমোদ করে। অনেক বারই এমনি নাচের কথা শুনেছি কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কয়েকটা ধাপ উঠে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম নীচের জন-সায়রের উত্তাল দোলা। নানা রঙের কোট, চিত্র-বিচিত্র পোশাক, অদ্ভুত সব মুখোস—সব মিলে দৃশ্যটি মনুষ্য জগতের ব'লে মনে হয় না। সুরু হল গান! কখনো এই বিচিত্র প্রাণীরা অর্কেস্ট্রার সুরে দুলে দুলে উঠল,—আর সে কী অট্টহাসি, সে কী চীৎকার আর শিসের চোট! হাতে হাত দিয়ে এ ওর বাহু বা ঘাড় ধরে নিয়েছে। সে এক বিরাট বৃত্ত! ঘূর্ণায়মান গতিতে তরুণ-তরুণীরা নাচছে, বাজছে পায়ের শব্দ, উড়ছে ধুলো, ঘরের মধ্যে আলো-ঝলকের মাঝে ফুটে উঠছে ধূলিকণা। ক্রমেই বেড়ে উঠছে নাচের তাল, আর

চীৎকারের মাত্রা! ক্রমেই ঘুরে ঘুরে চলছে নাচিয়েরা, হেলে দুলে চলছে মাতালের মতো, চিৎকার করছে ক্ষ্যাপা মেয়েলোকের মতো। আনন্দের চেয়ে উন্মাদনা বেশী, সুখের চেয়ে উচ্ছ্বাসই বড়। যেন দানবের দৌলতে এক নারকীয় নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে!

সব দৃশ্য একে একে চলে যাচ্ছে আমার চোখের উপর দিয়ে; তাদের ঘূর্ণী-গতির দোলা লাগছে আমার গায়ে। আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে পরিচিত লোকেরা এমন দু-একটা রসাল কথা ছুড়ে মারছিল যে লজ্জায় আমি লাল হয়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক ঘরের ভেতরকার মতোই আমার মাথার ভেতরেও ঘোরপাক খেতে লাগল ঐসব গুঞ্জনধ্বনি, হৈ চৈ আর গান বাজনা। শিগগির আমার দশা এমন চরমে উঠল যে বুঝতে পারলাম না—আমার চোখের সামনেকার সবকিছু স্বপ্ন না সত্যি! নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম,—আমিই পাগল হয়ে গেছি, না ওরা? উল্লসিত ঘূর্ণীর মাঝে নিজেকে ছেড়ে দেবার জন্যে একটা দুর্দম আকাঙ্ক্ষা জাগল,—আমিও বিচিত্র ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে চীৎকার করতে থাকব ওদেরই মতো! আর একটু হলেই পাগল হবার উপক্রম! হঠাৎ ভয় হল। ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে এলাম বাইরে,—দোর পর্যন্ত পিছু পিছু ধাওয়া করতে লাগল সেই চিৎকার আর হাসি। গুহা থেকে আগত কামার্ত হরিণীর চীৎকারের মতো সেই শব্দ!

গেটে এসে দাঁড়ালাম,—নিজেকে সামলে নেবার জন্য। রাস্তায় নামতে যেন সাহস হচ্ছে না। সে এমন একটা উন্মত্ত অবস্থা যে ভয় হচ্ছিল পথ চিনে উঠতে পারব না, হয়ত বা চলন্ত গাড়ীর তলেই চাপা পড়ব।

ঠিক তেমন একটি মাতালের মতো দশা আমার, যে কিছুটা সামলে উঠে বুঝতে পারে নিজের বেসামাল অবস্থার কথা। তার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু শক্তি থাকে না। স্থির দৃষ্টি অর্থহীন! তাই বুঝতে

পেরে সে তখন রাস্তার কোনো থাম বা কোনো গাছ আকড়ে ধরে।

ঠিক তখনি একটা গাড়ী এসে থামল দোরের কাছে, তার ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একটি মহিলা। বাইর বারান্দায় ঢুকে সে মাথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল, যেন পথ হারিয়ে গেছে। কালো একটা পোশাক তার গায়ে, মুখখানি মখমলের ঝালরে ঢাকা। দোরের কাছে এসে দাঁড়াল সে।

"আপনার টিকেট ?"—দারোয়ান জিজ্ঞেস করে।

"টিকেট, টিকেট নেই তো !"

"টিকেট অফিস থেকে নিয়ে নিন একটা।"

সে বাইর বারান্দায় এসে ত্রস্তের মতো একে একে সব পকেটই খুঁজতে লাগল।

"টাকা নেই তো !"—সে বলে ওঠে—"হ্যাঁ এই যে আমার আংটি, এটার বদলে ঢুকতে দিতে পারেন।"

"তা হয় না।"—টিকেট অফিস থেকে বলল,—"আমরা অন্যায় লাভ করতে চাই না।"

আংটিটা সরিয়ে দিল সে এবং সেটা মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে আমার পায়ের কাছে এল।

মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছে পাষাণ-মূর্তির মতো,—আংটির কথাও ভুলে গেছে,—ভাবনায় ডুবে আছে সে।

আংটিটা তুলে তাকে দিলাম। দেখলাম, ওড়নার ভেতর দিয়ে তার চোখ দুটি আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

"আপনি আমাকে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করুন, এটুকু আপনাকে করতেই হবে।"

"কিন্তু অমি যে চলে যাচ্ছি," বললাম।

"তবে এই আংটিটার বদলে দুটো ফ্রাংক দিন আমাকে। এই উপকারটুকুর জন্য চিরদিন আপনাকে মনে রাখব।"

আংটিটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে অফিস থেকে দুটো টিকেট কিনলাম। দুজনে একসাথেই ঢুকলাম এবার। বারান্দা দিয়ে ঢুকবার সময় মনে হল তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে, একহাত দিয়ে সে আমার বাহু জড়িয়ে ধরল।

"আপনার কি কষ্ট হচ্ছে খুব!"—জিজ্ঞেস করলাম।

."না, না, ও কিছু না! কেমন একটু মাথা ঘুরছেআমার।" তাড়াতাড়ি হলঘরে ঢুকল সে। জনারণ্যের মধ্য দিয়ে কষ্টে-স্বষ্টে পথ করে সেই মুখোস-পরা লোকদের অনুসরণ করতে করতে আমরা তিনবার হলঘরটা ঘুরলাম। দুএকটা অশ্লীল অভদ্র কথা মেয়েটির কানে এসে পৌছতেই সে শিউরে উঠছিল। একটি মেয়ের হাত ধরে এমন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি ভেবে লজ্জাই লাগছিল। এবার হলঘরের প্রান্তে পৌছলাম এসে।

একটা সোফার উপরে ধপ করে বসে পড়ল সে, আমি তার চেয়ারের পেছনটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সে বলতে লাগল,—আমার অদৃষ্ট! এসব নিশ্চয়ই আপনার কাছে ক্ষ্যাপামি বলে মনে হবে, আমার কাছেই মনে হয়। এসব ব্যাপার ধারণায়ও ছিল না আমার, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এমনটা হতে পারে। কিন্তু কয়েকজন লোক আমাকে লিখে জানিয়েছে—একটি মেয়ের সাথে সে আসবে এখানে। এমনি জায়গায় কি ধরনের মেয়ে লোক আসে তা তো বুঝতেই পারছেন।"

বিস্মিত হলাম আমি, সেও তা বুঝল। "আমিও তো এখানেই এসেছি! আপনি জানতে চাইছেন, কেন? আমার কথা আলাদা।

—আমি—আমি তো তাকে খুঁজছি। আমি তাঁর স্ত্রী! আর এই সব লোক এসেছে মাতলামি আর নষ্টামির জন্যে। কিন্তু আমি—আমি যে ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছি! সর্বত্র খুঁজেছি তাকে, একটা কবর ভূমিতে রয়েছি সমস্ত রাত,—পড়ে রয়েছি বধ্যভূমিতে পর্যন্ত! অথচ আপনার কাছে শপথ করছি, কুমারী বয়সে মাকে ছাড়া একটি বারও রাস্তায় পা বাড়াইনি। বিয়ের পরে চাকর সংগে না নিয়ে একা রাস্তায় নামিনি। আর, আজকে আমি এখানে এসেছি, একটা খারাপ মেয়ের মতোই! অজানা এক পুরুষের বাহুতে রেখেছি আমার বাহু, এবং তিনি কি মনে করছেন ভেবে ওড়নার আড়ালে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। সবি বুঝি আমি।—কিন্তু কখনও কি বুঝেছেন ঈর্ষা কী ভয়ানক!"

"সে দুর্ভাগ্য হয়েছে আমার!" বললাম।

"তা হ'লে আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন, আপনি বুঝবেন সব, মানুষকে যে শক্তি লজ্জা ও পাপের মধ্যে টেনে নামায়—আপনি তা অনুভব করতে পারবেন, আপনি উদ্‌ভ্রান্তের মতোই তা হলে ছুটে থাকবেন লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রাণের ইঙ্গিতে। প্রতিহিংসার জন্য এমন সময় মানুষে কি না করে বসতে পারে?"

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। আমাদের সম্মুখ দিয়ে দুটি মুখোস চ'লে যাচ্ছিল, সে তীক্ষ্ণ চোখে তাদের অনুসরণ করল।

"চুপ!"—বলল সে।

আমাকে সংগে নিয়ে সে তাদের পিছু পিছু চলতে লাগল। আমি যেন একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছি, অথচ তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। অনেকগুলি রশ্মি যেন আমার সামনে ঘুরে ফিরছে—কিন্তু একটাকেও আমি ধরে রাখতে পারছি না।

কিন্তু মেয়েটীকে এত বিব্রত দেখে সব কিছু জানবার জন্য কৌতুহল জাগল। ঠিক একটী শিশুর মতোই তার সব কথা শুনে যাচ্ছি আমি,—দুটি ছদ্মবেশীকেই অনুসরণ করছি। স্পষ্টতই তাদের একটি পুরুষ, একটি মেয়ে। নীচু গলায় কথা বলছিল তারা,—কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম। "ওই যে সে!" আমার সংগিনী মেয়েটির গলা ধরে আসে।

"ওই তার কথা! হ্যাঁ, ওই যে সে—"

মুখোস দুটির একটি হাসছিল।

"ঠিক তার হাসি! সে-ই, হ্যাঁ, সে-ই। তারা আমাকে ঠিকই জানিয়েছে।"

দুটি ছদ্মবেশীই ঘুরে ঘুরে চলছে। আমরাও অনুসরণ করে ফিরছি। হল থেকে বেরুল তারা। আমরাও পিছু পিছু, মাঝামাঝি জায়গায় একটা বক্সের কাছে এসে থামল তারা,—আমরা ঠিক দুটি ছায়ার মতোই তাদের অনুসরণ করছি। একটা ছোট বক্স খুলে ঢুকল তারা, দোরটাও বন্ধ হয়ে গেল।

আমার বাহুতে আশ্রিতা মেয়েটি তখন এমন ব্যস্ত হয়ে উঠল যে আমি তো ঘাবড়েই গেলাম। তার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু আমার গায়ে সে এলিয়ে পড়েছে বলে অনুভব করছিলাম তার বুকের স্পন্দন, তার দেহের কম্পন! তার দুঃখের কথা শুনে ও তার দেহের অবস্থা দেখে আমার মনে জেগে উঠল কেমন একটা বিপদের আভাস। যদিও তার কারণ জানি না কিছুই।......হ্যাঁ, দুনিয়ার সমস্ত ধনদৌলতের বিনিময়েও তখন আমি সেই মেয়েটিকে ছেড়ে যেতে পারতাম না।

ছদ্মবেশী দুটিকে বক্সে ঢুকে দোর বন্ধ করতে দেখে সে শুব্ধ হয়ে

দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ,—একেবারেই বিমূঢ়ের মতো, তারপর তাদের দোরের কাছে ঝুঁকে পড়ে কাণ খাড়া করে রইল। এমন অবস্থায় একটু নড়াচড়া করলেই ধরা পড়ে যাবে; সর্বনাশ হয়ে যাবে! তাই আমি তাকে জোর করে টেনে নিয়ে এলাম পাশের বক্সে, দোরটা বন্ধ করে দিলাম।

বললাম—"শুনতে চাইলে এখান থেকেই শুনুন, দয়া করে এখান থেকেই শুনুন।"

সে হাঁটু গেড়ে বসে পার্টিশনে কান চেপে রাখল, আর আমি—আমি পাষাণ-মূর্তির মতো তার পাশে দাঁড়িয়ে,—হাত দুখানা বুকের উপর ভাঁজ করা, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে নানা চিন্তার ভারে।

মেয়েটির যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম তাতেই বুঝলাম—খুব সুন্দরী সে। মুখের নীচের দিকটা ওড়নায় ঢাকা ছিল না, সেটুকু কী যে লাবণ্যময়, কী যে কোমল ও নিটোল। টুকটুকে কোমল অধর! ওড়নার পাশে দাঁতের সারি দেখাচ্ছিল মুক্তো-মালার মতো! হাত দুটি যেন মর্মরে কুঁদে গড়া, তনুলতা যেন শিল্পীর প্রণয়ে গড়া, কালো সিল্কের মতো নরম চুলের রাশি এলিয়ে পড়েছে পিঠের উপর, শিশুর পায়ের মতো ছোট্ট পা দুটি চঞ্চল স্কার্টের নীচ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বারবার। এত ছোট সেই পা দুটি! তার নমনীয় দেহলতার অপরূপ দোলা যেন তা সইতে পারছে না!

আঃ, কি অপরূপ সুন্দরী সে। আর কী সৌভাগ্যবান সেই পুরুষ যে তাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারবে, পাবে তার ভালোবাসা, নিজের বুকে অনুভব করতে পাবে তার ওই কোমল বক্ষ-কমলের কম্পন, তার গভীর প্রাণের স্পন্দন—ভীরু ধুক ধুক! সে বলতে পারবে—'ভালোবাসার কি অপূর্ব মহিমা! লক্ষ লক্ষ

লোকের মাঝে আমি সেই ভালোবাসা পেয়ে ধন্য,—সেই স্বর্গের ভালোবাসা! ওঃ, কে সেই ভাগ্যবান পুরুষ?"

তাই ভাবছিলাম। তখন মেয়েটি উঠে আমার কাছে কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগল—

"আমি সুন্দর, সত্যিই সুন্দর! বয়সও আমার কম, মাত্র উনিশ। ফুলের মতোই শুভ্র অকলঙ্ক আমি। বেশ, আজ তবে তাই হক!"—সে তার দুই বাহু দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল—"হ্যাঁ আমি তোমার, আমাকে নাও।" অমনি তার ওষ্ঠ দুটি আমার ওষ্ঠে এঁটে রইল এক নিবিড় চুম্বনে। চুম্বন নয় বরং কামড়ের মতোই একটা অনুভূতি আমার সর্বাঙ্গে জাগিয়ে তুলল কেমন এক বিষণ্ণ শিহরণ! আমার চোখের সামনে বয়ে গেল আগুনের ঝড়! কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আমার দুই বাহুর মধ্যে আধমরার মতো এলিয়ে পড়ল, কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

ধীরে ধীরে সামলে উঠল সে, ওড়নার নীচদিয়ে দেখলাম তার চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। তার মুখের নীচের দিকটায় চোখ পড়ছিল শুধু,—কী মলিন ও করুণ সে ছবি! ঠক ঠক করে দাঁত কাঁপছে সবই দেখতে পাচ্ছিলাম।

এবারে সব ঘটনা মনে করে সে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—"আমার উপরে আপনার কণামাত্র করুণাও যদি থাকে, একটুও সহানুভূতি যদি থাকে তবে আমার দিকে ফিরে তাকাবেন না আর, কখনো জানিতে চাইবেন না আমার কথা। আমাকে যেতে দিন, ভুলে যান আমাকে, একেবারে ভুলে যান। আমি নিজেই মনে রাখব আমাদের দুজনকেই!"

আবারো সে উঠে দাঁড়াল, কী ভেবে হঠাৎ ছুটে গিয়ে দোর খুলল এবং ফিরে এসে আবারো বলল—'আমাকে অনুসরণ করবেন না, আপনার পা ছুঁয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার কোনো খোঁজ খবর নেবেন না।”

সামনের দোরটা একবার খুলে গিয়েই বন্ধ হয়ে গেল,—তার ও আমার মাঝখানে! আমার চোখের আড়ালে চলে গেল সে—স্বপ্নের মতো! আর কোনোদিন দেখিনি তাকে।

কোনোদিন আর দেখিনি! এই ছ'মাসের প্রত্যেক দিন তাকে খুঁজেছি আমি সর্বত্র—বলনাচে, প্রদর্শনীতে, মাঠেঘাটে। কখনো কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলেই, শিশুদের মতো ছোট্ট দুটি পা আর কালো চুলের রাশি দেখলেই ছায়ার মতো তাকে আমি অনুসরণ করেছি, তার কাছে ঘনিয়ে এসেছি, তাকিয়ে রয়েছি তার মুখে। বুকে কত আশা, হয়তো তার মুখের সরগের রাঙা আভাসটুকু দেখেই চিনব তাকে! কিন্তু কোথাও যে তাকে আর খুঁজে পাইনি, কোথাও দেখিনি তাকে।—শুধু রাতে রাতের স্বপ্নেই এসেছে সে। ওঃ, স্বপ্নে এসেছে সে, আবারো এসেছে সে! আবারো অনুভব করেছি তার আগমন, অনুভব করেছি তার আলিঙ্গন, তার বুক-চাপা বুক-ভাঙা আলিঙ্গন! সেই আলিঙ্গনে আছে এক সর্বনাশা শক্তি কী যেন রাক্ষসী মায়া। তারপর, তারপর খুলে পড়েছে আবরণ, ফুটে উঠেছে একখানি মুখ,—মেঘে ঢাকা অস্পষ্ট মুখ। কখনো বা চাঁদের মতো উজ্জ্বল, চারদিকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে বৃত্তাকারে। আর কখনো বা এসেছে সে নগ্ন এক শুভ্র কঙ্কাল, একটা খুলি! চোখ উবে গেছে কোটর থেকে, কয়েকটি দাঁত ঠক ঠক করে

সত্যি, সেই রাত থেকে আমি আর বেঁচে নেই,—অজানা এক নারীর জন্যে জ্বলে পুড়ে মরছি উন্মাদ প্রেমের দাহনে; কত আশা করে আশাহত হয়েছি নিত্য নিয়ত। অধিকার না থাকলেও ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলে মরেছি,—অথচ জানিনা ঈর্ষা করেছি কাকে! এই উন্মাদনার কথা বাইরে কারো কাছে স্বীকার করতেও সাহস হয় না, অথচ সব সময়ে সে আছে আমার পিছু পিছু, ক্ষয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে! আমাকে মেরে ফেলেছে সে—আমার সেই অচিনা!"

এই কথা ব'লেই সে বুক থেকে টেনে বের করল একটা চিঠি।

"তোমাকে সব বলেছি"—সে বলল "এখন এই চিঠিটা পড়ো।"

চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলাম—

"আপনি বোধ হয়, সেই অভাগিনী মেয়েটিকে ভুলে গেছেন। তবে, সে কিছুই ভোলেনি,—আর ভোলেনি ব'লেই আজ মরছে সে!

এই চিঠি পড়ার সময় এ পৃথিবীতে থাকব না আমি। পেরে-লেশেজের কবরভূমিতে গিয়ে মেরি নামের সবচেয়ে নতুন কবরটি দেখতে চাইবেন একবার। কবরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে একটু প্রার্থনা করবেন এই হতভাগিনীর জন্যে।"

"হায় ভগবান!"—এণ্টনি বলতে লাগল—"কাল চিঠি পেয়ে আজ ভোরেই গেছি সেখানে। আমাকে তারা কবরটা দেখাল। আমি কবরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুঘণ্টা প্রার্থনা করলাম, আর কাঁদলাম শুধু! বুঝতে পারছ এলেকজাণ্ডার? সেই কবরেই রয়েছে সে, সেই নারী। তার সুন্দর প্রাণ নিভে গেছে, মিলিয়ে গেছে, তার পোড়া দেহ ঈর্ষায় অনুশোচনায় ভেঙে পড়েছে মাটির তলায়। সেই নারী, আমার পায়ের কাছে, এই মাটির নীচে! একদিন বেঁচে ছিল সে, আর আমার জন্যেই চলে গেল আজ কোন যবনিকার

আড়ালে! নির্জন কবরের মতোই সে আসন পেতেছে আমার, সারা জীবন জুড়ে! সেই অচিনা আমার বুকেও কবর দিয়ে রেখে গেছে একটি মৃতদেহ,—মৃত্যু-হিম একটি দেহ! ওঃ, ওঃ, ভগবান! এমন আর শুনেছ তুমি? এত ভয়ানক কিছু শুনেছ আর? অথচ আজ তো সবই অন্ধকার! কোনদিনই তাকে আর দেখতে পাব না? কবর খুঁড়ে বের ক'রে এনে আবারো তাকে বাঁচিয়ে তুলব, হয়তো তার সেই মুখখানি আমার মানস পটে এঁকে রাখবার মতো কোনো চিহ্ন, কোনো সাহায্য খুঁজে পাব আমি। আমি কী যে ভালোবাসি তাকে, তুমি কি বুঝবে এলেকজাণ্ডার? পাগলের মতো ভালোবাসি তাকে। তার কাছে গিয়ে মিলবার জন্যে আমি আত্মহত্যা করতাম, কিন্তু সে যে আমার সেই চিরদিনের অচিনা, চিনি না যে কে সে! কে আমার সেই অচিনা! এ পৃথিবীর মতোই ওপারেও তো সে আমার চির অচিনাই থেকে যাবে!"

এই বলেই সে চিঠিটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বারংবার চুমো খেতে লাগল, আর হু হু করে কাঁদতে লাগল—ছোট্ট একটি শিশুর মতোই।

আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। কি যে বলব ভেবে না পেয়ে তার সাথে সাথে আমিও ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম।

আলফ্রেদ দ্য মুসেত্ (১৮১০—১৮৫৭)

বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ইনি। এঁর প্রতিভা ছিলো দুই দিকেই—সুধী মহলে এবং মেয়ে মহলেও। ঠিক বায়রণের মতো।

'আনন্দ, দরদ ও স্বচ্ছন্দ সারল্যই মুসেতের রচনার প্রাণ। "শাদা কোকিল" তার নিজ জীবনেরই রূপক কাহিনী, এই জাতীয় এমন সুন্দর রচনা পৃথিবীর সাহিত্যেই দুর্লভ। হুগো আধুনিক গীতিকবিতার ঈগল হ'লে, মুসেত হ'লেন কোকিল। মুসেতের গদ্যরচনাও কবিতার মতো সুন্দর। এঁর 'ক্যামল' গল্পটি এমন দরদ দিয়ে লেখা যে বার বার মনে হয় এই কবির প্রাণটিও ছিলো সত্যিকার সুন্দর।

একসময় বিখ্যাত লেখিকা জর্জিয়া স্যাণ্ড ছিলেন মুসেতেরই স্ত্রী, কিন্তু বিবাহিত জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয়নি, অতিরিক্ত পানাসক্তির ফলেই মৃত্যু হয় মুসেতের।

ক্যামিল

—মুসেত্‌

(১)

শেভেলিয়ার দ্য আর্কিস ছিল অশ্বারোহী সেনাবিভাগের অফিসার। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে চাকরী ছেড়ে দিয়ে ম্যানসের কাছে সে নিরালায় ঘর বাঁধে। তখনো যুবক সে, অবসরপ্রাপ্ত এক ব্যবসায়ী ছিল প্রতিবেশী। কিছুদিন পরে এর মেয়েকেই বিয়ে করে সে ; কয়েক বছর পর্যন্ত বড় সুখেরই হ'ল এই পরিণয়। স্ত্রী সেসিলের আত্মীয়েরাও ছিল সম্মানিত লোক, কঠোর কাজের মধ্যদিয়ে লাভ করেছে তারা লক্ষ্মীর প্রসাদ। এখন পরিণত বয়সে তাই দৈনন্দিন অবকাশ উপভোগ করছে। শহরের কৃত্রিম জীবন যাত্রায় বিরক্ত হয়ে নিজেদের এখন আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়েছে পল্লীর সহজ সরল আনন্দে। গিরাদ নামে সেসিলের এক কাকা ছিলেন। চমৎকার লোক তিনি। আগে ছিলেন পাকা ইঁটকাটা কুমার, কিন্তু ধাপে ধাপে উন্নতি করে হয়েছেন স্থাপত্যশিল্পী,—প্রভূত সম্পত্তির মালিক এখন। শেভেলিয়ারের বাড়ীর নাম ছিল শারদোনে। গিরাদ কাকার চোখে খুবই ভালো লাগে এই বাড়ীটি, এখানকার নিত্য অতিথি তিনি এবং প্রিয় অতিথি। শেভেলিয়ার ও সেসিলের ঘর আলো করল এসে ফুটফুটে একটি মেয়ে,—বাপ মার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু তাদের ভাগ্যে লেখা ছিল নিদারুণ আঘাত। শিগগিরি একটা সাংঘাতিক সত্য তাদের কাছে ধরা পড়ল,—তাদের ছোট্ট ক্যামিল কালা অর্থাৎ বোবাও!

(২)

প্রথমে মা'র প্রাণে জাগল আরোগ্যের ব্যবস্থার কথা, কিন্তু বড় দুঃখেই তাকে এই আশা ছাড়তে হ'ল, কোনো প্রতিকার নেই এর। তখনকার দিনে মূক বধির নামীয় এই অসহায় জীবদের লোকে ভয়ানক সন্দেহের চোখে দেখত। কয়েকজন মহাত্মা অবশ্যি এই বর্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর এক স্পেণীয় সাধুই সর্বপ্রথমে এই মূকদের জন্য এক শব্দহীন ভাষা আবিষ্কার করেন,—তখন পর্যন্ত এমন ঘটনা অসম্ভব বলেই গণ্য হ'ত। বনেট, ওয়ালিকা, বুলার এবং হেলমণ্ট প্রমুখ মনীষীদের দ্বারা তাঁর এই আদর্শ নানা স্থানে গৃহীত হয়েছিল, যেমন ইতালী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে। কিছু কিছু সুফলও দেখা গেল নানা জায়গায়। তখকার দিনে এমন কি প্যারীতেও মূক ও বধিরদের লোকে আলাদা চোখেই দেখত, তাদের উপর লেখা রয়েছে যেন কোন দৈব অভিশাপ ; কথা বলার শক্তি নেই বলে চিন্তা শক্তি থেকেও যেন বঞ্চিত তারা। তাদের অস্তিত্ব করুণের চেয়ে বরং বেশী ভয়াবহ।

ক্যামিলের বাবা মা'র সুখের জীবনে নেমে এল এক কালো যবনিকা। তাদের মাঝখানে নিঃশব্দে ঘনিয়ে এল এক আকস্মিক বিচ্ছেদ,—বিবাহ-বিচ্ছেদের চেয়েও তা ভয়ানক, মৃত্যুর চেয়েও নির্মম! কারণ, মা সারা বুক দিয়ে ভালোবাসে মেয়েকে, অথচ সহৃদয় শেভেলিয়ার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার অন্তরের কঠিন বিরক্তি জয় করতে পারল না,—শোকের আঘাতে তার প্রাণ ভরে উঠল নিদারুণ অপ্রীতিতে। মা মেয়ের সাথে কথা বলে আকারে ঈঙ্গিতে, মেয়ের কাছে নিজেকে মেলে দিতে পারে একমাত্র সেই। ঘরের আর সকলে, এমন কি তার বাবাও যেন ক্যামিলের কাছে অপরিচিতের মতো। সেসিলের মা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে-লোক,—দিনরাত শুধু মেয়ে জামাইয়ের ভাগ্যকে উচ্চকণ্ঠে ধিক্কার জানায়

"এর চেয়ে ম'রে গেলেই ছিল ভালো।" একদিন সত্য সত্যই সে বলে ফেলল।

"আমি নিজেই যদি অমন হতাম, কি করতে তুমি?"—সেসিল রেগে উঠে জিজ্ঞেস করে।

কাকা গিরাদের কাছে কিন্তু নাত্নীর এই মূক অবস্থাটা তেমন একটা ভয়ানক দুর্ভাগ্য বলে মনে হল না। তিনি বলছিলেন, "আমার স্ত্রী জীবটি এমনি মুখরা যে আমি তো মনে করি—ভালোই হয়েছে। এই ছোট মেয়েটি কোনো দিন ভুলেও খারাপ কথা বলবে না বা শুনবে না; থিয়েটারী ঢংএ সুর ভেজে ঝালাপালা করবে না সমস্ত ঘর বাড়ী, ঝগড়াও করবে না; বিছানায় স্বামী একটু কাশলে বা নড়লে জেগে উঠবে না ভ্রূকুটি করে! দেখতেও পাবে সে স্পষ্ট চোখেই,—কারণ বধিরদের নজর থাকে ভালোই। লাবণ্যময়ী ও বুদ্ধিমতী হবে সে, সোরগোল করবে না কোনোদিন। যুবক হলে তো আমি নিজেই একে বিয়ে করে ফেলতাম। তা, বুড়োই হয়েছি যখন, তোমরা একে নিয়ে বিব্রত হয়ে থাকলে আমার নিজের মেয়ের মতোই একে কাছে রাখব।" ক্ষণেকের জন্যে হতভাগ্য বাবা মা'র প্রাণ গিরাদ কাকার কথায় হাল্কা হয়ে ওঠে। কিন্তু শিগগিরি আবার ঘনিয়ে আসে কালো মেঘ।

(৩)

দিনে দিনে ছোট মেয়ে বড় হয়ে ওঠে। বয়সের গুণে সুন্দর হয়ে গড়ে উঠল সে, কিন্তু দুঃখের কথা, শেভেলিয়ারের মন ফিরল না একটুও। মা মেয়েকে এখনো আদরে ঘিরে রাখে, রাখে কাছে কাছে, উন্মুখ হয়ে লক্ষ্য করে জীবনের প্রতি ক্যামিলের ক্ষীণতম আগ্রহটুকু। সমবয়সী সাথীরা প্রথম পাঠ শুরু করলে বেচারা ক্যামিল হঠাৎ বুঝতে পারল

অন্যের সংগে তার কি তফাৎ। প্রতিবেশী একটি মেয়ের গৃহশিক্ষয়িত্রীর মেজাজটা ছিল বড্ড কড়া, একদিন বর্ণবিন্যাস পঠের সময় ক্যামিল ছিল পাশেই। মেয়েটির সামনে ঝুঁকে পড়ে তার প্রতিটি প্রচেষ্টা এমন ভাবে সে লক্ষ্য করছিল যেন তাকে সাহায্যই করতে যাচ্ছে! মেয়েটি বকুনি খেলে কেঁদে উঠল সে নিজেই। ক্যামিলের কাছে সবচেয়ে বড় ধাঁধা হ'ল গানের পাঠ। প্রতিবেশীদের সান্ধ্য প্রার্থনার আসর আর একটি রহস্যের রাজ্য। সেখানে তার সাথীদের পাশে সে নিজেও বসে হাঁটু গেড়ে, করজোড়ে প্রার্থনা জানায়, কিন্তু জানে না কার উদ্দেশে! শেভেলিয়ারের কাছে এ যেন এক লজ্জা বিশেষ, সেসিল কিন্তু অতটা মনে করে না। বয়স বাড়বার সংগে সংগে ক্যামিলের প্রাণে জেগে উঠল গির্জার প্রতি এক অদম্য আকর্ষণ। "শিশুকালে ভগবানকে দেখিনি, দেখেছি আকাশ!"—এক মূক বধির বলেছিল। তা কে জানে, ছেলেমানুষের প্রাণ খুলে যায় কিসে? যতক্ষণ প্রাণ খোলা রইল কি বা আসে যায় আর!

(৪)

ক্যামিল লাবণ্যময়ী, তুষার শুভ্র তার তনু, দীর্ঘ কালো চুল, মনোরম চাল-চলন! মার মনের কোণের ইচ্ছাটুকুও বোঝে সে অমনি, পূরণ করতেও দেরী হয় না এতটুকু। এত রূপ, এত লাবণ্য, অথচ এত ভাগ্যহীনা—শেভেলিয়ার কাছে এটাই বড় বিব্রত হবার বিষয়। মাঝে মাঝে সে উচ্ছ্বাস ভরে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, "আমিও একেবারে খারাপ লোক নই ক্যামিল।"

বাগানের প্রান্তে বেড়াবার পথ। প্রাতরাশের পরে শেভেলিয়ার প্রত্যহই এখানে একটু বেড়ায়। মাদাম সেসিল তার শোবার ঘরের

জানলা থেকে স্বামীকে চেয়ে দেখে। একদিন ভোর বেলা স্বামীর কাছে একটা কথা বলবে ঠিক করল সে, বুক তার কাঁপছিল। ক্যামিলকে নিয়ে যাবে বল নাচের আসরে এক ধনী প্রতিবেশীর বাড়ীতে, আজ সন্ধ্যারই। বাইরের জগতের উপর তার মেয়ের রূপের প্রভাবটা কি রকম হয় দেখতে চায় সে, তার স্বামীরই বা কী রকম লাগে! ক্যামিলের সাজ-সজ্জার কথা ভেবে ভেবে সারাটি রাত একবারও সে চোখ বোজেনি। তার প্রাণে আশা জেগেছে নানারকমের। আপন মনেই সে বলছিল, নিশ্চয়ই আমার স্বামীর বুক তখন গর্বে ভরে উঠবে, আর ঈর্ষা হবে অন্য সবাইর। ক্যামিল নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে নিরালায়,—কিন্তু কী অনিন্দ্য সুন্দর!

শেভেলিয়ার স্ত্রীকে দেখে খুশিই হয়ে ওঠে, পাশাপাশি বেড়াতে বেড়াতে এটা সেটা নানাকথা বলতে থাকে। তারপর আবার চুপচাপ। সেসিল তখন ভাবছিল, কোন লাগসই কথা দিয়ে ক্যামিলের প্রসংগ সুরু করবে। স্বামী ঠিক করেছেন, ক্যামিল চিরদিন ঘরেই থাকবে,—কিন্তু কী করে সে এখন তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা নড়াবে। শেভেলিয়ারই প্রথম কথা বলল, স্ত্রীকে জানাল পরিবারিক এক জরুরী ব্যাপারে তাকে একবার হল্যাণ্ডে যেতে হবে,—কাল ভোরেই যেতে হবে।

সেসিল খুব সহজেই তার মতলব বুঝল। শেভেলিয়ার অবশ্যি স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবেওনি, তবু তার প্রাণের মধ্যে জেগে উঠছে একটা অদম্য বাসনা,—কিছুকাল দূরে সরে থাকবার একটা অনিবার্য আবশ্যকতা। সত্যিকার গভীর দুঃখে মানুষের প্রাণ চায় এমনি নির্জনতা, এমনি আড়াল,—আর্ত প্রাণীরাও চায়।

তার এই সংকল্পে স্ত্রী কোনো বাধা দিল না, কিন্তু নতুন ব্যথা

মুচড়ে উঠল তার বুকে। ক্লান্তির অছিলায় ধপ্ করে বসে পড়ল একটা বেঞ্চিতে। করুণ স্বপ্নে যেন ডুবে রইল কিছুক্ষণ, শেষে স্বামীর হাত ধরে ফিরে এল ঘরে।

শান্ত নীরব সেসিল। নিজের ঘরেই চোখের জল ফেলে আর প্রার্থনা করে কাটিয়ে দিল সমস্ত দিন। সন্ধ্যার সময় সে ঘোড়ার গাড়ী যুতে রাখতে বলল এবং স্বামীকেও বলে পাঠাল, সেও তার সাথে আসে যেন।

সহজ সুন্দর হ'ল ক্যামিলের পোশাক। কারুকাজ করা শাদা মসলিনের গাউন, শাদা সাটিনের জুতো, সুন্দর একটি কণ্ঠহার, চুলে ভায়লেট গুচ্ছ। সাজিয়ে দিলে পর সেসিল তার মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাসভরে বলতে থাকে, "ক্যামিল আমার, কী সুন্দর তুমি!" শেভেলিয়ারও এসে যোগ দেয়, স্ত্রীর হাতে হাত বাড়িয়ে দেয়। তিনজনে চলল এবার নাচের আসরে।

জনসমাজে ক্যামিলের এই প্রথম উপস্থিতি, চারিদিকেই সে জাগিয়ে তুলেছে বিপুল আলোড়ন। দৃশ্যতই শেভেলিয়ার বিব্রত ও পীড়িত বোধ করছে; বন্ধুরা ক্যামিলের রূপের প্রশংসা করছিল,—কিন্তু তার মনে হ'ল তারা তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে। এবং এই সান্ত্বনা তার কাছে মোটেই রুচিকর নয়। তবুও তার গর্ব ও আনন্দ হ'ল। অদ্ভুতরকম জড়ানো তার চিন্তাজাল। মাথা হেলিয়ে ঘরের সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে ক্যামিল বসল এসে মায়ের পাশে। বিস্ময়-গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল সমস্ত ঘর। ক্যামিলের নিরালা প্রাণটির মৌনমধুর আবরণটুকুর চেয়ে কমনীয় আর কী হতে পারে! তার তনুলতা, তার মুখখানি, দীর্ঘ কুঞ্চিত চুলের গোছা, সর্বোপরি অনিন্দ্য সুন্দর চোখ দুটি সবারই বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। তার উন্মুখ চাহনি কোমল বিহ্বলতায়

এত করুণ দেখায়! সবাই ঘিরে বসে সেসিলকে,—একটুখানি বিস্ময় ও উদাসীনতার পরেই তাদের মধ্যে জেগে ওঠে সহৃদয় সহানুভূতি! এমন লাবণ্য দেখেনি কেউ কোনোদিন। অতুলনীয়া সে,—তার সংগে তুলনা করার দ্বিতীয়টি মেলে না কোথাও। সবার কাছেই আজ বিজয়িনী সে।

চিরদিনই শান্ত স্বভাবের মানুষ সেসিল। আজ তার প্রাণ ভরে উঠেছে জীবনের নিবিড় মধুর আনন্দে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিনিময় হ'ল মিষ্টি একটি হাসি,—অবিরল অশ্রুর চেয়েও তা মর্মস্পর্শী।

শেভেলিয়ার তখনো অনিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিল তার মেয়ের দিকে। এদিকে সুরু হ'ল পল্লী-নৃত্য। ক্যামিল একদৃষ্টে চেয়ে আছে, তার চোখে লুকিয়ে রয়েছে যেন কোন বিষাদের ছায়া। একটি ছেলে তাকে নাচতে ডাকছিল, কিন্তু উত্তরে সে একটু মাথা নাড়ল শুধু, অমনি ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল চুলের ফুলগুলি। সেগুলি তুলে নিয়ে মা আবার তা নিখুঁত হাতে গোছা করে বেঁধে দিল। এবার স্বামীকে খুঁজতে লাগল সেসিল; কিন্তু কৈ, কোথাও তো নেই সে! সে চলে গেছে কি না এবং গাড়ীতেই চেপে গেছে কি না খোঁজ নিল সে। না, পায়ে হেঁটেই গেছে সে সোজা বাড়ীতে।

(৫)

শেভেলিয়ার ঠিক করল, স্ত্রীকে না জানিয়েই বাড়ি ছেড়ে যাবে, এ নিয়ে কারো সংগে কোনোরকম আলাপ আলোচনা করার রুচি নেই তার। কিছুদিনের মধ্যে ফিরছেই যখন,—মুখে না বলে চিঠি রেখে গেলেই হবে। বিষয়-আশয় সম্পর্কেই তাঁর এই বিদেশ যাত্রা,—কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্য থাকলেও তাই আসল কথা নয় মোটেই। তাঁর

এক বন্ধু নাকি লিখেছে তাড়াতাড়ি করে রওনা হতে, যা হোক একটা অছিলা পাওয়া গেল তো! সংক্ষিপ্ত পথ ধরে সোজা সে বাড়ি ফিরে এল, তার বিদেশ যাত্রার কথা চাকরদের জানিয়ে জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হ'ল শহরের মুখে। কোনো দিকে দৃকপাত না করেই চলে গেল সে।

তবু, কেমন একটা অপরাধের অস্বস্তিময় চেতনা তাকে বারবার যেন খোঁচা দিতে লাগল। সে ঠিকই জানে, তার এই ব্যবহারে সেসিল ব্যথা পাবে।

শেভেলিয়ার নিজেকে তবু বুঝিয়ে রাখছিল, তার এই বিদেশযাত্রা কাজের খাতিরেই তো, তার চেয়ে তার স্ত্রীর স্বার্থও তো কম নয়। যা হোক, সে তো বেরিয়েই পড়েছে।

ইতিমধ্যে সেসিল গাড়ী করে ছুটে আসছিল বাড়ির দিকে। হাঁটুর উপরে ঘুমিয়ে পড়েছে ক্যামিল, অমন নিষ্ঠুরভাবে তাদের একা ফেলে চলে যাওয়ায় আহতই হয়েছে সে, জনসমাজে তাকে ও তার মেয়েকে একটু অপমানিতই করা হয়নি কি? নতুন রাস্তাটার উপর দিয়ে ঝং ঝং শব্দে গাড়িটা যেতে থাকলে নানা দুশ্চিন্তায় তার মন ভারী হয়ে উঠল। "ভগবান দেখছেন সবাইকে। কিন্তু আমার কি দশা হবে, হতভাগ্য সন্তানেরই বা কি হবে?"

শারদোনের কাছেই পেরোতে হবে ছোট একটা নদী। পুরো একমাস ধরে বৃষ্টি হয়ে গেছে,—প্রবল উচ্ছ্বাসে কূল ছাপিয়ে উঠেছে নদী। খেয়ামাঝি গাড়িটাকে নৌকোয় তুলতে রাজি হ'ল না,—লোকজন ও ঘোড়াটাকে ওপারে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নিতে পারে সে, কিন্তু গাড়িটাকে নয়। অথচ স্বামীর কাছে সেসিলের পৌঁছুতে হবে এক্ষুণি, গাড়ি থেকে সে কিছুতেই নামবে না। বিলম্বিত কয়েকটি মিনিট, কিন্তু সে যেন একযুগ।

মাঝগাঙে প্রবল স্রোতের টানে নৌকো ছুটে চলল বিপথে। মাঝি সাহায্য চাইল সহিসের। অদূরেই মারাত্মক ঘূর্ণী! সেখানে নৌকো এসে পড়লে রক্ষা নেই আর।

সহিসও নেমে এসে প্রাণপণে কাজে লাগল, কিন্তু তার হাতে একটা মাত্র বৈঠা। অন্ধকার রাত, ভয়ানক বৃষ্টির মধ্যে সবাইর দশা হয়েছে ঠিক অন্ধের মতো,—সামনেই হঠাৎ গর্জে উঠল মরণ-সংকেত! সেসিল গাড়ীর জানালা খুলে আঁৎকে উঠল—"তাহলে রক্ষা নেই আর?" তখনি ভেঙে গেল বৈঠাটা। সহিস ও মাঝি দুজনেই ক্ষত বিক্ষত দেহে এলিয়ে পড়ল নৌকোর মধ্যে।

খেয়ামাঝি সাঁতরাতে জানে, সহিস জানে না। কিন্তু এক মুহূর্তও সময় নেই আর। "পিয়ার?"—সেসিল খেয়ামাঝিকে ডেকে বলল—"আমার মেয়েকে আর আমাকে বাঁচাতে পারবে।"

"পারব।"—ও ভাবে প্রশ্ন করায় তার পৌরুষে আঘাত লেগেছে যেন।

"আমরা কি করব?"

"আমার কাঁধে আশ্রয় নিন।" খেয়ামাঝি বলল—"হাত দিয়ে আমার গলা আঁকড়ে ধরুন। মেয়েটিকে ধরে রাখব একহাতে, ডুবে যাবার ভয় নেই। ওই যে ওপারের মাঠটা আর কত দূরই বা!"

"আর জিন?"

"তাকেও দেখছি। ঘূর্ণীর কাছে মিলের থামটা ধরতে পারলে ফিরে এসে নিয়ে যাব তাকে।"

দুটি বোঝা নিয়ে পিয়ার এগোতে লাগল প্রাণপণ শক্তিতে,—কিন্তু নিজের শক্তির উপর বড় বেশী আস্থা রেখেছে সে,—সে তো এখন আর যুবক নয়। তীরও বহুদূরে, স্রোতও যে এতটা প্রবল আগে সে তা বোঝেনি। বীর পুরুষের মতোই সে উন্মত্ত জলস্রোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করছিল, কিন্তু তবুও প্রায় ভেসে যাবার উপক্রম হ'ল। এমনি সময় অন্ধকারের মধ্যে জলে-ঢাকা একটা উইলো গাছের গুঁড়িতে হঠাৎ তার কপালে প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগল, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, ঘোলাটে হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি।

"শুধু শুধু আমার মেয়েকে বাঁচতে পারো,—আমাকে ছেড়ে দিয়ে?"—মা বলে উঠল।

"বলতে পারি না, তবে বোধহয় পারি।"

ক্যামিলের মা মাঝির গলা থেকে হাতের বাঁধন ছেড়ে দিল, নিজে সে তলিয়ে দিল অথই জলে।

খেয়ামাঝি ক্যামিলকে নিরাপদে তুলে এনেছে ওপারের মাঠে, সহিসকে বাঁচিয়ে এনেছে এক কিষাণ। এবারে সহিস ও মাঝি মিলে সেসিলকে খুঁজতে লাগল। পরদিন ভোরে নদীর কিনারায় পাওয়া গেল তার মৃত দেহ!

(৬)

মার শোকে ক্যামিলের যা দুর্দশা হ'ল তা দেখে চোখের জল সামলান অসম্ভব। পাগলের মতো আর্তনাদ করতে করতে সে ছুটাছুটি করতে লাগল, চুল ছিঁড়ল নিজহাতে, মাথা কুটতে লাগল দেয়ালের গায়ে। এই ভয়ানক শোকের বেগ কমে এলে সে পড়ে রইল মড়ার মতো,—তার চেতনাই যেন লোপ পেয়ে গেছে।

তখন একদিন গিরাদ কাকা এলেন ক্যামিলের কাছে,—'হায়রে অভাগী মেয়ে! মা নেই, বাবা তো থেকেও নেই। সেই শিশুকাল থেকেই মেয়েটাকে আমি ভালবাসি, এখন এর ভার নেব নিজের হাতেই। জায়গা বদলালে হয়তো ও বেঁচে উঠবে নতুন করে।" পত্র মারফৎ

শেভেলিয়ারের অনুমতি পেয়ে ক্যামিলকে নিয়ে চলে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। শেভেলিয়ার ফিরে এল শারদোনেতে, নির্জন নির্বাসনে থাকে সে আজকাল, নিজের শোক ও অনুশোচনার রাজ্যে। কারো সংগেই আর দেখা করার প্রবৃত্তি হয় না তার।

গড়িয়ে গেল একটা বছর। গিরাদ কাকা ক্যামিলের ভাঙা মন এখনো জোড়া দিতে পারেননি। সবকিছুতেই উদাসিনী সে। একদিন শেষে তিনি ঠিক করলেন—ক্যামিলকে নিয়ে যাবেন থিয়েটারে। এই উপলক্ষে সুন্দর দেখে নতুন রকমের পোশাক কেনা হ'ল। নিজেকে এই পোশাকে আয়নার মাঝে দেখতে পেয়ে ক্যামিলের খুশি আর ধরে না! মুখে ফুটে উঠল হাসি,—গিরাদ কাকার প্রাণও ভরে উঠল পরম তৃপ্তিতে।

(৭)

গানবাজনা ক্যামিলের ভালো লাগে না আর। অভিনেতা, গায়ক, দর্শক,—সবাই যেন তাকে উদ্দেশ করে বলে :

"আমরা কথা বলি,—তুমি বলতে পারো না আমরা শুনি, হাসি, গান গাই আর খেলি। তোমার আনন্দ নেই কিছুতেই, কিছুই শুনতে পাও না তুমি। তুমি পাষাণমূর্তি বিশেষ,—তুমি একটা অর্থহীন অস্তিত্বমাত্র,—জীবনের পথে অসহায় এক দর্শক শুধু।" অভিনয় যেন অসহ্য বিদ্রূপ! অভিনয়ের সামনে চোখ বুজে রইল সে, মনে পড়ল তার ছেলেবেলার কথা। মনে মনে চলে যায় সে তাদের পল্লী-নীড়ে, বুকের মধ্যে ভেসে ওঠে তার মায়ের মুখখানি। আর যে সহ্য করা যায় না। গিরাদ কাকা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে চেয়ে দেখেন ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে ক্যামিলের গালের উপর। কেন

কাঁদছে জানতে চাইলে ইঙ্গিত করে জানায়—বাড়ী যাবে সে। গিরাদ কাকা 'বক্সের' দোর খুললেন।

ঠিক তখনি নতুন কিছু একটা তার চোখে পড়ল। দামী পোশাক-পরা সুন্দর একটি যুবক শাদা পেন্সিল দিয়ে প্লেটের উপর আঁক বা রেখা টানছে, সেটা বারবার তার পাশের লোকটিকে দেখাচ্ছে এবং সেও সংগে সংগে বুঝে নিয়ে উত্তর লিখে দিচ্ছে একইভাবে। দুজনেই ইঙ্গিত বিনিময় করছে।

ক্যামিলের মনে জেগে উঠল এক নতুন উৎসাহ, নতুন আগ্রহ। ইতিমধ্যে সে লক্ষ্য করেছে,—যুবকটির ঠোঁট নড়েনি একবারও। সে নিশ্চয়ই এক নতুন ভাষা বলে, সবার ভাষা থেকে তা আলাদা। কথা বলা ছাড়াও মনের ভাব প্রকাশ করার অন্যপথ সে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু সেই পথ তার কাছে এত দুর্বোধ, এত দুরারোহ। আরো দেখবার একটা দুর্নিবার আগ্রহে তাকে পেয়ে বসল। বক্সের প্রান্তে এসে ঝুঁকে পড়ে সে নিখুঁত নজরে লক্ষ্য করতে লাগল এই অপরিচিত যুবকটির প্রত্যেকটি ভঙ্গী। যুবকটি আবারো কিছু একটা লিখে সংগীর হাতে দিতে যাচ্ছিল—মেয়েটি যেন সেটা নিতে হাত বাড়িয়ে দিল! যুবকটিও হঠাৎ ক্যামিলের দিকে ফিরে তাকাল। চোখাচোখি হ'লে দুজনের চোখেই ফুটে উঠল একই ভাষা,—"দুজনেই এক আমরা, দুজনেই বোবা!"

গিরাদ কাকা যাবার জন্যে তৈরী,—কিন্তু ক্যামিল নড়ছে না আর। আবারো বসে পড়ে সে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

তখনকার দিনে এ্যাবি-দ্য-লে-পি নতুন জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন। মূক ও বধিরদের জন্যে নিবিড় সহানুভূতিতে এই সাধুপুরুষ আবিষ্কার করেছেন এক ভাষা,—লেবনিজেটার চেয়ে আরো উন্নত সেই পদ্ধতি।

মূক বধিরদের লিখতে পড়তে শিখিয়ে তিনি মানুষ করে তুলছিলেন। কারো সাহায্য না পেয়েও তিনি তার এই আর্ত অসহায় ভাইদের জন্যে একাকী জীবন বিসর্জন দিচ্ছিলেন।

যে যুবকটি ক্যামিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেও সেই সাধুপুরুষ এ্যাবির প্রথম ছাত্রদের মধ্যে একজন। মার্কুইস্ দ্য মব্রের ছেলে সে।

(৮)

ক্যামিল বা তার কাকা এই সাধু এ্যাবির বা তাঁর এই পদ্ধতির কথা বিন্দুবিসর্গও জানত না। ক্যামিলের মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই সে সব খোঁজ নিয়ে দেখত। কিন্তু শারদোনে প্যারী থেকে অনেক দূর,—তা ছাড়া, শেভেলিয়ার পত্রিকাও রাখে না, রাখলেও পড়ে না। কাজেই, কয়েক মাইলের ব্যবধান, একটুখানি আলস্য বা কারও মৃত্যু—কারণটা যাই হক না সবকিছুর ফল হয় একই।

থিয়েটার থেকে ফিরে ক্যামিলের মনপ্রাণ জুড়ে রইল একটিমাত্র চিন্তা। কাকাকে বুঝিয়ে দিল, সে লিখবার জিনিষ চায়। বৃদ্ধ খেতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অমনি ছুটে গিয়ে নিয়ে এলেন একটা বোর্ড ও চক।

ক্যামিল হাঁটুর উপরে বোর্ডটা রেখে কাকাকে ইঙ্গিত করে বলল পাশে বসে একটা কিছু লিখে দিতে। মেয়ের বুকের উপরে তিনি আঙুল দিয়ে আলগোছে লিখে দিলেন একটা নাম—'ক্যামিল', তারপর তৃপ্ত মনে খেতে গেলেন।

ক্যামিল সংগে সংগেই বোর্ডখানা নিয়ে চলে এল নিজের ঘরে। পোশাক খুলে রেখে চুলটা ছেড়ে দিয়ে বসল সে, প্রাণপণে কাকার লেখাটি নকল করতে লাগল; নিখুঁত ভাবে সে রচনা করতে লাগল তার প্রথম পাঠ। ক্যামিলের কাছে এই লেখাটির মূল্য যে কতখানি কে বলবে?

জুলাইয়ের সুন্দর রাত। জানালা খুলে দিয়েছে ক্যামিল। নিজের খেয়াল-খুশি কাজের মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সে বাইরে। বাইরের দৃশ্য অবশ্যি খুবই একঘেয়ে! জানালার সামনে উঠানটাতে ঘোড়ার আস্তাবল, পাঁচ ছ'টা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে উঠানের মাঝখানে,—ঘোড়াগুলি যেন কার প্রতীক্ষায় আছে। দূরে শোনা যাচ্ছে কার পায়ের শব্দ! উঠানটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা, বাইরের দোরটাও বন্ধ।

ক্যামিল হঠাৎ দেখে,—আঙিনার ছায়ার মানুষের মতো কি একটা যেন পায়চারি করছে। কেমন একটা অস্পষ্ট ভয়ে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। যুবকটি তার জানালার দিকেই উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছে! এক পলকের মধ্যেই ক্যামিল ফিরে পেল তার হারানো সাহস। বাতি হাতে সে ঝুঁকে পড়ল জানালার বাইরে, আলো হয়ে উঠল সমস্ত উঠান। মার্কুইস দ্য মব্রে? হ্যাঁ সে-ই! ধরা পড়ে গেছে দেখে সে করজোড়ে ক্যামিলের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর চটপট গাড়ীর উপর উঠে দেয়াল ধরে ধরে এসে ঢুকল ক্যামিলের ঘরে। এসে প্রথমেই সে মাথা নোয়াল। ক্যামিলের সংগে কথা বলতে চাইছিল সে, ক্যামিলের নাম লেখা বোর্ডটা চোখে পড়তেই একটা চক নিয়ে তার পাশেই লিখতে গেল নিজের নাম—'পিয়ার'।

"কে, কে তুমি? এখানে কেন?" গর্জে উঠল কার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ। গিরাদ কাকা ঘরে ঢুকলেন। তিনি ভর্ৎসনা করছিলেন এই অন্যায় আগন্তুককে; মার্কুইস নীরবে বোর্ডটার উপর কিছু লিখে গিরাদ কাকার হাতে দিল। পড়তে পড়তে তাঁর চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

"কুমারী ক্যামিলকে ভালোবাসি আমি, তাকে বিয়ে করতে চাই। আমি হলাম মার্কুইস দ্য মব্রে, একে আমার হাতে সঁপে দেবেন কি?"

কাকার রাগ জল হয়ে যায়।

"সাবাস!"—আপন মনেই বলছিলেন তিনি। থিয়েটারে দেখেছেন এই যুবকটিকে, এবার চিনতে পেরেছেন—"চমৎকার! এরা ব্যবস্থাটি করেছে ভালোই,—সত্যিই এমনটি আর কোথাও দেখিনি আমি। এই বোবা জীব দুটি আমাকে অবাক করেছে।"

(৯)

সত্যিকারের ভালোবাসা এগিয়ে চলল সহজ পথে। এই বাঞ্ছিত পরিণয়ে শেভেলিয়ায়ের সম্মতি পাওয়া গেল অনায়াসেই। কিন্তু এই কথাটা তাকে বোঝানো গেল না যে শিক্ষাগুণে মূক ও বধিরেরাও কথা বলতে পারে। তবু চোখকে বিশ্বাস না করে উপায় কী? দু'তিন বছর পরে ক্যামিলের কাছ থেকে চিঠি এল একটা; "বাবা এখন আমি কথা বলতে পারি, মুখ দিয়ে নয়, হাত দিয়ে।"

জানাল সে, কি ভাবে লিখতে শিখেছে, কার কাছে হয়েছে তার নতুন বাণীর জন্ম। সেই এব্বি দ্য লেপি! তার খোকন কেমন হয়েছে তাও লিখেছে, বারবার করে একান্ত অনুরোধ জানিয়েছে, তিনি একটিবার যেন তাঁর দাদুকে এসে দেখে যান।

চিঠি পেয়ে শেভেলিয়ার দোমনা হয়ে থাকে বহুক্ষণ। গিরাদ কাকার কাছে উপদেশ চাইলে তিনি বললেন, "কিছু না ভেবেচিন্তে চলে যাও। সেই নাচের আসরে স্ত্রী ও মেয়েকে রেখে এলে,—তোমার অনুতাপ হয়নি এখনো? তোমার দাদুকেও কি ত্যাগ করতে চাও নাকি? চলো, দুজনেই যাই। আমাকেও আমন্ত্রণ না করাটা ক্যামিলের পক্ষে খুবই অকৃতজ্ঞের মতো কাজ হয়েছে।"

শেভেলিয়ার ভাবল, "ঠিকই বলেছেন গিরাদ কাকা, আমি অকারণেই দুটি আদর্শ নারীকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়েছি। কোথায় আমি

তাদের রক্ষক হব, আর তা না হয়ে আমিই তাদের সর্বনাশ ডেকে আনলাম। ক্যামিলের সাথে দেখা করায় যদি ব্যথা পাই তবুও সে শাস্তি আমার প্রাপ্য। এই কঠিন আনন্দ আমি হাসিমুখে গ্রহণ করব, দেখতে যাব আমার দাদুমণিকে।"

(১০)

রাস্তার পাশে একটা চমৎকার বাড়িতে এসে তারা ক্যামিল ও পিয়ারকে দেখতে পেলেন। টেবিলের উপরে বই ও ফোটো। স্বামী পড়ছিল, স্ত্রী করছিল সূচীকাজ। ছেলেটি খেলছিল কার্পেটের উপরে। নতুন আত্মীয়দের দেখে মার্কুইস সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। বাবার কাছে ছুটে এল ক্যামিল; শেভেলিয়ার মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরল, চোখের জল আর বাধা মানছিল না। এবারে সে খোকাটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। হঠাৎ কেমন একটা বিতৃষ্ণা জেগে উঠল। ক্যামিলের উপরের সেই বিতৃষ্ণাই যেন আজ নতুন করে জেগে উঠেছে, উত্তরাধিকার-সূত্রে শিশুটিও তার মা'র সবকিছুই পেয়েছে!

"আরও একটি বোবা!" হঠাৎ শেভেলিয়ার বলে ফেলল। ক্যামিল ছেলেকে দুহাতে তুলে ধরল তার দাদুর সামনে, তার বাবা কিছু না বললেও সবই বুঝতে পারছে সে। ক্যামিল শিশুটির পাতলা ওষ্ঠের উপরে তার নিজের আঙুল রাখল, ধীরে ধীরে চাপ দিল একটু,—যেন কথা বলার জন্যে পীড়ন করছে বারবার। এবং কিছু পরেই স্পষ্টভাবে সে উচ্চারণ করল মা'র শেখান দুটি কথা!

"বা-বা, বা-বা!"

গিরাদ কাকা বললেন,—"ভগবান মঙ্গলময়, তিনি সবারই মঙ্গল করেন। এবার বুঝলে তো?"

থিওফিল গ্যতিয়ের (১৮১১-১৮৭২)

ইনি রোমান্টিক স্কুলের সবচেয়ে বেশী রোমান্টিক, অন্তত তাই মনে করতেন নিজেকে। দুনিয়াকে দেখতেন ইনি সজাগ ইন্দ্রিয় দিয়ে,—শব্দ স্পর্শ গন্ধ গানে! একান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এঁর কল্পনা, এই কল্পনা প্রাণের অনুভূতির বেগে চলে না,—চলে রূপের টানে। শব্দের যাদুকর ইনি। এঁর সর্বপ্রিয় গ্রন্থ হল 'অভিধান'। নতুন নতুন শব্দরত্ন ইনি সঞ্চয়ন করে নিতেন এই সমুদ্র থেকে। ফরাসী সাহিত্য রাজ্যের 'পিওর আর্টিষ্ট'। "আর্টস ফর আর্ট'স সেক" এঁর রচনার মন্ত্রবাণী। "লেকের পারে প্রমোদ ভবন" গল্পটির মধ্যে ফুটে উঠেছে গ্যতিয়েরের ছবি আঁকবার অদ্ভুত প্রতিভা ও নিখুঁত আঙ্গিক বোধ।

লেকের পারে প্রমোদ ভবন

—গ্যতিয়ের

কান্টেন শহর থেকে কিছুটা দূরে পাশাপাশি বাস করতেন দুজন ধনী ব্যক্তি, দুজনেই অবসর প্রাপ্ত রাজ কর্মচারী। তাউ ও কাউয়ান,—দুটি বন্ধু। তাউ বিজ্ঞান বিভাগে বেশ নামজাদা একটা পদ লাভ করেছিলেন, জেসপার চেম্বারের সভ্য ছিলেন তিনি। কাউয়ান আরো নিম্নজাতীয় ব্যবসার প্রসাদে অর্জন করেছেন বিপুল সম্পত্তি এবং যথেষ্ট খ্যাতি।

এই চীনা ভদ্রলোক দুজন ছিলেন পরস্পরের দূর আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শৈশবে বন্ধুদের সাথে তাঁরা খেলাধূলা করতেন, শরতের সন্ধ্যে-বেলা কাটাতেন কাগজের উপর কালির তুলি দিয়ে ফুল এঁকে; ফুলের সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা লিখে উৎসব করতেন এবং তার সাথে সাথে পান করতেন দুএক পাত্র সুরা। শৈশবে এই দুটি চরিত্রে এত মিল থাকলেও বয়স বাড়বার সংগে সংগে ক্রমেই বিপরীত হয়ে দাঁড়াল। বাদাম গাছের একটা শাখা যেমন কিছুদূর পর্যন্ত সোজা বেড়ে উঠে ক্রমে একেবারেই আলাদা হয়ে পড়ে। একটা শাখা যখন বনে বনে ছড়িয়ে দেয় তার অজস্র ফুলের সুরভি, অন্য ডালে তখনি সুরু হয় ঝরার পালা,—বাসি ফুল জমতে থাকে পাঁচিলের পাশে।

এক একটা বছর যাচ্ছে এবং তাউ আরো বেশী গম্ভীর হয়ে উঠছেন, দিনদিনই সযত্নে বেড়ে উঠছে তার বিশাল ভুঁড়িটি। চিবুকের স্তর

তিনটিতে ফুটে উঠেছে গাম্ভীর্যময় তিনটি বৈশিষ্ট্য! শুর তিনটি ঠিক সিঁড়ির মতোই! দিনরাত তিনি যেসব নীতিবাক্য রচনা করেন তা বুদ্ধ-মন্দির প্যাগোডার দেয়ালে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখারই যোগ্য। কাউয়ান কিন্তু বয়সের সাথে সাথে বরং হাসিখুশিই হয়ে উঠেছেন, ভাবে বিভোর হয়ে গান করতে থাকেন—সুরা ফুল আর পাখীদের নিয়ে। স্থূল জীবনের ঝামেলা থেকে মুক্ত তাঁর মন। কবিতায় সার্থক করে তুলবার মতো কোনো শব্দ পেলেই তাঁর কলম আর বসে থাকে না।

কিন্তু একে একে দুই বন্ধুর মধ্যে বেড়ে উঠল শত্রুতা, এ ওঁকে খোঁচা দিতে ছাড়েন না; তাঁরা যেন দুটি কাঁটা গোলাপ গাছের মতোই পাশাপাশি বাড়তে লাগলেন। অবস্থা এমন চরমে গিয়ে ঠেকল যে তাঁরা সব রকমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেনা, দুজনেই নিজ নিজ বাড়ীর সামনে টাঙিয়ে দিলেন এক একটা বিজ্ঞাপন।

পাশের বাড়ীর কোনো লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ! নিজ নিজ বাড়ী আর কোথাও উঠিয়ে নিতে পারলে গায়ের জ্বালা মিটত দুজনেরই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা সম্ভব হয়ে উঠল না। এমন কি সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বেচে ফেলতেও রাজিই ছিলেন তাঁরা,—কিন্তু উপযুক্ত দাম দিতে চায় না কেউ। তা ছাড়া, তাঁদের বাড়ীতে কত আসবাব পত্র! মহামূল্য পালংক, দুগ্ধ শুভ্র টেবিল, স্বচ্ছ জানালা, বাঁশের চেয়ার, চীনামাটির বিচিত্র পাত্র,—কালো ও লাল পাথরের ডেস্ক, কবিতার গুচ্ছ, কত কী! কত সযত্নে মনের মতো করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বাড়ী,—ঐসব কি ছেড়ে যাওয়া যায়? যে বাগানে নিজের হাতেই লাগিয়েছেন উইলো, পীচ ও কুল গাছের সারি,—যে বাগানে প্রতিটি বসন্তে দেখেছেন তাঁরা অপরূপ চেরী ফুলের বাহার,—তা কি কোনো অপরিচিতের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়? এর প্রত্যেকটি জিনিষই মানুষের প্রাণের সঙ্গে

সোনালি বাঁধনে বাঁধা, কিন্তু ছিঁড়তে গেলে মনে হয়, তা লোহার শেকলের চেয়েও শক্ত !

তাউ ও কাউয়ান যখন বন্ধু ছিলেন, দুজনেই লেকপ্রান্তের বাগানটিতে একটি প্রমোদভবন রচনা করেছিলেন—নিজ নিজ জমির সীমানা মুখে। এই ভবনের ঝুল-বারান্দা থেকে দুই বন্ধুর আলাপ-সালাপ ও ভাব-বিনিময় চলত পাইপ টানতে টানতে। এটা ছিল তাঁদের পরম প্রিয় ভূমি। কিন্তু মনোমালিন্যের সুরু থেকেই তাঁরা লোকের মাঝা-মাঝি একটা প্রাচীর খাড়া করেছেন। কিন্তু লেকটা ভয়ানক গভীর বলে প্রমোদভবনটির সামনের দিকটা দাঁড়িয়ে ছিল জলস্থিত কয়েকটি থামের উপরে। থামগুলির তলা দিয়ে ছুটে চলেছে স্রোতের জল,—এবং তার উপরেই পড়েছে প্রমোদভবনটির ছায়া।

এই দালান দুটি ছিল তেতলা, বাঁক ছিল তাদের সিঁড়ি। অর্ধবৃত্তাকার ছাদ মাছের আঁশের মতো সুন্দর সুন্দর টালি দিয়ে সাজানো। থামে থামে আঁকা লতাপাতা ও ড্রাগন; দেয়ালে দেয়ালে তাউ-চি এবং লি-তাই-পের কবিতা খচিত রয়েছে সোনালি অক্ষরে। জানালা দিয়ে ভেতরে আসছে সবজে-নীল আলো, পাশে পাশে ঝুঁকে পড়েছে ফুলে ফলে ভরা ডাল। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কী সুন্দর তার রঙ বৈচিত্র্য। ঘরের কোনে কোনে কারুকাজ-করা রেশমের গালিচা। আরসীর মতো স্বচ্ছ টেবিল, তার উপরে সব সময়েই সাজানো রয়েছে কলম পাইপ পাখা তুলি ও রঙ,—ছবি আঁকতে বা কবিতা লিখতে হলে যা যা একান্ত দরকার। লেকের পারে সুন্দর সুন্দর নকল পাহাড়, জলের মধ্য থেকে উঠেছে উইলো ও আখরোট গাছ।

উইলো গাছ থেকে ঝুলতে থাকে ঝুরি ঝুরি সোনালি পাতা,

ঝরতে থাকে সোনালি ফুলের পাপড়ি—নিচে লেকের নীল জলে; লেকের বুকে আঁকা রয়েছে প্রমোদভবনের প্রতিচ্ছবি।

স্বচ্ছ জলের তলে নীল ও সোনালি আঁশওয়ালা মাছেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁক বেঁধে, শুভ্র মরালের দল তাদের মৃণাল কণ্ঠ বাঁকিয়ে দিচ্ছে এদিক ওদিক। লেকের হীরক-স্বচ্ছ জলের তলে বড় বড় পদ্মপাতা মেলে আছে উন্মুখ হয়ে; নিচ দিয়ে একটা ঝর্ণা এসে লেকটাকে কানায় কানায় ভরে রেখেছে। লেকের তলদেশ রূপোলি বালুর। আর একটা ফোয়ারা রয়েছে লেকের মাঝখানে। তাই সেখানটা সব সময়েই চঞ্চল,—কোনো জলশস্প বা শ্যাওলা জমতে পারেনি সেখানে। লেকের চারপাশ শ্যামল সুন্দর আস্তরণে ঢাকা,—যেন একটি মখমলের শয্যা বিছানো।

দুই প্রতিবেশীর শত্রুতার জন্যে একটা বিরাট প্রাচীর মাঝখানে না তোলা হলে এর চেয়ে মনোরম, এর চেয়ে চিত্রোপম কানন সমস্ত চীনদেশেও দেখা যেত না। চীনই তো হল পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ!

প্রতিবেশীর সম্পত্তি বেদখল করার ইচ্ছা দুজনেরই প্রবল। কিন্তু তাউ ও কাউয়ান তাঁদের সমস্ত বাদ বিসম্বাদের ফলস্বরূপ লাভ করলেন শুধু এক একটা পাঁচিল! এবং তাই আড়াল করে রাখল পরস্পরের প্রমোদ-ভবনের সুন্দর দৃশ্যটি। এভাবেও এক রকমের ক্ষতি করা হল বৈ কি!—এই বলে তাঁরা নিজেদের সান্ত্বনা দেন।

এমনি করে কাটল কয়েক বছর। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাতায়াতের পথটি ভরে উঠল আগাছায় জংগলে। কাঁটা-ঝোপের ডালগুলি এসে ঝুলে পড়ল পথের উপর, তারাও যেন সবরকম যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দিতে চাইছে, তারা যেন এই দুই পুরাণো

বন্ধুর বাদবিসম্বাদের কথা টের পেয়ে তার মধ্যে অংশ নিচ্ছে,—দুজনকে আরো আলাদা করে রাখতে সাহায্য করছে।

এরপর তাউ ও কাউয়ান দুজনেই সন্তান লাভ করলেন। মাদাম তাউর হ'ল অনিন্দ্য সুন্দরী একটি মেয়ে, আর মাদাম কাউয়ানের হ'ল অপূর্ব সুন্দর একটি ছেলে। দুটি ঘরই আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠল। কিন্তু এ ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। দুজনের বাড়িই পাশাপাশি, তবু দুজনেই থাকে যেন দুই দূর দেশে। তাদের মাঝখানে যেন এক অপরিচয়ের সমুদ্র, একটা অলঙ্ঘ্য পর্বত প্রাচীর। পরিচিত লোকজন বা বন্ধুবান্ধবেরা পাশের বাড়ির কারো নাম ভুলেও উচ্চারণ করে না; চাকরদের উপরে কড়া আদেশ—কখনো ওদের সংগে দেখা হলে কথা বলতে পারবে না;—বলেছে কি, পিঠের চামড়াই তুলে ফেলা হবে। ছেলেটির নাম রাখা হল চিনসিং, আর মেয়েটির নাম জু কাউয়ান অর্থাৎ মানিক ও নীলা। শিশু দুটির নিখুঁত সৌন্দর্য তাদের এই নামের পক্ষে সম্পূর্ণই যোগ্য। দু চার পা হাঁটতে শিখেছে থেকেই লেকটার মাঝখানের পাঁচিলটা তাদের নজরে পড়ল। জলের উপরকার ঐ পাঁচিলটার ওপারে কি আছে? প্রায়ই তারা বাবা মাকে জিজ্ঞেস করে—ওপারে ঐ যে গাছটার মাথা একটুখানি দেখা যাচ্ছে ওটা কাদের গাছ? তাদের বলে দেওয়া হয়,—"ওটা একটা মাথা পাগলা গেঁয়ো ভূতের বাড়ী। ও বাড়ীর সবাই ভয়ানক ছোটলোক। অমন বদ প্রতিবেশীর মুখদর্শন যাতে না করতে হয়, তাই ঐ পাঁচিলটা তোলা হয়েছে।"

ছোটদের কাছে এটিই যথেষ্ট ব্যাখ্যা। তারা পাঁচিলটা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেল,—এখন আর ও বিষয়ে কিছু জানবার আগ্রহও প্রকাশ করে না। জু কাউয়ান রূপে গুণে বেড়ে উঠতে লাগল দিন দিন। মেয়েদের যতরকম গুণ থাকতে পারে, সবই আছে তার; সূচিকাজে তার আঙুল

চলে ম্যাজিকের মতো, সার্টিনের উপর তার হাতে আঁকা প্রজাপতি দেখে মনে হয় তা যেন ডানা মেলে উড়ে যেতে চাইছে। জু কাউয়ানের গুণের পরিচয় এইটুকুই নয় শুধু। ভগবদ্বানী আগা-গোড়াই তার কণ্ঠস্থ। তার মতো এমন নরম হাতে অমন সুন্দর ছবি আর কেউ কোনোদিন আঁকতে পারেনি। তার কলম চলে চঞ্চল আবেগে,—এমন বেগে ছুটতে পারে না ঝর্ণাও,—উড়তে পারে না আকাশের পাখীও। কবিতার সব রকম বাণীভঙ্গীই তার নখাগ্রে! চাতকের প্রত্যাবর্তন, চৈতালী উইলো—এমনি সব বিষয় নিয়ে শত শত কবিতা লিখেছে সে! যে কোনো বিজয়ী রাজপুত্রের কাছেও সে অপরাজিতা!

চিন সিংও কম যায় না। পরীক্ষায় প্রথম হয় সে। প্রত্যেক মেয়ের মা'র কাছেই সে আদর্শ ভাবী জামাই। শিগগিরই হয়ে পড়বে সে নামজাদা লেখক। তবে চিন সিং বিয়ে করতে রাজি নয়। আরো কিছুদিন স্বাধীন ভাবেই ঘোরাফেরা করে কাটুক না। তাই, একে একে সে প্রত্যাখান করল অনেক সম্বন্ধ: হন গির্ত, লমেন লি, অমা, ওকো এবং আরো কত সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের! তখনো সে ভালোবাসার দিকে কিছুটা উদাসীন, তবে ঠিক নির্মম বলা চলে না। প্রাণটা যে তার দরদী তারও হাজার প্রমাণ আছে। তার মনে হয়, পূর্বজন্মের কোনো প্রিয়াকেই সে ভালোবাসে, সে যেন তারই পথ চেয়ে আছে! পাত্রীদের উইলো পাতার মতো ভ্রূ,—ছোট ছুটী পা ও মৌমাছির মতো সরু কোমরের কথা কত লোকে এসে তার কাছে সুপারিশ করে গেছে, কিন্তু সে অনাসক্তভাবে শুনে গেছে শুধু!

এদিকে জু কাউয়ানের বিয়েও সহজ ব্যাপার নয়,—তার সমস্ত ভণ্ড প্রার্থীদের সে তাড়িয়ে দিয়েছে। কারও নমস্কার ভঙ্গী অশোভন,

কারো বেশবাসে রুচির অভাব, কারো বা হাতের লেখা সাধারণ একটা লোকের মতোই,—কাঁচা লেখা। কেউ বা কবিতা পড়াশুনো করেনি অথবা ভুল করেছে ছন্দোবন্ধনে। সংক্ষেপে, সবারই কোনো না কোনো দোষ আছে। জু তখন তাদের সবাইকে ব্যঙ্গ করে এমন এক একখানা ছবি আঁকে যে তার বাবা মা হাসতে হাসতেই রেখে দেন সে প্রসংগ এবং তাদের ভদ্রভাবেই দেখিয়ে দেন বাইরে যাবার সদর দরজা। শষ পর্যন্ত কিন্তু ছেলে ও মেয়ের বাবা মায়েরাই প্রমাদ গুণলেন,—যে সম্বন্ধ আসে তাতেই গররাজী! মাদাম তাউ ও মাদাম কাউয়ান দিনরাত ভাবতে ভাবতে ছেলেমেয়েদের স্বপ্ন দেখলেন রাতে, বিশেষ করে একটা স্বপ্ন তাদের ভালোই লেগেছে। মাদাম কাউয়ান স্বপ্ন দেখলেন, তার ছেলের বুকের ওপর দুলছে একটি নীলা, জল জল করছে ঠিক একটি তারার মতো! মাদাম তাউ দেখলেন, তার মেয়ের গলায় একটি অনিন্দ্য সুন্দর মানিক। কিন্তু এই স্বপ্নের অর্থ?......দু'টী মহিলাই এই স্বপ্নকে নিজ নিজ সন্তানের শুভ-বিবাহের সূচনা বলে মনে করলেন। কিন্তু এদিকে চিন সিং ও জু কাউয়ানেরও ধনুর্ভঙ্গ পণ, এ সব স্বপ্ন বিশ্বাস করে না তারা!

ছেলেমেয়ের বাবারা—কাউয়ান ও তাউ অবশ্যি কোনো স্বপ্নই দেখেনি। নিজ নিজ ছেলেমেয়ের এহেন একগুঁয়েমিতে তাঁরা বিস্মিতই হয়েছেন। বিয়ে করতে ছেলেরা তো নারাজ হয় না সাধারণত। তা হ'লে,—আর কারো সংগে ভাব আছে নাকি?—না, তাও তো নয়। কোনো মেয়ের সংগেই তো পরিচয় নেই চিন সিংয়ের,—কোনো ছেলের সংগেই তো ভাব নেই জু কাউয়ানের। মাদাম তাউ ও মাদাম কাউয়ান কিন্তু তাদের স্বপ্নের ওপর বিশ্বাস রাখেন পুরোপুরি।

দুজনেই চলে যান কোয়ের মন্দিরে,—তবে আলাদা ভাবে নিশ্চয়ই!

দেবতার প্রত্যাদেশ হ'ল, নীলা ও মানিকের মিলনের মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান হবে। ছেলেমেয়ের মায়েরা চলে এলেন বাইরে, তাঁদের বিব্রত ভাবটা কিন্তু বেড়ে গেছে আরো।

একদিন জু কাউয়ান তাদের প্রমোদ-ভবনের ঝুল বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। চমৎকার দিন; এক টুকরো মেঘও নেই আকাশে,—নড়ে না গাছের একটি পাতাও,—শান্ত সরোবর মস্ত বড় একটি আয়নার মতো। কখনো বা দু' একটি মাছ খেলতে খেলতে লাফিয়ে ওঠে, আর শান্ত লেকের জলে চঞ্চল রেখাগুলো মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। পাড়ের গাছের সারি প্রতিফলিত হয় জলের বুকে, দেখে দেখে একেবারে সত্যি ব'লে ভুল হয়। ঠিক একটা বন যেন জলের মধ্যে ডুব দিয়ে রয়েছে! মাছগুলি সেই গাছের পাতার মধ্যে খেলে বেড়ায়। জু কাউয়ান এই সব স্বচ্ছ সুন্দর ছবি খুশি হয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে জলের ভেতর ওদিকের দালানটার ছায়া দেখতে পেল,—ছায়াটা এগিয়ে পড়েছে এই দিকেই।

এই ছায়াটি তো আর কোনদিনও তার চোখে পড়েনি! বিস্মিত হয়ে ঝুঁকে পড়ল সে, একে একে চোখে পড়ল লাল থাম, ওপাশের দালানটা, দেয়ালে লেখা কবিতাও সে পড়তে পারল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'ল ওদিকের ঝুল বারান্দায়ও ঠিক তার মতোই কে যেন হেলান দিয়ে আছে! ওদিকে না হলে নিজের ছায়া বলেই সে ভুল করে বসত। চিন সিং-এর ছায়াকে কি করে মেয়ের ছায়া বলে ভুল করত? বিস্মিত হবার নেই কিছুই। চিন সিং-এর মাথায় টুপি ছিল না; বয়স অল্প, মুখে নেই দাড়ি গোঁফের রেখা। তার তরুণ সৌন্দর্য সোনালি চুলের বাহার ও উজ্জ্বল চোখই এই ভুলের কারণ।

জু কাউয়ানের বুক কাঁপছে! সে বুঝল, ঐ ছায়া কোনো

মেয়ের নয়, তার ধারণা ছিল, তার যোগ্য কোনো ছেলে বুঝি সৃষ্টিই হয়নি! কতদিন সে ভেবেছে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে চলে যাবে কোন তেপান্তরের দেশে, খুঁজে আনবে তার অচিন প্রিয়তমকে। ভেবেছিল কোনাদিনই বুঝি তার ভাগ্য জুটবে না পরিণয়ের পরিতৃপ্তি! কারণ তার তুলনা বুঝি কোথাও নেই!

জলে ছায়াটি দেখে সে আজ বুঝল, তার রূপের দোসর আছে। খুবই খুশি হ'ল সে, রাগ হ'ল না। এতদিনের এত গর্ব আজ ভরে উঠল ভরা ভালোবাসায়। এবারে তার ভালোবাসা বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। এই চাঞ্চল্যটুকুর জন্যে তাকে দোষ দিও না। এক তরুণের ছায়া দেখেই প্রেমে পড়া পাগলামি বটে,...বহুদিন ধরে জানাশোনা হলেও বা মনের কতটুকু জানা যায়? একটুখানি বাহ্যিক পরিচয় মাত্র, আরশীর ছবির মতোই! তাই, বয়স দেখে বা কয়েকটি আঙুলের সৌন্দর্য দেখে ভাবী স্বামীর চরিত্র নিরূপণ করা ছাড়া উপায় কি?

চিন সিংও সেই অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়েটিকে দেখেছে। "আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি? এই অপরূপ তনুলতা কি বাসন্তী রজনীর ভিজে জ্যোছনায় গড়া, না ফুলের সৌরভে গড়া! একে না দেখলেও চিনতে পারি—আমার এই মানসীকে। আমার প্রাণে আঁকা আছে এরই প্রতিমা। এ আমার সেই মানসী—যার উদ্দেশে নিবেদন করি আমার ছবি, গান আর কবিতা।" চিন-সিং তখনো আপন মনে কথা বলে চলেছে, হঠাৎ সে তার বাবার ডাক শুনতে পেল।

"শোনো, এবারে বহু খোঁজাখুঁজি করে একটি চমৎকার মেয়ের সন্ধান এনেছে আমার বন্ধু উইং। রাজকন্যা সে, নামকরা সুন্দরী, স্বামীকে সুখী করবার জন্যে নারীর যত গুণ থাকা সম্ভব, সব কটিই আছে তার।"

চিনসিং-এর মনের মধ্যে তখনো ভেসে উঠছে সেই জলের ছবি। তাই সে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করে বসল; বাবা তো রেগে আগুন, তিনি ভীষণ ভয় দেখাতে লাগলেন।

"হতভাগা ছেলে! আরো একগুঁয়েমি করো তো পাঠিয়ে দেব বিদেশে এক বন্দীশালায়। চারদিকে দেখবে শুধু পাহাড়ের পর পাহাড় —আর কালির মতো কালো জল। তখন বুঝবে।"

কিন্তু সেও এত ভয় খাবার ছেলে নয়। সে বলল, এই মেয়েটি ছাড়া আর যাকে বলবেন তাকেই বিয়ে করবে।

পরের দিনও ঠিক সেই সময়েই সে এসে দাঁড়াল আগের জায়গায়, ঝুঁকে দাঁড়াল ঝুল বারান্দায়, কিছু পরেই জলের বুকে দীর্ঘতর হয়ে জু-র ছায়া পড়ল,—ঠিক যেন জলে ডুবে আছে এক তোড়া ফুল! চিন-সিং নিজের বুকে হাত রেখে আঙুলে চুমো খেয়ে সেই চুমো পাঠিয়ে দিল মেয়েটির ছায়ার দিকে। বিনীত প্রণয়ের ভঙ্গিমা সত্যিই অপরূপ!

স্বচ্ছ জলের বুকে একটি খুশির হাসি ফুটে উঠল—ফুটি ফুটি ডালিম কুঁড়ির মতো। চিন সিং বুঝল এই অচিনা সুন্দরীর অপ্রিয় নয় সে। কিন্তু প্রেমিক কখনো অদৃশ্য মানুষের ছায়ার সংগে বেশীক্ষণ ধরে কথা বলতে পারে না, ছেলেটিও তাই ইঙ্গিতে জানাল, সে কিছু লিখতে যাচ্ছে। দালানের মধ্যে এসে এক টুকরো রূপোলি কাগজ নিয়ে এসে সাতটি শব্দের এক কবিতা লিখে জানিয়ে দিল তার ভালোবাসার কথা, কাগজটুকু একটা ফুলের মধ্যে ভাঁজ করে রেখে পদ্মপাতার উপরে আলগোছে ভাসিয়ে দিল জলে।

সৌভাগ্যের কথা, তখনি বয়ে এল মিষ্টি হাওয়া। এবং থামের পাশ দিয়ে লিপিটি ভেসে আসতেই জু একটু ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল।

চকিত সুখে অভিভূত হবার ভয়ে সে প্রথমে এল তার নিরালা ঘরটিতে। সেই তরুণ প্রণয়ের ভাষা পড়তে পড়তে তার বুক ভরে উঠল খুশিতে। কী সুন্দর রূপক-কবিতা লিখেছে সে!

তার প্রাণ উথলে উঠেছে ভালোবাসা পেয়ে,—গুণী লোকের ভালোবাসা। তার রচনার সৌন্দর্য, শব্দ চয়ন, কবিতার নিখুঁত ছন্দ এবং চমৎকার রূপক—এই সব কিছুর মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার আশ্চর্য শিক্ষা-সংস্কৃতি। জু-র সবচেয়ে ভালো লেগেছে চিন সিং নামটি। অনেকবার সে মার মুখে শুনেছে এই মানিকের স্বপ্নের কথা; ভগবান তাকে আজ তার বুকে পরবার জন্যই পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারপরের দিন উল্টো হাওয়ায় জু কাউয়ান চিন সিং-এর মতোই পাঠিয়ে দিল কবিতার উত্তর। তরুণীর শোভন লজ্জা তারও যে নেই তা নয়, তবু সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে দয়িতার ভালোবাসা। চিঠিটার নিচেকার নামসইটা দেখে চিন সিং চমকে ওঠে,—নীলা! 'এই মহামূল্য মণি ঝলমল করছে আমার বুকে—কতবার স্বপ্ন দেখেছেন মা। এবারে নিশ্চয়ই আমি চলে যাব ঐ বাড়ীতে—ওখানেই আছে আমার প্রিয়তমা, আমার স্ত্রী!'

কিন্তু যাবার মুখেই মনে পড়ল, দুই পরিবারের মধ্যেকার বাদ-বিসম্বাদের কথা, ফটকের ফলকে লেখা সেই নিষেধবাণী। অগত্যা চিন সিং মার কাছে সব কথা খুলে বলল। জু কাউয়ান বলল তার মার কাছে। মানিক ও নীলা—নাম শুনেই মায়েরা বুঝল সব এবং মন্দিরে এল প্রত্যাদেশের জন্যে। পুরুত বললেন স্বপ্নের অর্থের ব্যত্যয় হয় না; তাঁর কথা মতো কাজ না করলে তাদের দেবতার অভিশাপ বহন করতে হবে। সনির্বন্ধ অনুরোধ ও মোটা দক্ষিণার জোরে মায়েরা পুরুতকে দিয়ে এমন ব্যবস্থা আদায় করল যে পাত্রপাত্রীর বাবা অর্থাৎ

তাউ ও কাউয়ান নীলা ও মাণিকের বংশ পরিচয় জানা সত্ত্বেও 'না' বলতে সাহস করলেন না। দুই বন্ধুতে দেখা হলে দুজনেই এবারে দুজনের ভুল বুঝতে পারলেন, কত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি করে তাঁরা আলাদা হয়ে ছিলেন! ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, নীলা ও মানিক এবার সত্যি সত্যিই কথা বলতে পারছে এ ওর কাছে, এখন আর জলের ছায়ার কাছে নয়! এবারে কি তারা আরো সুখী হ'ল? তা, জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। কারণ, সুখ হল জলের বুকে ছায়া!

* এই গল্পটির অনুবাদে দু একটি ছোট অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে, যথেচ্ছা সংযোজন বা বিকলন করা হয়নি। —অনুবাদক

শাঁ ফ্লুরি (১৮২১—১৮৮৯)

কোনো রকম দরদের কারবার নেই এঁর হাতে। নিছক রিয়ালিষ্ট স্কুলের লেখক, কিন্তু পরবর্ত্তী পূর্ণতর প্রতিভা জোলা ফ্লবার্ট মোপাশঁ-র দল এঁকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেন। কেবলমাত্র কয়েকটি ছোট গল্পের জন্যেই এখনো বেঁচে আছে এঁর নাম,—কয়েকটি হাসির গল্প। 'মঁসিয়ে ট্রিংগেল' তার মধ্যে একটি।

মঁসিয়ে টিংগেল

—শাঁ ফ্লুরি

মাদাম ব্রাউর বাড়ীতে সৌখিন নাচের মজলিসে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন মঁসিয়ে টিংগেল। সারা দুনিয়ায় তাঁর মতো সৌভাগ্যবান আজ কে?

মঁসিয়ে টিংগেল চট্ করে স্থির করে ফেললেন, একটা রাজকীয় পোশাকই পরবেন।

টিংগেল অবিবাহিত যুবক; মনে মনে কুমারী ব্রাউ বা তার ধন-সম্পদ লাভের বাসনা। আজ রাতের আসরেই তাঁর ভাগ্য পরীক্ষা হবে। ড্রেসিং সেলুনে গিয়ে সাজগোছ করলেন তিনি, দোকানদারের কাছ থেকে ভাড়া করলেন একটা পোশাক। দোকানদার বলল,—পোশাকটায় মানিয়েছে তাকে অতি চমৎকার। টিংগেল এবার অধীর আগ্রহে ভাগ্য পরীক্ষার আসরে রওনা হলেন।

"মঁসিয়ে টিংগেল", দোকানদার পিছু পিছু গিয়ে চেঁচিয়ে বলে দেয়,—"আপনার পোশাকটা বেশী গরম নয় কিন্তু, ঠাণ্ডা লাগবে।"

কিন্তু ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই ছুটে চলেছেন রাস্তা দিয়ে, আর মনে মনে রিহার্সাল দিচ্ছেন—যা ঠিক ভেবে রেখেছেন।

কলিং বেল বাজালেন তিনি।

ভেতরে শোনা যাচ্ছে দু'এক টুকরো শব্দ। কুমারী ব্রাউ নিজে এসে দোর খুলে দিল।

"নমস্কার!"—মঁসিয়ে টিংগেল বিনয়ে বেঁকে যান,—আর তার

পেছনের পুচ্ছটি উঁচিয়ে ওঠে উদ্ধত পেখমের মতো! এবং তাই বিনীতভাবে সামলে রাখবার চেষ্টায় ট্রিংগেল ঘেমে ওঠেন একেবারে।

কুমারী ব্রাউর মুখখানা ঠিক যেন একখানা ভিজে ন্যাকড়া! রাস্তার পাশে একখণ্ড টালির মতোই থ্যাবড়া। কিন্তু আজ তারও চোখে মুটে ফুথে উঠেছে বিষম বিস্ময়!

"আপনার মা ভাল আছেন তো?" মঁসিয়ে ট্রিংগেল আরও একটু ঘনিষ্ঠতার সুরে বলেন এবং সংগে সংগেই ড্রয়িং-রুম পেরিয়ে এসে পড়েন ডাইনিং হলে। মাদাম ব্রাউ সেখানে বসে কাজ করছিলেন; নানা জিনিষের স্তূপ চারদিকে, পাশেই টেবিলের উপর একটা আলো।

ট্রিংগেল কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েই বললেন, "একটু আগেই এসে পড়েছি তা হলে!"

তাতে আর কি হয়েছে! তিনি যথোচিত সম্মানে মাদাম ব্রাউকে নমস্কার জানালেন। মাদাম ব্রাউ চশমার তলা দিয়ে একবার দেখে কুঞ্চিত ওষ্ঠ দুটি এঁটে রেখে এই অদ্ভুত লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর সাথে আলাপ রেখে জমাতে এসেছে এই অদ্ভুত লোকটি!

কুমারী ব্রাউ তার মার পাশে বসে ছিল। তারা দু'জনেই যেন মূক অভিনয়ে নেমেছে। তারা এ ওর দিকে এমন বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় করছিল যে মঁসিয়ে ট্রিংগেল বারবার ভাবতে লাগলেন রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে নিশ্চয়ই পোশাকের কোনো একটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে!

তিনি এসেছেন পরেই তো এই অশুভ স্তব্ধতা! এত আগে এসে পড়েছেন বলে মঁসিয়ে ট্রিংগেলও অবশ্যি ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

"কিছু মনে করবেন না"!—মাদাম ব্রাউ দৃশ্যতই আলাপ সুরু করবার চেষ্টা করেন।

"মাদাম"—কিন্তু বিব্রত ট্রিংগেলের কথা আর এগোয়ে না।

ট্রিংগেল নীচের দিকে তাকিয়ে থাকলে বেশ বুঝতে পারতেন যে মাদাম ব্রাউ তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন বারবার,—পরচুলা পরা মাথাটা থেকে জুতোপরা পা পর্যন্ত। বিব্রত সৈনিক যেমন ভাবে কর্ণেলের সামনে উত্তর দেয় ঠিক তেমনি ভাবেই বললেন তিনি, "আমাকে কি কিছু খারাপ দেখাচ্ছে?"

মাদাম ব্রাউ মেয়ের দিকে তাকালেন, ঠিক যেন গুলি করবার নির্দেশ চাইছেন তিনি! তারপর বললেন,—"আপনাকে দেখে আজ চেনাই দায়!"

এই শুনে মঁসিয়ে ট্রিংগেল তো হেসেই লুটোপুটি! যা' ঠিক ভেবেছিলেন,—সাজগোছটা তাহলে যোগ্যই হয়েছে!

কিন্তু হঠাৎ ট্রিংগেল লক্ষ্য করলেন, মাদাম ব্রাউ তার এই উচ্ছ্বসিত উল্লাসে বিন্দুমাত্রও অংশ নিচ্ছেন না।

মহিলা দুটির ওষ্ঠ আরও এঁটে আসে। গাম্ভীর্যভরেই মাদাম ব্রাউ তার মেয়েকে বসতে ইঙ্গিত জানান।

তারা যেন দুটি জজ,—এক্ষুণি আসামীকে ফাঁসীর হুকুম দিতে যাচ্ছেন!

"কি বলছেন, আপনারা আমাকে চিনতেই পারেননি?"—ট্রিংগেল তাঁর এই অভিনব সজ্জার জন্য গর্বিত হয়ে ওঠেন কিন্তু।

* * *

"সাজ-সজ্জার ব্যাপারে মেয়েরা এখনো অনেকটা পিছনে পড়ে আছে।" মঁসিয়ে ট্রিংগেল সাহস ভরেই বলেন।

কিন্তু তার কোনো জবাব না পেয়ে আবার তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এই ধরণের মজলিসের নির্দিষ্ট সময়টাও ছাপার অক্ষরেই উল্লেখ করা উচিত!—ভাবছিলেন তিনি।

"আপনার এই ঘরটি কিন্তু বেশ আরামের!"—সাহস ভরেই তিনি মন্তব্য পেশ করেন আবার।

এদিকে তিনি সান্ধ্যভোজের উপাদেয় খাবারগুলি আগে থেকেই মনে মনে আস্বাদ করছিলেন। পথের ক্লান্তিতে তার পেটটাও চোঁ চোঁ করছিল খুব।

কিন্তু এই মহিলারা তা যেন একটুও বুঝতে চাইছেন না,—ট্রিংগেল গৃহকর্ত্রীর উদাসীনতা ও তাচ্ছিল্য ভাব দেখে একেবারেই বিস্মিত হয়ে পড়ছেন। অমন চুপ করে না থেকে তাঁর এখন উচিত পিঠে, লেমনেড্‌, সুরা সব প্লেটে সাজিয়ে এনে সবিনয়ে পরিবেশন করা।

অন্ত আর একটা পোশাক পেতাম—মঁসিয়ে ট্রিংগেল মনে মনে ভাবেন। আর একটা পোশাক পেলে নিশ্চয়ই আমাকে এমন নজরবন্দী হয়ে থাকতে হ'ত না।

তা হ'ক, কিন্তু এঁদের তাড়া-ই নেই কোনো ?

ট্রিংগেল কথাবার্তায় কিছুটা সজীবতা প্রকাশের চেষ্টা করেন,—"সবার মুখেই শুনছি, আপনাদের এই প্রীতি ভোজটাই হবে সবার চাইতে বড়!"

মাদাম ব্রাউর হাতের কাঁচি থেমে যায়। তিনি আবারও মঁসিয়ে ট্রিংগেলকে নিরীক্ষণ করতে থাকেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত!

ট্রিংগেল ভাবেন, পোশাকের কোনো একটা জায়গা নিশ্চয়ই অভদ্র-ভাবে ছিঁড়ে গেছে। হঠাৎ উচ্চস্বরেই বলেন তিনি,—"মেয়েরা এখন বোধহয় সেজেগুজে শেষ পলিশ লাগাচ্ছে।" ইতিমধ্যেই তিনি যে

মহিলাদের পূর্ণ গৌরবে সুসজ্জিতা দেখে প্রশংসা করবার সুযোগ পাচ্ছেন না, তাই বারবার দুঃখও প্রকাশ করলেন।

"কিন্তু মজলিসের গোটা হপ্তা আগেই সেজে বসে কী লাভ?"—কুমারী ব্রাউ বলে ওঠে।

"মজলিশের গোটা হপ্তা আগে!"—

ট্রিংগেল যেন ঘাবড়ে যান—"বলেন কি?"

"আপনি আজ যে নাচের মজলিসে যাচ্ছেন সেখানে তো আমরা যাচ্ছি না।" মাদাম ব্রাউ বলতে বলতে একটা মোমবাতি ধরিয়ে উঠে দাঁড়ান, অর্থাৎ বুঝিয়ে দিতে চান যে এই হাস্যকর অভিনয় ভদ্রতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

"অ্যাঁ, মজলিস তবে আজকে নয়!"—আঁৎকে ওঠেন মঁসিয়ে ট্রিংগেল।

"আপনাকে আজ সসম্মানে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের এখানে অভ্যর্থনার তারিখ হ'ল আঠেরই।"

মঁসিয়ে ট্রিংগেল চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন, আঁৎকে ওঠেন তিনি। আঠেরই!—নিমন্ত্রণ পত্রে তারিখ আছে তো আটই! হায়, হায়, মঁসিয়ে ট্রিংগেল!

"হলই বা!"—বলেন ওঠেন মাদাম ব্রাউ। "আপনি তো সে তারিখে আর পালটে যাচ্ছেন না। আচ্ছা চিজ তো! আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম, কী ধারণা বশে একজন নতুন লোক এহেন পোশাক পরে ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকতে পারে!

"মজলিসের পুরো এক হপ্তা আগেই এমন আহাম্মকের মতো সেজেগুজে আসার কথা কেউ বোধ হয় শোনেনি কখনো। এমন লক্ষ্মীছাড়া পোশাক পরে এ বাড়ীতে আর ঢোকা চলবে না।"

মঁসিয়ে টিংগেল বারবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন তার উদ্ধত পুচ্ছটা চেয়ারের নিচে লুকোতে! হায়রে, এই পুচ্ছের বাহাদুরীই ছিল তার সমস্ত আশা-ভরসার মূলে! কিন্তু পুচ্ছটা এমনিই বেয়াড়া যে হাজার চেষ্টা করেও সামলান যাচ্ছিল না। একটু নাড়া খেলেই বেয়াদপ পুচ্ছের ঝুঁটিটা তিড়িং করে উঁচিয়ে ওঠে—কখনো এপাশে, কখনো ওপাশে!

মঁশিয়ে ব্রাউ বাড়ী ফিরে এসেই টিংগেলকে দরজা দেখিয়ে বলে দিলেন,—"এই চিরদিনের জন্যেই!"

—এই বলেই ভীত টিংগেলের পিঠের উপরেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু বিপদ কখনো একা আসে না,—সমস্ত দেশের দার্শনিকেরাই এবিষয়ে এক মত। মঁসিয়ে টিংগেল সিঁড়ি দিয়ে নামতেই—একি! কিসে যেন তাকে পিছন থেকে টানছে!

পুচ্ছটি আটকে গেছে দোরের ফাঁকে! যে ঘর থেকে এইমাত্রই তিনি তাড়া খেলেন সেই ঘরেরই দোরের ফাঁকে!

গোটা দুইয়ের সময় তিনি কষ্টে সৃষ্টে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন। কিন্তু বাড়ী ফিরবার পথেও সেই বিচিত্র পোশাকটির দৌলতে তিনি আরও অনেক আশ্চর্য অভিযান করেছিলেন!